ইমাম হুসাইনের রা. শাহাদাত

আকরাম ফারুক

www.pathagar.com

ইমাম হুসাইনের (রা) শাহাদাত

আকরাম ফারুক

আহসান পাবলিকেশন
কাঁটাবন ❖ বাংলাবাজার ❖ মগবাজার
www.ahsanpublication.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

ইমাম হুসাইনের (রা) শাহাদাত

আকরাম ফারুক

ISBN : 984-31-0857-4

প্রকাশনায়

আহসান পাবলিকেশন
বুক এন্ড কম্পিউটার কমপ্লেক্স
৩৮/৩ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৭১২৫৬৬০, মোবাইল : ০১৭২৮১১২২০০

পরিবেশনায়
মক্কা পাবলিকেশন্স, ঢাকা।
মাওলা প্রকাশনী, ঢাকা।

প্রকাশকাল
প্রথম প্রকাশ
এপ্রিল, ২০০০
তৃতীয় প্রকাশ
আগস্ট, ২০১৪

প্রচ্ছদ
নাসির উদ্দিন

কম্পোজ ও মুদ্রণ
আহসান কম্পিউটার
কাঁটাবন মসজিদ ক্যাম্পাস, ঢাকা।

বিনিময় : একশত বিশ টাকা মাত্র

IMAM HUSSAINER (RA) SAHADAT by Akram Farooque Published by Ahsan Publication, 38/3 Banglabazar, Dhaka-1100, First Edition April 2000, Third Edition August 2014, **Price Tk. 120** only.

AP-02

www.pathagar.com

www.pathagar.com

প্রকাশকের কথা

হিজরী ৬১ সালের ১০ই মহররম কারবালা প্রান্তরে ইমাম হুসাইন (রা) এর শাহাদাতের পর ১৩৬০ বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। কিন্তু তাঁর শাহাদাতের শোক আজও দুনিয়াব্যাপী বয়ে চলেছে। ইমাম হুসাইনের (রা) শাহাদাতের ঘটনার উপর অনেক গ্রন্থ রচনা করা হয়েছে, এমনকি মহাকাব্য রচিত হয়েছে। এগুলোর মাধ্যমে মানুষের মধ্যে শোক, বিলাপ ও আহাজারীর জোয়ার বইছে। কিন্তু ইমাম হুসাইন (রা) তাঁর পরিবারবর্গসহ ফোরাতের তীরে কেন জীবন বিলিয়ে দিলেন, সে দিকটি অনেকেই গভীরভাবে বিবেচনা করেন না। "সামগ্রীক জনমতকে অগ্রাহ্য করে গুটি কয়েক লোকের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে খেলাফতের পতন ঘটিয়ে যে রাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হচ্ছিল, তার বিরুদ্ধে ইমাম হুসাইন (রা) প্রতিবাদ করেছিলেন"– একথাটি আজ বিস্মৃত।

প্রখ্যাত চিন্তাবিদ, সু-সাহিত্যিক ও অনুবাদক আকরাম ফারুক এ গ্রন্থে ইমাম হুসাইনের (রা) শাহাদাতের প্রামান্য ও বস্তুনিষ্ঠ ঘটনাবলী বর্ণনার সাথে সাথে এ বিষয়টি সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন।

সু-সাহিত্যিক আবদুল মান্নান তালিব গ্রন্থটি আগাগোড়া দেখে দিয়েছেন।

বিস্মৃত এই মর্মান্তিক ইতিহাস ও তার শিক্ষা এ গ্রন্থের মাধ্যমে সংক্ষিপ্ত আকারে তুলে ধরা হলো। আশা করি পাঠকবর্গ গ্রন্থখানার মাধ্যমে সঠিক ও বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাস জানতে পারবেন।

গ্রন্থখানাকে নির্ভুল করার জন্য চেষ্টার ত্রুটি করা হয়নি। তবুও মুদ্রণজনিত ত্রুটি থেকে যেতে পারে। হৃদয়বান পাঠক যদি কোন বিচ্যুতি লক্ষ্য করেন তাহলে আমাদের জানালে সংশোধন করা হবে। মহান আল্লাহ আমাদের এ চেষ্টাকে কবুল করুন।

www.pathagar.com

সুচিপত্র

ভূমিকা ঃ
খেলাফতে রাশেদার উত্থান ও পতন ১৫
হযরত আলীর (রা) খেলাফত ২১
আমীর মুয়াবিয়ার (রা) শাসনকাল ও রাজনীতি ২৭
ইমাম হুসাইন (রা) ৩৬
হযরত ইমাম হাসানের (রা) খিলাফত ৪২
ইয়াযীদ বিন মুয়াবিয়া ও তার রাজনীতি ৪৫
ইরাক থেকে গণ আমন্ত্রণ ৫০
রক্তপিপাসু ইবনে যিয়াদ ও তার গুপ্তচর বাহিনী ৫৮
শহীদের কাতারে মুসলিম বিন আকীল ৬৬
ইমাম হুসাইনের কুফা গমন ৭৫
হক ও বাতিলের প্রত্যক্ষ সংঘাতের সূচনা ৮৪
রক্তস্নাত কারবালা ১০০
শহীদী রক্তে হেসে ওঠে যবে জিন্দিগানি ১১০
ইমাম হুসাইনের (রা) পরিবার যখন কুফায় ১১৬
কারবালার ঘটনার হোতাদের মর্মান্তিক পরিণতি ১২২
ইমাম হুসাইনের (রা) শাহাদাতের ঘটনা থেকে শিক্ষা ১২৪
তথ্যসূত্র ঃ ১২৫

www.pathagar.com

ভূমিকা

ইমাম হুসাইনের (রা) শাহাদাত নিঃসন্দেহে মুসলিম বিশ্বের ইতিহাসের সবচেয়ে মর্মবিদারী ঘটনা। রাসূল (সা) এর জীবদ্দশায় ও তাঁর ইন্তিকালের পরে আরো অনেক মর্মবিদারী হত্যাকাণ্ড ঘটেছে। কিন্তু ইমাম হুসাইনের (রা) হত্যাকাণ্ডের ন্যায় এত দীর্ঘস্থায়ী ও এত ব্যাপক শোক, মাতম ও আহাজারী মুসলিম জাতি আর কোন হত্যাকাণ্ডের জন্য করেনি। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, রাসূল (সা) এর জীবদ্দশায় হযরত হামযার (রা) শাহাদাত, তাঁর কলিজা চিবানো, ইয়াসার পরিবারের মর্মান্তিক হত্যাকাণ্ড, বীরে মাউনায় ৭০ জন এবং ইয়ামামার যুদ্ধে ৩০০ কুরআনে হাফেজের হত্যাকাণ্ড, হযরত খুবাইব ও তার সংগীদের শাহাদাত তৎকালীন মুসলিম সমাজের বুকে শেলের মত বিধেঁছিল। স্বয়ং রাসূল (সা) হযরত হামযার (রা) শাহাদাতে নিদারুনভাবে শোকাহত হয়েছিলেন। তারপর চারজন খলিফার মধ্যে হযরত আলী (রা) সহ তিন জন খলিফাই শহীদ হয়েছেন মর্মান্তিকভাবে। জামাল যুদ্ধ ও সিফফীন যুদ্ধের ন্যায় দুটি গৃহযুদ্ধে বহু মূল্যবান প্রাণ, বিশেষত আশারায়ে মুবাশশারার অন্তর্ভুক্ত কয়েকজন সাহাবীও শহীদ হয়েছেন। এ সব হত্যাকাণ্ডে মুসলমানদের শক্তি ও প্রভাব-প্রতিপত্তির অপূরণীয় ক্ষতি হলেও শোক ও আবেগের দিক দিয়ে ইমাম হুসাইনের (রা) হত্যাকাণ্ড এ সব হত্যাকাণ্ড থেকে অধিক মর্মান্তিক। এমনকি ইমাম হুসাইনের (রা) বড় ভাই ইমাম হাসান (রা)-কেও বিষ প্রয়োগে হত্যা করা হয়েছিল। কিন্তু সেই হত্যাকাণ্ড নিয়েও সারা দুনিয়াজোড়া এত দীর্ঘস্থায়ী শোক ও বিলাপ হয়নি, যেমনটি ইমাম হুসাইনের (রা) হত্যাকাণ্ডে হয়েছিল এবং হচ্ছে। ইমাম হুসাইনের (রা) শাহাদাতের এই বিশিষ্টতার পেছনে যে কারণগুলো নিহিত রয়েছে তা সংক্ষেপে বলতে গেলে নিম্নরূপ ঃ

১. ইয়াযীদ ও হযরত মোয়াবিয়ার (রা) নেতৃত্বে ইসলামী রাষ্ট্রের যে নৈতিক ও আদর্শিক ক্ষতি ও বিকৃতি ঘটতে যাচ্ছিল, ইমাম হুসাইন (রা) সেই বিকৃতির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন। ইয়াযীদের অসৎ নেতৃত্বের বিরুদ্ধে তিনি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আপোষহীন ছিলেন। ইমাম হাসান (রা) আপোষহীন ছিলেন না।

২. ইমাম হুসাইন (রা) প্রতিবাদে আপোষহীন হলেও পর্যাপ্ত লড়াকু জনবলের অভাবে যুদ্ধ ঘোষণা করেননি এবং যুদ্ধের প্রস্তুতি নিয়ে কারবালা প্রান্তরে হাজিরও হননি। তা সত্ত্বেও ইয়াযীদের বাহিনী তাকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করে।

তিনি ইয়াযীদের সাথে সাক্ষাত করা অথবা অন্য কোন দেশে চলে যাওয়ার ইচ্ছা ব্যক্ত করা সত্ত্বেও সৈন্যরা তার কোন কথায় কর্ণপাত করেনি।

৩. ফোরাত নদীর পানি অবরোধসহ নারী ও শিশুদের প্রতি চরম অমানবিক আচরণ করে

www.pathagar.com

ধুকে ধুকে মারা ও দুর্বল করে দেয়ার কারণে যে নিষ্ঠুর ও পৈশাচিক পরিবেশ সৃষ্টি করা হয়েছিল, নবূয়তের এত কাছাকাছি সময়ে এমন বর্বরতা স্বয়ং মুসলিম নামধারীদের দ্বারা ঘটতে পারে, তা কারো কল্পনায়ও আসেনি। বিশেষত রাসূল (সা) এর প্রিয় দৌহিত্রের প্রতি এ আচরণ পরবর্তী মুসলিম জেনারেশনগুলোকে নিদারুনভাবে ব্যথিত করেছে।

৪. লক্ষ লক্ষ নিষ্ঠাবান মুমিন সাহাবী ও তাবেঈদের বেঁচে থাকা সত্ত্বেও ইমাম হুসাইনের (রা) এই সংগ্রামে একেবারেই নিঃসঙ্গ হয়ে যাওয়াটা অনেকাংশেই রহস্যময়।

আর এ কারণে ঘটনাটা মুসলিম জনমানসে আরো বেশী মর্মবেদনা ও গভীর ক্ষতের সৃষ্টি করেছে।

তবে সূক্ষ্মতর পর্যালোচনায় গেলে এই মর্মন্তুদ ঘটনার রহস্য উন্মোচনে কুরআন, হাদীস ও ইতিহাস থেকে যে দিক নির্দেশনা পাওয়া যায়, এক কথায় বলতে গেলে তা হলো মুসলিম নামধারী অসৎ নেতৃত্বের বিরুদ্ধে সৎ মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ গড়ে তোলার ব্যর্থতা।

তৎকালীন মুসলিম সমাজে খুলাফায়ে রাশেদীন, বিশেষত হযরত আবু বকর (রা) ও ওমরের (রা) ন্যায় দৃঢ়চেতা ও খোদাভীরু ব্যক্তিত্বের অস্তিত্ব না থাকায় মুসলমানরা ইয়াযীদের উপযুক্ত বিকল্প হিসাবে কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তির নেতৃত্বের ওপর একমত হতে পারেনি। বিশেষতঃ কাফের অপশক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করতে করতে তাদের কুফরি বিরোধী চেতনা যতটা শানিত হয়ে পড়েছিল, নিজেদের অভ্যন্তরের গৃহশত্রু বিভীষণ মোনাফেকদের সম্পর্কে ততটাই অসতর্ক ও উদাসীন হয়ে পড়েছিল।

৫. সম্ভবত, মুসলিম সমাজের সর্বস্তরের জনমানসে ইয়াযীদের চরিত্র সম্পর্কেও প্রথম প্রথম যথেষ্ট অজ্ঞতা ছিল। ইসলামী সমাজে গীবত চর্চা কম থাকায় এবং লৌহ মানব স্বৈরশাসক হযরত মোয়াবিয়ার (রা) ছেলে হওয়ার কারণে শরীয়তের শাস্তি থেকে অব্যাহতি পাওয়ায় ইয়াযীদের চরিত্রের নিকৃষ্ট দিকগুলো বিশেষত মদখুরি, ব্যভিচার ও নামায তরক করার মত ভয়াবহ দোষগুলো অনেকেরই অগোচরে থেকে গিয়েছিল বলে মনে হয়। অবশেষে হযরত আবদুল্লাহ ইবন যুবাইরকে (রা) গ্রেফতার করার জন্য যখন সে মদীনা অবরোধ করে, তখন তার চরিত্রের এই দিকগুলো প্রকাশিত হয়ে পড়ে এবং মদীনার জনগণ সর্বাত্মক বিদ্রোহে ফেটে পড়ে। এই বিদ্রোহেই শেষ পর্যন্ত ইয়াযীদের পতন ঘটে।

ওয়াকেদী বর্ণনা করেন যে, আবদুল্লাহ ইবনুল হানযালা (রা) বলেছেন ঃ আমরা তখনই ইয়াযীদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করলাম, যখন জানতে পারলাম যে, সে ব্যভিচারী, মদখোর, নামায তরককারী এবং যখন আমাদের আশংকা হলো, এখনো যদি বিদ্রোহ না করি, তবে আকাশ থেকে পাথর বৃষ্টি হতে পারে।" (তারীখুল খুলাফা)

www.pathagar.com

ঐতিহাসিকগণ একবাক্যে স্বীকার করেন, ইয়াযীদের ক্ষণস্থায়ী রাজত্বের তিনটে কলংকজনক অপকীর্তি হলো ঃ প্রথম বছর কারবালা প্রান্তরে ইমাম হুসাইনকে (রা) নির্মমভাবে হত্যা করা, দ্বিতীয় বছরে মদীনা শহরে লুঠতরাজ চালানো এবং তৃতীয় বছর কাবা শরীফে অগ্নিসংযোগ। এই তিনটে ঘটনার ফলেই উমাইয়া রাজত্বের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে ওঠে।

আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেন ঃ "তুমি কি সেই ব্যক্তিকে দেখেছ, যে তার প্রবৃত্তিকে খোদা বানিয়ে নিয়েছে? তুমি কি তার দায়িত্ব গ্রহণ করবে? তুমি কি মনে কর, তাদের অধিকাংশের কোন শ্রবণশক্তি অথবা বোধশক্তি আছে? ওরা তো পশুর মত। বরং পশুর চেয়েও বিপথগামী।"

অর্থাৎ মুসলিম নামধারী হলেও কেউ যদি নিজের প্রবৃত্তির পুজারী হয়, তবে সেতো কুরআনের বক্তব্য অনুসারে পশুর চেয়েও অধম। আর পশুর চেয়ে যে অধম, এমন কোন অপরাধ নেই, যা তার দ্বারা সংঘটিত হতে পারেনা। আর ইয়াযীদ ও তার সাংগপাংগরা যদি এই শ্রেণীর মুসলমান হয়, তবে তাদের পক্ষে ইমাম হুসাইনের (রা) মত ব্যক্তিকে হত্যা করা কঠিন কিছু নয়। আর এ ধরণের অপশক্তি যে কোন যুগে যে কোন স্থানে আবির্ভূত হতে পারে এবং এ ধরনের বর্বরোচিত অঘটনও ঘটাতে পারে। এ প্রসংগে জনৈক মনীষীর একটা উক্তি মনে পড়ছে। মহাকবি শেখ সাদীকে একবার জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, "আপনি কাকে বেশী ভয় করেন?" তিনি জবাব দিলেন ঃ "আল্লাহ তায়ালাকে"। পুনরায় জিজ্ঞেস করা হলোঃ "আল্লাহর পর কাকে বেশী ভয় করেন?" তিনি জবাব দিলেনঃ "যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করেনা তাকে।" পুনরায় প্রশ্ন করা হলোঃ "কেন?" তিনি বললেন, "কারণ, যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করেনা, পৃথিবীতে এমন কোন অপকর্ম নেই, যা সে করতে পারেনা।"

সুতরাং ইয়াযীদি অপশক্তির পরিচয় শুধু দুটো কথা দিয়েই দেয়া যায়। এ অপশক্তি হলো পশুর চেয়েও অধম আর এ অপশক্তি সুযোগ পেলে কোন অপকর্মই করতে কুণ্ঠিত হয় না। এ অপশক্তি থেকে বাঁচতে হলে তার প্রতিরোধে মুসলিম জাতিকে সদা সচেতন ও ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে এবং তাকে কোনক্রমেই কোন পর্যায়েই ক্ষমতাসীন হতে দেয়া চলবেনা। বরং সর্বশক্তি দিয়ে তাকে প্রতিহত করতে হবে। কুরআনে এ অপশক্তিকে আরো একটা নাম দেয়া হয়েছে। সেটা হলো, মোনাফেক। মোনাফেক সম্পর্কে কুরআনের সুস্পষ্ট নির্দেশ হলোঃ "হে নবী, কাফের ও মোনাফেকদের বিরুদ্ধে জেহাদ কর।" অতএব, মোনাফেক অপশক্তিকে প্রতিহত করার উপায় হলো, ঈমানী বলে বলীয়ান হয়ে ঐক্যবদ্ধ শক্তি নিয়ে জেহাদ করা।

ইমাম হুসাইনের (রা) শাহাদাতের ঘটনার মূল্যায়ন করতে গিয়ে তার যে নেতিবাচক

www.pathagar.com

ফলাফল আমরা একটু আগেই দেখলাম, পাশাপাশি কিছু ইতিবাচক সুফলও দেখতে পাই। সেটা নিম্নে দেয়া হচ্ছে ঃ

১. এই ঘটনা মুসলিম জাতির পিঠ দেয়ালে ঠেকিয়ে দিয়ে তাদের ঈমান ও ঈমানী শক্তিকে পুনরুজ্জীবিত করেছে। ইসলামের দুশমনদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর প্রেরণা যুগিয়েছে। জনৈক কবি যথার্থই বলেছেন ঃ

"হুসাইনের হত্যাকাণ্ড আসলে ইয়াযীদের মৃত্যু
প্রত্যেক কারবালার পরেই ইসলাম পুনরুজ্জীবিত হয়।"

২. শাসনক্ষমতা থেকে ইসলামের তিরোধান অর্থাৎ ইসলামী খেলাফতের পতন ঘটার পর বিগত সাড়ে তেরোশত বছরে মুসলিম জাতির ভেতরে ইসলাম রক্ষার যে চেতনা ও শৌর্যবীর্য আপন মহিমায় ভাস্বর রয়েছে, তার পেছনে কুরআন ও সুন্নাহর পরে ইসলামের ইতিহাসের যে ঘটনাবলী সবচেয়ে শক্তিশালী উপাদান হিসেবে সক্রিয় রয়েছে, কারবালার ঘটনা তার মধ্যে সবচেয়ে বেশী উল্লেখযোগ্য।

৩. এই ঘটনা মুসলিম জাতিকে তাদের ভেতরকার গৃহশত্রু বিভীষণদেরকে চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে এবং তারা কত ভয়ংকর পশুশক্তি, সেটা স্পষ্ট করে দিয়েছে। এরপর মুসলিম নামধারীদের ভেতরে ইসলাম ও মুসলমানদের প্রকৃত শত্রু ও মিত্র কারা, তা চিনতে আর ভুল হওয়া উচিত নয়। ইতিহাস সাক্ষী যে, মুসলমানগণ যখনই এই শত্রু ও মিত্রদেরকে চিনতে ভুল করেছে, তখনই তারা চরম বিপর্যয়ের শিকার হয়েছে।

ইতিহাস লেখার বিড়ম্বনা

ঐতিহাসিক ঘটনাবলী লেখার সময় নিরপেক্ষতা অবলম্বন করা ঐতিহাসিকদের কর্তব্য। পরিপূর্ণ সততা ও ইনসাফের সাথে প্রত্যেক ঘটনার প্রতিটা খুঁটিনাটি বিবরণ তুলে ধরতে হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এমন নিরপেক্ষতা বাস্তবে খুব কমই দেখা যায়। ঐতিহাসিকগণ যখন ইতিহাস লিখতে বসেন, তখন সংঘটিত ঘটনাবলীকে নিজের ধ্যানধারণা, আকীদা বিশ্বাস ও চিন্তাধারার আলোকেই দেখে থাকেন এবং সেই অনুসারেই সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকেন। এক পক্ষকে নিষ্পাপ এবং আরেক পক্ষকে দোষী সাব্যস্ত করে থাকেন। বই এর শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এই মনোভাবই কার্যকর থাকে। এমনকি এ কথা বলাও অত্যুক্ত হবে না যে, অনেক ঐতিহাসিক ইতিহাস লেখার সিদ্ধান্তই নেন একটা আদর্শ বা চিন্তাধারাকে ঘটনাবলীর আলোকে প্রমাণিত ও প্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যে। কিন্তু সত্যনিষ্ঠ ও ইনসাফপ্রিয় ইতিহাসবিদদের কর্মপন্থা এমন হওয়া

www.pathagar.com

উচিত নয়। বড়জোর সংঘটিত ঘটনাবলীকে বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষ যে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখে থাকে, তার উল্লেখ করতে পারেন এবং নিজের দৃষ্টিকোণ ও তাকে অগ্রাধিকার দেয়ার যুক্তি তুলে ধরতে পারেন। এতেও কিছুটা নিরপেক্ষতা বজায় থাকা সম্ভব।

নিরপেক্ষতা ও ন্যায়নিষ্ঠতা বজায় রাখার পক্ষে আরো একটা বাধা মাঝে মাঝে দেখা দেয়। সেটা হলো, লেখকের ন্যায় পাঠকরাও কোন একটা বিশেষ ধ্যান ধারণার অনুসারী হয়ে থাকেন। তারা যখন তাদের প্রিয় ব্যক্তিত্বের বিরুদ্ধে কিছু লিখিত বক্তব্য দেখতে পান, তখন যতই নিরপেক্ষতার মোড়কে তা পেশ করা হোক না কেন, তা তাদের মনোপুত হয়না। বেচারা লেখক তাদের কটুক্তি ও ক্ষোভের শিকার হন।

বিশেষত ব্যাপারটা যদি সাধারণ ইতিহাসের সীমানা পেরিয়ে ধর্মীয় সীমানায় প্রবেশ করে, তাহলে পরিস্থিতি আরো করুণ ও স্পর্শকাতর হয়ে দাঁড়ায়। ধর্মীয় দিক দিয়ে বিশেষ সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী কোন ব্যক্তিত্বের বিরুদ্ধে যখন কাউকে সমালোচনা করতে দেখা যায় তখন আর এক মুহূর্ত চিন্তাভাবনা না করে লেখককে দোষী সাব্যস্ত করা হয় এবং তাকে নানা রকমের বিশেষনে ভূষিত করে তার লিখিত বইকে পড়ার অযোগ্য বলে ঘোষণা করা হয়। ভক্তদের মনে লেখকের প্রতি ঘৃণা বিদ্বেষ ও তাচ্ছিল্যের আবেগের প্রবল বিস্ফোরণ ঘটে। এমনকি লেখক যদি এ ব্যাপারে ব্যাখ্যা বা ওযর আপত্তি পেশ করেন, তাহলেও তা নিষ্ফল হয়ে যায়। তার কোন ওযর আপত্তি বা ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ শোনা হয়না। এই মানসিকতার কারণে স্পষ্টভাবে সত্য কথা বলা খুবই কঠিন হয়ে পড়ে। কোন লেখক নিজেকে অযথা বিপাকে ফেলতে সাহস পায়না। হাজার হাজার ঐতিহাসিক ঘটনা এমন রয়েছে, যার প্রকৃত রহস্য উম্মোচন করা কোন লেখকের পক্ষে সম্ভব হয়নি শুধু এ জন্য যে, জনসাধারণ ক্ষিপ্ত হয়ে যেতে পারে। যদি বা কেউ সাহস করে সামান্য কিছু উন্মোচন করেছে, তবে তাকে বিদ্বেষী ও ফেরকাবাজ আখ্যায়িত করা হয়েছে।

হযরত আলী (রা) আমীর মুয়াবিয়া (রা) হযরত হুসাইন (রা) ও ইয়াযীদের ঘটনাবলীও অনেকটা এই পর্যায়ের। সুন্নীরা হযরত আলী (রা) ও মুয়াবিয়া (রা) উভয়কে সম্মান করে থাকে। কিন্তু শীয়ারা আমীর মুয়াবিয়ার (রা) ভেতরে আদৌ কোন সদগুণ দেখতে পান না। তার ভেতরে কেবলই দোষ দেখতে পান। সুন্নীরা যদিও ইমাম হুসাইনকে (রা) বিপুল ভক্তি শ্রদ্ধা করেন। কিন্তু ধর্মীয় দিক দিয়ে তাঁকে নবীর মত নিষ্পাপ মনে করেন না। তাছাড়া সুন্নীদের ভেতরে কেউ কেউ এমনও আছে, যারা ইয়াযীদকে খারাপ জানলেও কারবালার ঘটনায় তাকে খুব বেশী দোষারোপ করতে চান না। ঐ মর্মান্তিক ঘটনার জন্য তারা প্রধানত ইবনে যিয়াদ ও শিমারকেই দায়ী করেন। পক্ষান্তরে শীয়া গোষ্ঠীর ধর্মীয় আকীদাই এই যে, কারবালার ঘটনার শতকরা একশোভাগ দায় ইয়াযীদের ওপরই বর্তে। ইবনে যিয়াদ যা কিছু করেছে ইয়াযীদের হুকুম অনুসারেই করেছে এবং

www.pathagar.com

ইবনে যিয়াদের প্রত্যক্ষ নির্দেশক্রমে শিমার তাকে নির্মমভাবে হত্যা করেছে।

এখানে এসে একজন ঐতিহাসিক ঠিক সেই দ্বিধাদ্বন্দ্বে পড়ে, যার কথা একটু আগে উল্লেখ করা হলো। যা সত্য, তা বললে একটা পক্ষ ক্ষেপে যায় এবং লেখককে গালি গালাজ করে। আর যদি বিবেককে উপেক্ষা করে একপেশেভাবে ঘটনা বর্ণনা করে, তবে অপর পক্ষের তিরস্কার শুনতে বাধ্য হয়।

আমার দৃষ্টিতে এই ঘটনা যত মর্মন্তুদই হোক, যত হৃদয়বিদারকই হোক, সব কিছুর জন্য ইয়াযীদ দায়ী নয়। তবে আমীর মুয়াবিয়া (রা) সাহাবী হওয়া সত্ত্বেও যে ভূমিকা পালন করেছেন, তা একজন সাহাবীর পক্ষে মোটেই শোভনীয় ছিলনা। আবার এ কথাও সত্য, এই একটামাত্র ভূমিকার কথা বাদ দিলে তার অনেক উজ্জ্বল কীর্তিও রয়েছে, যা মুসলিম উম্মাহকে বিপুলভাবে উপকৃত করেছে এবং যার জন্য মুসলিম জাতি গর্ববোধ করতে পারে। পরবর্তীতে এ সব বিষয়ে আলোচনা করা হবে।

তবে সর্বপ্রথম যে বিষয়টা পাঠকের মনে বদ্ধমূল হওয়া দরকার তা হলো, হযরত ইমাম হুসাইনের (রা) পক্ষ থেকে ইয়াযীদের খেলাফতের বিরোধিতা এবং কুফার দিকে সপরিবারে রওনা হয়ে যাওয়ার মত ঘটনাবলী নেহাত আকস্মিকভাবে সংঘটিত হয়নি। বরং এগুলো হচ্ছে সুদীর্ঘ ধারাবাহিক ঘটনাবলীর একটা অংশ মাত্র, যার চূড়ান্ত সমাপ্তি ঘটেছে তাঁর শাহাদাতের মধ্য দিয়ে। তাই ইমাম হুসাইনের (রা) মূল ইতিবৃত্ত বর্ণনা করার আগে জানা দরকার কিভাবে হযরত আমীর মুয়াবিয়ার (রা) উত্থান ঘটলো, এবং কিভাবে তিনি নিজের জীবদ্দশায় ইয়াযীদকে নিজের পরবর্তী খলিফা মনোনীত করে তার স্বপক্ষে ইসলামী রাষ্ট্রের সকল উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তার বায়য়াত (শর্তহীন সমর্থন ও সহযোগিতার শপথ) গ্রহণে সফলকাম হলেন। এই ধারাবাহিক ইতিবৃত্তের বর্ণনা প্রসংগে আমি হযরত আলীর (রা) সংক্ষিপ্ত জীবন কাহিনী বর্ণনা করেছি, যাতে পাঠক হযরত আলী (রা) ও হযরত মোয়াবিয়া (রা) মধ্যকার দ্বন্দ্ব-সংঘাতের প্রকৃত কারণ জানতে পারেন। এই দ্বন্দ্ব-সংঘাতের ফলে স্বভাবতই উভয়ের সন্তানাদি এবং ঘনিষ্ঠ জনেরাও পরস্পরের বিরোধী শিবিরের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ে। তাদের মাঝেও ঝগড়াকলহ ও বিদ্বেষ ঠিক ততখানি তীব্রতা নিয়েই বিস্ফোরিত হয়, যতটা তাদের পিতাদের মাঝে হয়েছিল। সাধারণ মুসলমানদের ভেতরেও এই দ্বন্দ্ব-কলহের সুদূর প্রসারী প্রভাব পড়ে এবং মুসলিম জাতি তাৎক্ষণিকভাবে দুটো শিবিরে বিভক্ত হয়ে যায়- যদিও ইয়াযীদ-মুয়াবিয়ার রাজনৈতিক অনুসারী বলতে কেউ আর পরবর্তীকালে অবশিষ্ট থাকেনি।

আমি যতদূর সম্ভব প্রামান্য তথ্যসমূহের ভিত্তিতেই এই ইতিহাস লিপিবদ্ধ করার চেষ্টা করেছি। কতদূর সফল হয়েছি তা পাঠকেরই বিচার্য।

—আকরাম ফারুক

www.pathagar.com

খেলাফতে রাশেদার উত্থান ও পতন

এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যেতে পারে যে, ইমাম হুসাইন (রা) যতদিন জীবিত ছিলেন, ততদিনও লেখাফতে রাশেদার পুনর্বহালের কিছু আশা অবশিষ্ট ছিল। তাঁর শাহাদাতের মধ্য দিয়েই খেলাফতে রাশেদার পতন চূড়ান্ত ও নিশ্চিত হয়।

এই শাহাদাত ও পতনের প্রত্যক্ষ কারণ এই যে, ইমাম হাসানের (রা) সাথে সম্পাদিত সন্ধি চুক্তিতে মুয়াবিয়ার (রা) পর ইমাম হুসাইন (রা) মুসলিম জাহানের খলিফা হবেন এই প্রতিশ্রুতি সুস্পষ্টভাবে দেয়া সত্ত্বেও মুয়াবিয়া (রা) তা লংঘন করেন এবং নিজের পাপাসক্ত, অত্যাচারী, চরিত্রহীন, মদ্যপায়ী ও নিষ্ঠুর প্রকৃতির ছেলে ইয়াযীদকে নিজের উত্তরাধিকারী ঘোষণা করেন। আর ইয়াযীদ তার অধীনস্থ সকল এলাকার শাসকদেরকে সকলের কাছ থেকে তার আনুগত্যের শপথ (বায়য়াত) আদায় করার নির্দেশ দেয়। যারা আনুগত্যের শপথ নেবেন না, তাদেরকে প্রয়োজনে হত্যা করার জন্যও ইয়াযীদ প্রকারান্তরে নির্দেশ জারী করে। এই জন্যই কারবালা প্রান্তরে ইয়াযীদের সৈন্যরা ইমাম হুসাইনকে (রা) বায়য়াত অথবা যুদ্ধ ছাড়া আর কোন বিকল্প গ্রহণের অনুমতি দেয়নি, যার অনিবার্য পরিণতি ছিল যুদ্ধ ও ইমামের শাহাদাত।

আর পরোক্ষ কারণ সম্পর্কে আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতী স্বীয় গ্রন্থ তারীখুল খুলাফাতে লেখেন ঃ

"ইমাম হাসান বসরী বলেছেনঃ খেলাফাতের বিপর্যয়ের জন্য দুই ব্যক্তি দায়ীঃ প্রথম হযরত আমর ইবনুল আস (রা)। (সিফফীন যুদ্ধের শেষ পর্যায়ে) তিনি মুয়াবিয়া (রা) কে পরামর্শ দেন পবিত্র কুরআন উঁচু করে তুলে ধরতে। এই পরামর্শ মোতাবেক কুরআন উঁচু করে তুলে ধরা হয়। তারপর শালিশীর ক্ষমতা দেয়া হয় খারেজীদেরকে এবং এই শালিশীর কুফল কেয়ামত পর্যন্ত বহাল থাকবে।

দ্বিতীয়ত মুগীরা ইবনে শুবা (রা)। তিনি কুফায় মুয়াবিয়ার (রা) শাসনকর্তা ছিলেন। মুয়াবিয়া (রা) তাকে লিখলেনঃ আমার এই চিঠি পাওয়া মাত্র তুমি পদচ্যুত হয়ে আমার কাছে চলে এস। মুগীরা একটু বিলম্বে পৌছলেন। মুয়াবিয়া (রা) তাকে জিজ্ঞেস করলেনঃ বিলম্ব করলে কেন? মুগীরা বললেন ঃ একটা পরিকল্পনা নিচ্ছিলাম। তাতেই দেরী হয়ে গেল। মুয়াবিয়া (রা) বললেন ঃ কিসের পরিকল্পনা? মুগীরা বললেনঃ আপনার পরে ইয়াযীদকে খলিফার আসনে বসানোর পরিকল্পনা। মুয়াবিয়া (রা) বললেন ঃ স্থির করেছ? মুগীরা বললেন ঃ হাঁ। মুয়াবিয়া (রা) বললেন ঃ "তোমার পদ বহাল রইল। কাজে ফিরে যাও। মুগিরা মুয়াবিয়ার (রা) কাছ থেকে ফিরে এলে তার সাথীরা তাকে জিজ্ঞেস করলোঃ কী করে এলেন? মুগীরা বললেনঃ মুয়াবিয়াকে (রা) এমন বিপথগামী করেছি যে, কেয়ামত পর্যন্ত তাকে ঐ অবস্থায় থাকতে হবে। হাসান বসরী বলেন ঃ এই

www.pathagar.com

দু'জনে জটিলতা সৃষ্টি না করলে কেয়ামত পর্যন্ত পরামর্শ ভিত্তিক খেলাফত চালু থাকতো। (তারীখুল খুলাফা- পৃ. ১৮২-১৮৩)

বস্তুত আসলে তিনি শুধু মুয়াবিয়াকে (রা) নয় বরং সমগ্র মুসলিম জাতিকেও কেয়ামত পর্যন্ত বিপথগামী করে দিয়েছিলেন।

হযরত হুসাইনের (রা) এই শাহাদাত শুধু খেলাফতে রাশেদার পতনকেই অনিবার্য করে তোলেনি। বরং মুসলিম জাতিকে দুটো প্রধান শিবিরে বিভক্ত করে ফেলেছিল। অর্থাৎ শিয়া ও সুন্নী শিবিরে।

এ কথা এখন ইউরোপীয় ইতিহাসবিদরাও বলেন যে, হযরত ইমাম হুসাইনের (রা) শাহাদাতের কারণে শীয়া মতটা অত্যন্ত তীব্র আকার ধারণ করে এবং শীয়ারা মুসলমানদের একটা মস্ত বড় ফের্কায় পরিণত হয়। এমনকি কোন কোন ঐতিহাসিক একথাও বলে থাকেন যে, ইমাম হুসাইন (রা) শহীদ না হলে শীয়া ফের্কার জন্মই হতোনা। তবে এ বক্তব্য অতিরঞ্জিত। কেননা রাসূল (সা) এর ইন্তিকালের অব্যবহিত পর যেদিন হযরত আলীর (রা) খলিফা হওয়া উচিত বলে প্রচার চলছিল, সেই দিনই এর ভিত্তি স্থাপিত হয়ে গিয়েছিল। খেলাফত শুধু রাসূল (সা) এর পরিবারের প্রাপ্য এবং এটা তাদের জন্যই নির্দ্ধারিত থাকা উচিত বলে যে মতের প্রচার চলতে থাকে তা ইমাম হুসাইনের (রা) শাহাদাতের পূর্ব পর্যন্ত ক্রমাগত জোরদার হতে থাকে। ইমাম হুসাইনের (রা) শাহাদাতের হৃদয় বিদারক ঘটনা দ্বারা ঐ মতটা আরো শক্তিশালী হয় এবং আরো ব্যাপক প্রসার লাভ করে।

রাসূল (সা) এর ইন্তিকালের পর মুসলমানদেরকে সর্বপ্রথম যে সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়, তা ছিল, রাসূল (সা) এর স্থলাভিষিক্ত বা উত্তরাধিকারী কে হবে? কাকে মুসলিম জাহানের কর্ণধার হিসাবে নিয়োগ করা হবে এবং কিভাবে করা হবে? এ সমস্যার সমাধান ঐক্যমত সহকারে করা সম্ভব হয়নি। বরঞ্চ এটা মুসলমানদের বিভিন্ন শ্রেণী ও গোষ্ঠীর মধ্যে মতভেদ ও বিতর্ক সৃষ্টির কারণ হয়ে দাঁড়ালো। প্রত্যেক শ্রেণী ও গোষ্ঠী নিজেকে খেলাফতের ন্যায্য অধিকারী এবং অন্য গোষ্ঠীকে তার অযোগ্য মনে করতে লাগলো।

রাসূল (সা) নিজেই যদি কাউকে তার উত্তরাধিকারী মনোনীত করে যেতেন, তাহলে এই বিতর্ক বা মতভেদ যে দেখা দিতনা, তা নিশ্চিত। কিন্তু এ ব্যাপারে কোন ওহি নাযিল না হওয়ার কারণেই সম্ভবত তিনি কিছু বলেননি। আর তাই ওহি নাযিল না হওয়া দ্বারা বুঝা যায় আল্লাহ্ তায়ালা স্বয়ং মুসলিম জাতিকে খলিফা নির্বাচনের দায়িত্ব অর্পন করে এই উম্মাতকে বিশিষ্ট সম্মানে ভূষিত করেছেন।

রাসূল (সা) এর ওফাতের পর মুসলমানগণ সরকার পরিচালনার জন্য এমন একজন সুযোগ্য লোকের প্রয়োজন অনুভব করে যিনি দৃঢ়তার সাথে মুসলিম জাহানের ঐক্য ও সংহতি রক্ষা করতে পারবেন এবং কলহ কোন্দল ও অনৈক্য থেকে মুক্ত রাখতে পারবেন। একজন সুযোগ্য খলিফা নিয়োগের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সবাই একমত

www.pathagar.com

হওয়া সত্বেও খলিফা কে হবেন, সে ব্যাপারে প্রথমে সবাই একমত হতে পারেনি। আনসাররা বলতে লাগলেন, খলিফা তাদের মধ্য থেকেই হওয়া উচিত। আর মোহাজেরদের দাবী ছিল, এ অধিকার তাদেরই হওয়া উচিত। বনু হাশেমের বক্তব্য ছিল, খেলাফত শুধু আহলে বাইতের (রাসূলের পরিবার) প্রাপ্য।

আনসারদের যুক্তি ছিল, তারা অত্যন্ত কঠিন ও বিপজ্জনক সময়ে রাসূল (সা)কে সাহায্য করেছে এবং তাঁর সাথে সব ক'টা যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছে। তাদের এই প্রানপণ লড়াই এর কল্যাণে শেষ পর্যন্ত সমগ্র আরবে ইসলামের বিজয় পতাকা উড্ডীন হয় এবং সমগ্র আরব জাতি রাসূল (সা) এর অনুগত হয়। রাসূল (সা) ইন্তিকালের সময় তাদের ওপর খুবই খুশী ছিলেন।

আনসারদের যুক্তির জবাবে মোহাজেরগণ যুক্তি দেন যে, রাসূল (সা) এর ওপর সর্বপ্রথম মোহাজেররাই ঈমান এনেছিল এবং তারা তাঁর সাথে মক্কায় কাফেরদের হাতে ভয়াবহ নির্যাতন ভোগ করেছিল। কিন্তু তারা অস্থির হয়নি। তারা সংখ্যায় কম ছিল। তথাপি এক মুহূর্তের জন্যও তারা ধৈর্য হারায়নি। তারা রাসূল (সা) এর বংশেরই মানুষ। তারা কুরাইশ বংশোদ্ভুত। সাধারণ আরবরা একমাত্র তাদেরই নেতৃত্বে ও কর্তৃত্বের অনুগত হতে পারে, অন্য কারো নয়। তাই তারাই খেলাফতের অধিকারী।

যখন আনসারদের পক্ষ থেকে প্রস্তাব দেয়া হলো, একজন খলিফা আনসারদের এবং আরেকজন মোহাজেরদের মধ্য থেকে নিযুক্ত হোক, তখন মোহাজেরগণ তার কঠোর বিরোধিতা করেন এবং কোনক্রমেই এ প্রস্তাবে রাজী হননি।

কিছুক্ষণের জন্য সাকীফায়ে বনু সায়েদা নামক স্থানে সমবেত আনসার ও মোহাজেরদের মধ্যে উত্তপ্ত অবস্থা বিরাজ করে। অবশেষে হযরত ওমরের (রা) সক্রিয় উদ্যোগে সকল বিতর্কের অবসান ঘটে এবং হযরত আবু বকরের (রা) খেলাফতে সবাই একমত হয়।

বিভিন্ন বর্ণনা থেকে জানা যায়, আনসারগণ আন্তরিকতা সহকারে হযরত আবু বকরের (রা) খেলাফত মেনে নিলেও হযরত আলী (রা) এই সমাবেশে অনুপস্থিত থাকেন এবং তাঁর অনুপস্থিতিকে কেন্দ্র করে এ ধারণার সৃষ্টি হয় যে, তিনি হযরত আবু বকরের (রা) খেলাফতকে মেনে নেননি। কেউ কেউ বলেন, তিনি এই মতে অনড় থাকেন যে, খেলাফত শুধু আহলে বাইতের প্রাপ্য। তবে তিনি সরাসরি নিজেকে খেলাফতের দাবীদার হিসাবে তুলে ধরেছেন- এমন কথা কোথাও পাওয়া যায়না। অপরদিকে ইবনে সা'দের বর্ণনা মতে, শুরুতে হযরত যুবাইর (রা) ও হযরত আলী (রা) অনুপস্থিত থাকলেও হযরত আবু বকর (রা) তাদেরকে ডেকে আনান এবং তাদের মতামত নেন। তারা উভয়ে প্রকাশ্যে হযরত আবু বকরের (রা) খেলাফতের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেন। (তারীখুল খুলাফা পৃ. ৬৪-৬৫)

এরপর হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) ও হযরত ওমরের (রা) খেলাফতকালে আর কোন বিতর্ক মাথা তোলেনি। কিন্তু হযরত উসমানের (রা) আমলে সর্বপ্রথম এই বিরোধ আবার মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে এবং বিদ্রোহীরা তার খেলাফতকে চ্যালেঞ্জ করে। শেষ পর্যন্ত বিদ্রোহীদের হাতে হযরত উসমান (রা) শহীদ হন। হযরত উসমানের (রা)

www.pathagar.com

শাহাদাতের পর খিলাফত হযরত আলীর (রা) হাতে আসে। এই সময়ে পুনরায় খিলাফতের জন্য নবীর পরিবারের অগ্রাধিকার' বিষয়টি জোরদার হয় এবং এর প্রবক্তারা বলতে থাকে ঃ

"ইমামত বা খেলাফতের ব্যাপারটা সাধারণ জনস্বার্থ ও জনকল্যাণের পর্যায়ভুক্ত নয় যে, সে ব্যাপারে জনগণকেই সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষমতা দেয়া হবে এবং তাদের নির্বাচিত ব্যক্তিই খলিফা হবার যোগ্য বিবেচিত হবে। বরং এটা ইসলামের একটা মূলনীতি। ইসলামের কোন মূলনীতির ব্যাপারে রাসূল (সা) নীরব বা নিষ্ক্রীয় থাকতে পারেননা এবং তা উম্মাতের হাতে ছেড়ে দিতে পারেন না। তাই নবীর পক্ষে তাঁর জীবদ্দশায়ই খলিফা বা ইমাম মনোনীত ও নিযুক্ত করে যাওয়া অবশ্যম্ভাবী। তাই রাসূল (সা) হযরত আলীকে (রা) খলিফা মনোনীত করে গিয়েছিলেন ইন্তিকালের পূর্বেই।" এই দাবীর স্বপক্ষে তারা কিছু হাদীসও তুলে ধরেন। তবে এই সব হাদীস অত্যন্ত বিতর্কিত এবং ইসলামের কোন মূলনীতি কখনো এমন বিতর্কিত হাদীস থেকে প্রমাণিত হতে দেখা যায়না।

রাসূল (সা) হযরত আলীকে (রা) খলিফা মনোনীত করে গেছেন- এ ধারণাটা তৎকালীন জনমনে কার্যকর থাক বা না থাক, 'আহলে বাইতের জন্য খেলাফত লাভ করার অগ্রাধিকার' সংক্রান্ত মতবাদটা সাধারণ জনমানসে অবশ্যই কার্যকর ছিল বলে মনে হয়। তাই এই মতবাদের প্রেরণায় উজ্জীবিত হয়েই মুসলমানরা হযরত আলীর (রা) শাহাদাতের পর তাঁর বড় ছেলে হযরত হাসানকে (রা) খলিফা হিসাবে গ্রহণ করার জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠে। পরবর্তীতে হযরত হাসান (রা) যখন আমীর মোয়াবিয়া (রা) এর পক্ষে খেলাফতের মসনদ ছেড়ে দেয়ার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন, তখন ইমাম হুসাইন (রা) ঐ মতবাদটার কারণেই হাসানের (রা) সিদ্ধান্ত পছন্দ করলেন না। আর এই মতবাদের কারণেই হযরত হুসাইন (রা) ইয়াযীদের খেলাফতকে মানতে অস্বীকার করেন এবং ইরাকের মুসলমানরা ইমাম হুসাইনকে (রা) খলিফা হিসেবে মেনে নেন। অবশ্য ইয়াযীদের অযোগ্যতা ও অসততাও একটা বাড়তি কারণ হিসাবে কার্যকর ছিল, তা বলার অপেক্ষা রাখেনা।

আমীর মুয়াবিয়ার (রা) মৃত্যুর পর মুসলিম উম্মাহ তিনটে গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়ে পড়ে। প্রথম গোষ্ঠীটা হলো সিরিয়ায় বনু উমাইয়া ও আমীর মুয়াবিয়ার (রা) ভক্ত ও অনুসারীগণ। তারা তার খেলাফত ও নেতৃত্বকে মেনে নিয়েছিল। দ্বিতীয় গোষ্ঠীটা ছিল বনু হাশেম গোত্রের অনুসারীরা। তাদের নেতা ছিলেন হযরত ইমাম হুসাইন (রা)। এদের দাবী ছিল, তারাই খেলাফতের প্রকৃত হকদার। তৃতীয় গোষ্ঠীটা ছিল খারেজীদের। এরা উপরোক্ত উভয় গোষ্ঠীর বিরোধী ছিল এবং উভয়কে তারা ইসলামের বহির্ভূত বলে গণ্য করতো। তাদের বক্তব্য ছিল, খিলাফাত কোন গোত্র বা পরিবারের পৈতৃক সম্পত্তি নয়। বরং এটা মুসলমানদের পারস্পরিক পরামর্শের ওপর নির্ভরশীল। মুসলমানরা পরামর্শের ভিত্তিতে যাকে খলিফা নির্বাচন করবে, সেই ব্যক্তিই খেলাফতের উপযুক্ত প্রমাণিত হবে। প্রসংগত এ কথা বলে রাখা দরকার যে, খারেজীরা মুখে ভালো ভালো কথা বললেও তারা মূলতঃ একটা চরম নৈরাজ্যবাদী, সন্ত্রাসবাদী ও মুসলিম স্বার্থবিরোধী দল ছিল। অনেকের মতে, তারা ইহুদীদের লেলিয়ে দেয়া চর ছিল। কথিত আছে, একবার হযরত

www.pathagar.com

আলী (রা) জুময়ার নামাযের খুতবা দেয়ার সময় মসজিদের বাইরে একদল খারেজী এই বলে স্লোগান দিতে থাকে যে, আল্লাহ ছাড়া আর কারো শাসন করার ক্ষমতা নেই" ইত্যাদি। তখন হযরত আলী (রা) বলেন, "এদের কথাটা সত্য, কিন্তু উদ্দেশ্যটা বাতিল।" অর্থাৎ এ কথা বলে তারা খলিফার শাসন ক্ষমতাকে চ্যালেঞ্জ করছে, যা অন্যায়। পরিশেষে এই খারেজীদের চক্রান্ত এবং তাদের নিযুক্ত গুপ্তঘাতকের হাতেই হযরত আলী (রা) শহীদ হন।

উল্লিখিত তিন গোষ্ঠীর মধ্যে কখনো সমঝোতা প্রতিষ্ঠিত হয়নি। বরং দ্বন্দ-কলহের এক অফুরন্ত ধারা অব্যাহত থাকে। আমীর মুয়াবিয়া (রা) ও ইয়াযীদের ইন্তিকালের পর হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইরের (রা) খেলাফতে অধিষ্ঠান মূলতঃ আরেকটা গৃহ যুদ্ধের সূত্রপাত ঘটায় মাত্র। এই গৃহযুদ্ধেই ইবনে যুবাইরের শাহাদাত ও তার সংক্ষিপ্ত খেলাফতের পরিসমাপ্তি ঘটে। ইমাম হুসাইনকে (রা) কারবালার ময়দানে শহীদ করে যদিও বাহ্যত নবী পরিবারের খেলাফতের অগ্রাধিকারের দাবীদারদের কণ্ঠ স্তব্ধ করে দেয়া হয়। কিন্তু মুসলিম জনমনে যে শোক ও ক্ষোভের আগুন জ্বলতে থাকে, তা নিভানোর ক্ষমতা উমাইয়া শাসকদের ছিলনা। এই আগুনই শেষ পর্যন্ত বনু উমাইয়ার রাজত্বকে ধ্বংস করে ছাড়ে।

ইমাম হুসাইন (রা) ব্যক্তিগত স্বার্থে খেলাফতের দাবীদার ছিলেন না। তিনি খিলাফতকে নিজের মর্যাদা ও ধন সম্পদ অর্জনের পন্থা মনে করে তা অর্জন করার মোহে ও উচ্চাভিলাষে অনুপ্রাণিত হয়ে লড়াই করে নিহত হননি, যেমন হযরত উসমান (রা) ব্যক্তিস্বার্থের মোহে খিলাফত থেকে পদত্যাগ করতে অস্বীকার করে শহীদ হননি। হযরত উসমান (রা) যেমন খিলাফতকে জনগণের পক্ষ থেকে অর্পিত পবিত্র দায়িত্ব মনে করতেন এবং সর্বস্তরের জনগণের দাবী ছাড়া কেবল গুটিকয় লোকের দাবীর মুখে পদত্যাগ করা বৈধ মনে করেননি, ইমাম হুসাইন (রা) তেমনি সাধারণ মুসলমানদের অনুরোধে এবং খেলাফতের জন্য ইয়াযীদকে চরম অযোগ্য পাত্র বিবেচনা করে খেলাফতের দায়িত্ব গ্রহণে সম্মত হন। তাকে এই দায়িত্ব গ্রহণে সবচেয়ে বেশী পীড়াপীড়ি ইরাকী জনগণ এবং বিশেষত কুফাবাসীই করেছিল। তারা তাকে চিঠি লিখে দাওয়াত দিয়েছিল যে, আপনি কুফায় চলে আসুন, আমরা আপনাকে সর্বতোভাবে সাহায্য করবো। শত্রুর বিরুদ্ধে যদি যুদ্ধও করতে হয়, তবে আমরা আপনার কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে যুদ্ধ করবো।

ইমাম হুসাইন (রা) নিজের একান্ত বিশ্বস্ত জনৈক সংগীকে কুফায় প্রেরণ করেন, যাতে তিনি প্রকৃত অবস্থা জেনে আসতে পারেন। এই ব্যক্তি ইমাম হুসাইনকে (রা) লিখে পাঠান যে, সত্যিই ইরাকবাসী আপনার সমর্থক। আপনি নির্দিধায় চলে আসুন। তাই ইমাম হুসাইন (রা) নিজের পরিবার-পরিজন ও কয়েকজন সাথী নিয়ে ইরাক চলে যান।

ইরাকে গিয়ে যুদ্ধ করা ইমাম হুসাইনের (রা) উদ্দেশ্য ছিলনা। তা যদি হতো তবে তিনি পরিবার পরিজনকে সাথে নিয়ে যেতেন না। ছেলেমেয়েদেরকে সাথে নিয়ে মানুষ আর যেখানেই যাক, যুদ্ধক্ষেত্রে যায় না। তিনি যদি সত্যিই বিদ্রোহ ঘটিয়ে অরাজক পরিস্থিতি

www.pathagar.com

সৃষ্টির মাধ্যমে ইয়াযীদকে ক্ষমতাচ্যুত করতে চাইতেন, তাহলে তিনি কুফায় যাওয়ার জন্য অতটা তাড়াহুড়া করতেন না। তিনি মক্কায় বসেই তাঁর অনুচরদের মাধ্যমে সমগ্র মুসলিম জাহানে বিদ্রোহের আগুন জ্বালাতে পারতেন। এভাবে তিনি অতি সহজেই তার উদ্দেশ্য সফল করতে পারতেন।

ইমাম হুসাইন (রা) কেবল তখনই কুফা রওনা হন, যখন তিনি নিশ্চিত হন যে, সমগ্র ইরাকবাসী তার পক্ষে রয়েছে। তারা তাঁর আনুগত্যের শপথ নিয়েছিল এবং আশ্বাস দিয়েছিল, আমরা সর্বাবস্থায় আপনাকে সাহায্য করবো। কিন্তু তিনি পথিমধ্যে জানতে পারেন, কুফাবাসী তার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে এবং তার পক্ষ ত্যাগ করে ইয়াযীদের নিযুক্ত কুফার গভর্ণর ইবনে যিয়াদের পক্ষ নিয়েছে। এ কথা জানা মাত্রই তিনি মক্কা ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। এই সময় তিনি বিপরীত দিক থেকে আগত একদল কুফাবাসীর সম্মুখীন হন। তিনি তাদের উদ্দেশ্যে বলেন ঃ

"ওহে কুফাবাসী, তোমরা তো আমার সাহায্য করার ইচ্ছা পরিত্যাগ করেছ এবং আমার আনুগত্যের অংগীকার ভংগ করেছ। কাজেই আমি তোমাদেরকে ত্যাগ করে চলে যাচ্ছি, কেননা তোমাদের মত লোকদেরকে পুনরায় আমার আনুগত্যের আহ্বান জানানো আমার জন্য শোভনীয় নয় এবং আমার সমর্থন ও সাহায্য করার অনুরোধ জানানোরও কোন অর্থ হয়না।"

এর দ্বারা বুঝা যায়, ইমাম হুসাইন (রা) কত শান্তিপ্রিয় ছিলেন এবং বিশৃংখলা ও অরাজকতা কিভাবে এড়িয়ে চলতে চেষ্টা করতেন। তাঁর মত তাঁর শত্রুরাও যদি শান্তিপ্রিয় হতো এবং বিশৃংখলা ও রক্তপাত এড়িয়ে চলতে চাইত, তাহলে তাদেরকে অবরোধ করে মক্কা ফিরে যেতে বাধা দিতনা। কিন্তু তাদের উদ্দেশ্যই ছিল ইমাম হুসাইন (রা) ও তাঁর সাথীদেরকে হত্যা করে ইয়াযীদকে খুশী করা। এ জন্য তারা ইমাম হুসাইনের (রা) আপোষ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে এবং কারবালার হৃদয়বিদারক ঘটনা ঘটায়। আর তাঁর শাহাদাতের মধ্য দিয়ে খিলাফতে রাশেদা পুনর্বহালের শেষ আশাও নস্যাত হয়ে যায়।

রক্তপাত ও যুদ্ধ যেহেতু কখনোই ইমাম হুসাইনের (রা) উদ্দেশ্য ছিলনা। তাই তিনি যখনই কুফাবাসীর বিশ্বাসঘাতকতার কথা জানতে পারলেন, তখনই মক্কা ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এ সিদ্ধান্ত তিনি আর কার্যকর করতে পারেননি। তিনি উপরোক্ত ভাষণ দিয়ে মক্কার দিকে ফিরে যাওয়ার আগেই উবাইদুল্লাহ্ বিন যিয়াদের লেলিয়ে দেয়া গোয়েন্দা বাহিনী দ্বারা অবরুদ্ধ হয়ে পড়েন। তাদের কাছে তিনি রক্তপাত এড়ানোর জন্য তিনটে প্রস্তাব দেন। প্রথমত, হয় তাকে মদীনায় বা মক্কায় ফিরে যেতে দেয়া হোক। দ্বিতীয়ত, নতুবা তুর্কী সীমান্তের দুর্গে অবস্থান করতে দেয়া হোক। তৃতীয়ত, অথবা ইয়াযীদের সাথে আলোচনার জন্য তাকে দামেস্কে প্রেরণ করা হোক। কিন্তু উবাইদুল্লাহর লোকেরা তাকে বিনা শর্তে আত্মসমর্থন ছাড়া আর কোন বিকল্প পথ অবলম্বনের অনুমতি দিল না। এরই ফলে যুদ্ধ অনিবার্য হয়ে ওঠে।

www.pathagar.com

হযরত আলীর (রা) খেলাফত

খেলাফত ও রাজতন্ত্র সম্পূর্ণ পরস্পর বিরোধী জিনিস। তা সত্তেও এক শ্রেণীর ঐতিহাসিক খোলাফায়ে রাশেদীনের পর বনু উমাইয়া ও বনু আব্বাস বংশের রাজাদেরকেও খলিফা উপাধিতে ভূষিত করেছে। খেলাফতের অত্যাবশ্যকীয় উপাদান হলোঃ (১) পরামর্শভিত্তিক নিয়োগ ও পরামর্শ ভিত্তিক রাষ্ট্র পরিচালনা (২) কুরআন ও সুন্নাহর ভিত্তিতে ইনসাফ ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা (৩) সৎ কাজের আদেশ ও অসৎকাজ থেকে নিষেধ (৪) সকল পর্যায়ে তাকওয়া তথা সততাভিত্তিক ও দুর্নীতিমুক্ত নেতৃত্ব (৫) অবাধ সমালোচনার অধিকার (৬) রাষ্ট্রীয় কোষাগারের হেফাজত ও আমানতদারী। এই উপাদানগুলোর আলোকে বনু উমাইয়া ও বনু আব্বাস বংশের রাজাদের দিকে দৃষ্টি দিলে একমাত্র হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আযীয ছাড়া আর কারো মধ্যে এমন কোন গুণবৈশিষ্ট পাওয়া যায়না যার ভিত্তিতে তাদেরকে ‘খলিফা'র ন্যায় পবিত্র উপাধিতে ভূষিত করা যায়। তারা মুসলমানদের পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে খেলাফত লাভ করেনি, বরং অন্যান্য রাজা বাদশাহদের ন্যায় উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করেছে। বাপ থেকে ছেলে এবং ভাই থেকে ভাই এর হাতে শাসনক্ষমতা হস্তান্তরই রাজতন্ত্রের চিরন্তন রীতি। রাজনীতির যে পদ্ধতি তারা নিজেদের জন্য স্থির করে নিয়েছিল, তা খোলাফায়ে রাশেদীনের অনুসৃত রীতি থেকে সম্পূর্ন পৃথক।

ইসলামে রাজতান্ত্রিক শাসনের ভিত্তি পত্তন সর্বপ্রথম হযরত আমীর মুয়াবিয়া (রা) করেন। হযরত আমীর মুয়াবিয়া (রা) ও হযরত আলীর (রা) দ্বন্দ্বের মূল কারণও ছিল আমীর মুয়াবিয়া (রা) অনুসৃত এই স্বেচ্ছাচারী রাজনীতি। একথা সত্য, আমীর মুয়াবিয়া (রা) যে পার্থিব সাফল্য লাভ করেন, হযরত আলী (রা) তা লাভ করতে পারেননি। আরবের মুসলমান গোত্রগুলোর বিরাট সংখ্যাগুরু অংশ হযরত আলীর (রা) নেতৃত্ব বাদ দিয়ে আমীর মুয়াবিয়ার (রা) নেতৃত্বের আনুগত্য করে। অথচ মুসলমানদের খলীফা ছিলেন হযরত আলী (রা)। কারণ বিজয়ের পর বিজয় অর্জন এবং বিজিত দেশগুলোর সমস্ত ধনসম্পদ আরবের কোষাগারে সঞ্চিত হওয়ার পর মুসলমান গোত্রগুলো আরাম আয়েশ ও বিলাস জীবন যাপন করার দিকে ঝুঁকে পড়ে। কিন্তু তাদের এই অভিলাষ পূরণের পথের সবচেয়ে বড় বাধা ছিলেন স্বয়ং হযরত আলী (রা)। আরাম আয়েশ থেকে তিনি সব সময় দূরে থাকতেন। বিলাসিতার সাথে তার কোন সম্পর্কই ছিলনা। তিনি ছিলেন অত্যধিক পরিশ্রমী ও ন্যায়নিষ্ঠ শাসক। হক ও ইনসাফের সর্বোচ্চ দৃষ্টান্ত স্থাপন করা ছিল তাঁর লক্ষ্য। কোন দুর্বল ব্যক্তিকে তাঁর দরবারে এসে সুবিচার না নিয়ে ফিরে যেতে হতোনা। আর কোন প্রতাপশালী ব্যক্তিরও সাধ্য ছিলনা তার চোখকে ফাঁকি দিয়ে কোন দুর্নীতি

www.pathagar.com

করে। তাঁর এই কঠোর নীতি শুধু অন্যদের ক্ষেত্রেই নয়, বরং নিজের ছেলেদের, সহযোগীদের ও বন্ধুদের ক্ষেত্রেও কার্যকর ছিল। তাঁর সহোদর ভাই আকীলের এ ঘটনা অনেকেই জানে যে, তিনি যখন নিজের প্রাপ্য অংশের অতিরিক্ত কিছু অর্থ বাইতুল মাল থেকে দেয়ার জন্য তাঁকে অনুরোধ করলেন, তখন হযরত আলী (রা) তা দিতে সরাসরি অস্বীকার করলেন। এরপর আকীল সহোদর আলী (রা)কে ত্যাগ করে আমীর মুয়াবিয়ার (রা) পক্ষ অবলম্বন করেন। আমীর মুয়াবিয়া (রা) তাকে তিন লাখ দীনার দিলেন। এর প্রতিক্রিয়ায় আকীল যে মন্তব্য করেন, তা একটা প্রবাদের মত খ্যাতি লাভ করেছে।

"আমার ভাই আমার আখেরাতের জন্য ভালো, আর মুয়াবিয়া আমার দুনিয়ার জন্য ভালো।"

এমন ন্যায়পরায়ণ লোকের দ্বারা স্বার্থপর ও লোভাতুর লোকদের কোন আশা পুরণ হতে পারেনা এবং তারা এ ধরনের নেতার ভক্ত ও অনুরক্ত হয়না। এ ধরনের লোকদের আশ্রয়স্থল ছিলেন আমীর মুয়াবিয়া (রা)। এই শ্রেণীর হাজার হাজার লোক হযরত আলীর (রা) সংগ ত্যাগ করে আমীর মুয়াবিয়ার (রা) দলে যোগ দিয়েছিল এবং এর প্রতিদান স্বরূপ তার কাছ থেকে বিপুল পুরস্কার ও পারিতোষিক লাভ করেছিল, যা হযরত আলীর (রা) কাছ থেকে তারা কোনক্রমেই পেতনা।

কিশোর বয়সেই ইসলাম গ্রহণ ও কৈশোর থেকেই ইসলামের ছায়াতলে ও রাসূল (সা) এর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে লালিত পালিত হওয়ার কারণে ইসলামী ন্যায়নিষ্ঠা, সততা, পবিত্রতা, খোদাভীতি, শরীয়তের হুকুমের আনুগত্য বলতে গেলে হযরত আলীর (রা) অস্থিমজ্জায় মিশে গিয়েছিল। সরল ও সাদাসিধে জীবন যাপন এবং আরাম আয়েশ ও বিলাসব্যসন বর্জন তাঁর চরিত্রের ভূষন হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ধর্মীয় দিক থেকে তিনি ছিলেন সর্বোচ্চ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত। ফেকাহ ও ইসলামের যাবতীয় বিষয়ে তাঁর পারদর্শিতা ছিল অতুলনীয়। রাজনীতি সমরনীতি অথবা দুনিয়াবী যে কোন ক্ষেত্রে তার তৎপরতায় ধর্মীয় দিকটাই সর্বাধিক গুরুত্ব লাভ করতো। তিনি পার্থিব লোভ-লালসাকে কখনো সত্য ও ন্যায়নীতির ওপর অগ্রাধিকার লাভের সুযোগ দিতেন না। প্রবৃত্তির কামনা বাসনা থেকে তিনি সব সময় দূরে থাকতেন এবং লোভ লালসা কখনো তার ধারে কাছেও ঘেঁষতে পারতোনা।

কয়েক বছর আগ পর্যন্তও একজন সফল রাজনীতিকের জন্য এই গুণগুলো শুধু যথেষ্ট ছিল তা নয়, বরং অত্যাবশ্যক ছিল। তাই প্রথম দুই খলিফা এই গুণাবলীতে ভূষিত হয়ে অত্যন্ত সফলতার সাথে রাষ্ট্র পরিচালনা করে গেছেন। কিন্তু তৃতীয় খলিফা হযরত উসমানের (রা) আমল থেকে পরিস্থিতি ভিন্ন দিকে মোড় নিতে শুরু করে। ফলে হযরত আলীর (রা) হাতে যখন খেলাফত এলো, তখন দুনিয়াদারী ভাবধারা এত প্রবল হয়ে

www.pathagar.com

পড়লো যে, একই নৈতিক গুণাবলীর অধিকারী হয়েও তিনি প্রথম দুই খলিফার মত সফলতার মুখ দেখতে পারলেন না। তাঁর খোদাভীতিপূর্ণ রাজনীতি হয়ে পড়লো অপাংক্তেয় ও অচল। এ সময়ে একজন সফল রাষ্ট্রনায়কের যে সব উপকরণের প্রয়োজন ছিল তা তাঁর কাছে ছিলনা। এ সময় সফল রাজনীতি বলতে বুঝাতো মিথ্যাচার ও প্রতারণাকে। সফল রাজনীতিক ও শাসক হতে পারতো কেবল সেই ব্যক্তি, যে প্রত্যেক বৈধ ও অবৈধ কৌশল দ্বারা বিরোধীদেরকে পরাভূত করতে পারতো। হযরত আলী (রা) এ সব কোথায় পাবেন? তিনি ছিলেন একজন ইসলামী সংস্কারক। দুনিয়ার প্রতিটা কাজ তিনি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য করতেন, কোন মানুষের সন্তুষ্টির জন্য নয়। হযরত আদী ইবনে হাতেম আমীর মুয়াবিয়ার (রা) সামনে হযরত আলীর (রা) চরিত্রের যে বিবরণ দিয়েছিলেন, সেটাই তার ব্যক্তিত্বের সর্বোত্তম চিত্র:

"আলী (রা) সত্য ও ইনসাফ ভিত্তিক কথা বলেন। তিনি যে সিদ্ধান্ত দেন তা হয়ে থাকে অকাট্য, সত্যনিষ্ঠ ও ন্যায়বিচারভিত্তিক। তাঁর হৃদয়, প্রজ্ঞা ও বিচক্ষণতার উৎস। তাঁর চারপাশ থেকে ফুটে ওঠে জ্ঞানের ঝর্ণাধারা। দুনিয়া ও তার আরাম আয়েশ দেখলে তিনি ঘাবড়ে যান এবং আতংকিত হন। রাতের অন্ধকারে তিনি শান্তি পান। তিনি অত্যধিক অশ্রু বর্ষণকারী এবং অত্যধিক ধ্যানী। একাকীত্বে আত্মসমালোচনা করেন। অনাড়ম্বর পোশাক ও সাধারণ খাদ্য পছন্দ করেন। নিজের জন্য কোন জাঁকজমক পছন্দ করেন না। মানুষের সাথে যখন মেলামেশা করেন, তখন সাধারণ মানুষের মতই করেন। ধার্মিক লোকদেরকে খুবই ভক্তি করেন। দরিদ্র লোকদেরকে খুই ভালোবাসেন। কোন প্রভাবশালী লোক কোন দুর্বল মানুষের ওপর অত্যাচার করে তাঁর শাস্তি থেকে রেহাই পায়না। কোন দুর্বল মানুষ তাঁর ইনসাফ থেকে নিরাশ হয়না। আল্লাহর কসম, আমি একদিন তাকে মসজিদে দেখেছি। গভীর রাত। কিন্তু তিনি তখনো মেহরাবে দাঁড়িয়ে। তাঁর চোখ থেকে অশ্রু গড়িয়ে দাড়ি ভিজিয়ে দিচ্ছিল। তাঁর অস্থিরতা ও ব্যাকুলতার কোন সীমা পরিসীমা ছিলনা। চরম দুশ্চিন্তাগ্রস্থ মানুষের মত কাঁদছিলেন আর বলছিলেন ঃ

"ওহে দুনিয়া, তুমি আর আমার কাছে আসতে পারবেনা। আমি তোমাকে তিন তালাক দিয়েছি। এখন তোমার আমার কাছে আসার কোন উপায় নেই।"

নিজের যেমন কঠোর সমালোচনায় সর্বক্ষণ মগ্ন থাকতেন, তেমনি নিজের অধীনস্থদেরও কঠোর সমালোচনা করতেন। এ কারণেই তাদের অনেকে তাঁর সাহায্য সহযোগিতা থেকে বিরত থাকে এবং তাঁকে ত্যাগ করে চলে যায়। মুসাক্কালী বিন হুবাইরা শাযরানী এবং চাচাতো ভাই আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস এই শ্রেণীর লোকদেরই অন্তর্ভুক্ত। প্রথম প্রথম এরা দু'জন তাঁর ঘনিষ্ঠ সহযোগী ও কট্টর সমর্থক ছিলেন। কিন্তু পরে তার সমর্থক হিসেবে আর বহাল থাকেনি। হযরত যুবাইর (রা) ও তালহাকেও (রা) (জীবদ্দশায়

www.pathagar.com

বেহেশতের সুসংবাদপ্রাপ্ত দশজন সাহাবীর অন্যতম) তিনি অসন্তুষ্ট করে ফেলেন। একটু আপোষহীন ও নমনীয় হলেই তাদেরকে সাথে রাখতে পারতেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) ও মুগীরা ইবনে শু'বা (রা) তাঁকে পরামর্শ দিয়েছিলেন যে, আপনি মুয়াবিয়া (রা) ও হযরত উসমানের (রা) নিযুক্ত অন্যান্য কর্মকর্তাদেরকে ততক্ষণ পর্যন্ত বরখাস্ত করবেন না, যতক্ষণ না তারা আপনার আনুগত্যের শপথ নেয় এবং বর্তমান অস্থিরতা ও উত্তেজনা দূর হয়ে পরিস্থিতি শান্ত ও স্বাভাবিক না হয়। এরপর আপনি যাকে ইচ্ছা বরখাস্ত করবেন এবং যাকে ইচ্ছা বহাল রাখবেন। কিন্তু তিনি তাদের এ পরামর্শ মানলেন না। তিনি বললেন ঃ

"আমি ইসলামের পথে কোন প্রতিবন্ধকতারও সৃষ্টি করবোনা। এবং প্রশাসনের কোথাও কোন বক্রতাও সহ্য করবোনা।"

তারা উভয়ে বললেন ঃ "আপনি যদি হযরত উসমানের (রা) নিযুক্ত কর্মকর্তাদেরকে বরখাস্ত করতেই চান, তবে অন্ততপক্ষে হযরত মুয়াবিয়াকে (রা) বহাল রাখুন। কেননা মুয়াবিয়া (রা) খুবই প্রভাবশালী। সিরিয়াবাসী তার পুরোপুরি অনুগত। তাছাড়া আপনার পূর্বে হযরত উমর (রা) যখন তাকে সিরিয়ার শাসক নিয়োগ করেছেন, তখন আপনার আপত্তি করার অবকাশ নেই। প্রসংগত উল্লেখ্য, পূর্ববর্তী খলিফার সকল নিয়োগকে বহাল রাখতে পরবর্তী খলিফা শরীয়তের কোন্ বিধান অনুসারে বাধ্য, সেটা তারা দু'জনে উল্লেখ করেননি। একমাত্র পরিস্থিতির প্রতিকূলতাই সম্ভবত তাদের পরামর্শের ভিত্তি ছিল। হযরত আলী (রা) তাদের পরামর্শ সরাসরি প্রত্যাখ্যান করে বললেন ঃ "আল্লাহর কসম, আমি মুয়াবিয়াকে (রা) দু'দিনের জন্যও বহাল রাখবোনা।"

আপোষকামিতা ও ধোকাবাজী হযরত আলীর (রা) ধারে কাছেও ঘেঁষতে পারতোনা। তিনি সব সময় সত্য কথা বলতেন এবং তাতে কেউ খুশী হলো কি, নাখোশ হলো তার আদৌ কোন পরোয়া করতেন না।

মুসলমান বিদ্রোহীদের সাথে একটা ভয়ংকর যুদ্ধ করে যখন হযরত আলীর (রা) বাহিনী তাদেরকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করলো, তখন তিনি তার সৈন্যদেরকে বললেন ঃ

'সাবধান, শত্রুদের মধ্য থেকে কাউকে বন্দী করবেনা, কোন আহত ব্যক্তির ওপর হাত তুলবেনা এবং কারো কোন মাল জিনিস কেড়ে নেবেনা।"

তাঁর বাহিনী তাঁর এ সব নির্দেশ পুরোপুরিভাবেই কার্যকরী করলো। কাউকে বন্দীও করলোনা। কোন আহত ব্যক্তির ওপরও হাত তুললোনা এবং কারো কোন মালজিনিসও কেউ কেড়ে নিলনা। যখন এক ব্যক্তি তাকে জিজ্ঞেস করলো ঃ "আমীরুল মুমিনীন, আপনি যখন তাদেরকে বন্দী করতে ও তাদের মাল জিনিস গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন, তখন তাদের সাথে যুদ্ধ করা আমাদের জন্য কিভাবে জায়েয হলো? তখন

www.pathagar.com

হযরত আলী (রা) জবাব দিলেনঃ

তাওহীদবাদী ও কলেমা পাঠকারীদেরকে বন্দীও করা যায়না, তাদের ধমসম্পদও গণীমত হিসেবে নেয়া যায়না। তবে তারা বিদ্রোহ করলে তাদের সাথে লড়াই করা জায়েয। কাজেই যে সব বিষয়ের সূক্ষ্মতত্ত্ব তোমরা জাননা, তা নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করোনা। যা কিছু নির্দেশ দিয়েছি, মেনে চল।"

শত্রুদের ওপর নমনীয়তার রহু দৃষ্টান্ত রেখেছেন হযরত আলী (রা)। সিফফীনে আমীর মোয়াবিয়ার (রা) সৈন্যদের সাথে তার যুদ্ধ সংঘটিত হয়। সেই যুদ্ধে প্রথমে তারা জলাশয় দখল করে নিয়েছিল। দখল করে নেয়ার পর হযরত আলীর (রা) সৈন্যদেরকে তারা পানি দেয়নি। কিন্তু পরে যখন পানির ওপর হযরত আলীর (রা) সৈন্যরা নিয়ন্ত্রণ ফিরে পেল, তখন তিনি আমীর মুয়াবিয়ার (রা) মত তাঁর বাহিনীকে পানি দিতে অস্বীকার করেননি। সবাইকে পানি নেয়ার অবাধ অনুমতি দিয়েছিলেন। অনুরূপভাবে হযরত আমীর মুয়াবিয়া (রা) নিজের রাজতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থাকে সফল করার জন্য হযরত আলী (রা)কে প্রকাশ্যে নিন্দা করার প্রথা চালু করেন। কিন্তু হযরত আলী (রা) স্বীয় সমর্থকদেরকে কঠোরভাবে নিষেধ করে দেন যেন আমীর মুয়াবিয়ার (রা) নিন্দা সমালোচনা না করা হয়। একবার তিনি যখন জানতে পারলেন যে, তাঁর দু'জন সমর্থক আমীর মুয়াবিয়ার (রা) নিন্দা করে এবং সিরিয়াবাসীকে শাপ শাপান্ত করে, তখন তিনি তাদেরকে ডেকে পাঠালেন এবং তাদের ঐ কাজের জন্য কৈফিয়ত তলব করলেন। তারা বললেন ঃ

"হে আমীরুল মুমিনীন, আমরা কি সত্যের অনুসারী নই আর ওরা কি বাতিলের অনুসারী নয়?" হযরত আলী (রা) বললেন ঃ "অবশ্যই আমরা সত্যের অনুসারী। কিন্তু তোমরা গালাগালকারী ও অভিসম্পাতকারীদের দলভুক্ত হও, এটা আমার খুবই অপছন্দ। তোমরা অভিসম্পাত করার পরিবর্তে আল্লাহর কাছে দোয়া কর, হে আল্লাহ! আমাদের মধ্যে যে রক্তপাত হচ্ছে, তা বন্ধ করে দাও। আমাদেরকে শান্তি ও আপোষের সাথে একত্রে বসবাস করার তওফীক দাও। তাদেরকে বাতিলের পথ বর্জন করে সত্যের অনুসারী হওয়ার এবং বিদ্রোহের পথ ত্যাগ করে ন্যায় সংগত পথ অনুসন্ধানে উদ্বুদ্ধ কর।"

এ ছাড়া তিনি নিজের প্রবৃত্তি দমন ও নিজের কার্যকলাপের সমালোচনায়ও অত্যন্ত কঠোর ছিলেন। তিনি যে কত বড় আত্মসংযমী ছিলেন, তার একটা জ্বলজ্যান্ত উদাহরণ হলো ঃ খয়বরের যুদ্ধে যখন এক ইহুদী সৈন্যকে তিনি পরাজিত করে তার বুকের ওপর চড়ে বসলেন, তখন সে জীবন সম্পর্কে হতাশ হয়ে হযরত আলীর (রা) মুখে থু থু দিল। হযরত আলী (রা) তৎক্ষণাত তার তরবারী ছুড়ে ফেলে দিয়ে তার বুকের ওপর থেকে নেমে উঠে দাঁড়ালেন। তিনি বললেন ঃ "তুমি থু থু দেয়ার পর তোমার ওপর আমার

www.pathagar.com

ব্যক্তিগত আক্রোশ প্রবল হয়ে উঠেছে। এর আগে তোমার সাথে আমার শত্রুতা ছিল আল্লাহ ও তাঁর দ্বীনের জন্য। কিন্তু এখন ওটা হয়ে গেছে ব্যক্তিগত। ব্যক্তিগত আক্রোশের বশে কাউকে হত্যা করা মুসলমানের জন্য বৈধ নয়।"

আর নিজের ওপর কঠোর হওয়ার কারণে অধীনস্থদের ওপরও তিনি স্বাভাবিকভাবেই কঠোর হতে পেরেছিলেন। তাঁর দু'জন বিশিষ্ট কর্মচারী মুসাক্কালা বিন হুবাইরা শায়বানী এবং ইয়াযীদ বিন হাজামবা তাইমী তাঁর কঠোরতা সহ্য করতে না পেরে তাঁকে ছেড়ে চলে যায় এবং মুয়াবিয়ার (রা) অধীনে চাকুরী গ্রহণ করে। ইয়াযীদ বিন হাজামবাকে হযরত আলী (রা) 'রায়' অঞ্চলের শাসনকর্তা নিয়োগ করেছিলেন। সে খাজনার বিশ হাজার দিরহাম আত্মসাত করে। ব্যাপারটা জানতে পেরে তিনি তাকে ডেকে পাঠান। তিনি তাকে তার অপরাধের জন্য বেত্রাঘাত করেন ও কারাবন্দী করেন। কারামুক্ত হয়ে সে মুয়াবিয়ার (রা) কাছে যাওয়া মাত্রই একই বেতনে সিরিয়ায় চাকুরী পায় এবং পরবর্তীকালে মুয়াবিয়া (রা) তাকে ইরাকের শাসনকর্তা নিয়োগ করেন।

উল্লেখিত আলোচনা থেকে বুঝা গেল, আদর্শ নেতৃত্ব, উঁচুমানের নৈতিক চরিত্র, মহত্ত্ব, উদারতা ও শরীয়তের আনুগত্যের মত গুণাবলীর বিচারে একমাত্র হযরত আলীই (রা) খেলাফতের সুযোগ্য উত্তরাধিকারী ছিলেন। মুসলিম উম্মাহর সর্বোচ্চ শাসক ও তত্ত্বাবধায়কের দায়িত্ব একমাত্র তাঁর হাতেই সোপর্দ হওয়া উচিত ছিল।

কিন্তু ভাগ্যের নির্মম পরিহাস, যা হওয়া উচিত ছিল তা হয়নি। অপরদিকে যে বিদ্রোহ দমন করা শরীয়তের দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ বৈধ ছিল, তা দমন করতে ব্যর্থ হয়ে হযরত আলী (রা) নিজের ও গোটা খেলাফতে রাশেদার পতন অনিবার্য করে তুলেছিলেন। যে আমীর মুয়াবিয়াকে (রা) ক্ষমতাচ্যুত করার ক্ষমতা তাঁর নেই, তাকে বরখাস্ত করার আদেশ দিয়ে তিনি নিজের পতনকেই ত্বরান্বিত করেছিলেন। ঐ আদেশটা না দিলে হয়তো তাঁকে অমন শোচনীয় পরিণতির সম্মুখীন হতে হতোনা।

www.pathagar.com

আমীর মুয়াবিয়ার (রা) শাসনকাল ও রাজনীতি

ঐতিহাসিক মুর বলেছেন ঃ "দামেস্কে মুয়াবিয়ার (রা) সিংহাসনে আরোহন খিলাফতের সমাপ্তি ও রাজতন্ত্রের প্রারম্ভ সূচনা করে।" আমীর আলীর মতে "ইমাম হাসানের (রা) পদত্যাগের পর মুয়াবিয়া (রা) ইসলামের একজন স্বঘোষিত ও কার্যত একচ্ছত্র সম্রাট হলেন।...... তিনি ছিলেন ধূর্ত, অসৎ, তীক্ষ্ণ মেধা সম্পন্ন, কৃপণ অথচ প্রয়োজনবোধে অস্বাভাবিক উদার এবং যাবতীয় ধর্মীয় কাজে বাহ্যতঃ নিষ্ঠাবান। কিন্তু তার কোন পরিকল্পনা অথবা আকাংখা চরিতার্থ করার পথে কোন মানবীয় বা ধর্মীয় নীতি ও মূল্যবোধ বাধা সৃষ্টি করতে পারতোনা।" বস্তুত আরব সীজার নামে খ্যাত মুয়াবিয়া (রা) যদিও প্রথম জীবনে ইসলাম গ্রহণ করে রাসূল (সা) এর ব্যক্তিগত সহকারী ওহি লেখক ও হযরত ওমরের খিলাফতকালে সিরিয়ার শাসনকর্তা ছিলেন, কিন্তু শেষ জীবনে চরম ধূর্ততা, কপটতা ও অসাধুতার আশ্রয় নিয়ে ইমাম হাসানের (রা) সাথে সম্পাদিত চুক্তির অবমাননা করে নিজের অযোগ্য ও মদ্যপ ছেলে ইয়াযীদকে মুসলিম জাহানের পরবর্তী শাসক ও সম্রাট নিয়োগ করে যান এবং নব্বই বছর ব্যাপী উমাইয়া সাম্রাজ্যের পত্তন করেন। ইসলামে তিনিই সর্বপ্রথম রাজতন্ত্রের প্রবর্তন করেন এবং তিনি নিজেই বলতেন, "আমিই প্রথম মুসলিম সম্রাট।"

কোরাইশ বংশের প্রধান দুটো শাখা বনু উমাইয়া ও বনু হাশেম। এই দুটো শাখার মধ্যে আগে থেকেই দ্বন্দ্ব-কলহ ও হিংসা দ্বেষ বিরাজিত ছিল। উভয়ে নিজ নিজ আভিজাত্য নিয়ে প্রতিযোগিতা করতো। রাসূল (সা) বনুহাশেম শাখায় জন্মগ্রহণ করেন। তারপর তিন জন খলিফা হযরত আবু বকর (রা), ওমর (রা) ও আলী (রা) এই বনু হাশেম শাখা থেকেই হন। একমাত্র হযরত উসমান (রা) ছিলেন বনু উমাইয়া শাখা থেকে। কিন্তু তিনি বনু উমাইয়ার রাজত্ব প্রতিষ্ঠা না করলেও তাঁর আমলে উমাইয়া গোত্রীয় আমীর মুয়াবিয়া (রা) সিরিয়ায় নিজের মজবুত ঘাঁটি গড়ে তুলতে সক্ষম হন এবং সেখানে উমাইয়া রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেন।

বনু হাশেমের নবুয়তের গৌরব অর্জন কোন প্রতিযোগিতার বিষয় ছিলনা। তারা এটা অর্জনের জন্য কোন চেষ্টা সাধনা বা যুদ্ধ করেনি এবং কোন পার্থিব চেষ্টা সাধনা দ্বারা তা অর্জন করাও যায়না। আল্লাহ তায়ালা নিজেই বলেছেনঃ "আল্লাহ কাকে নবুয়ত দেবেন, সেটা তিনিই ভালো জানেন।" সুতরাং অন্য কোন আরব গোত্রের পক্ষে এই গৌরব অর্জন করে আভিজাত্যে বনুহাশেমের সমকক্ষ হওয়া সম্ভব ছিলনা। রাসূল (সা) এর নবুয়ত ঘোষণার পর মক্কার সকল নেতা ও সরদার তার বিরোধিতা শুরু করে এবং তার নবুয়তের দাবী ও মিশনকে সম্পূর্ণ ব্যর্থ করে দেয়ার সর্বাত্মক চেষ্টা চালায়। কিন্তু আল্লাহ তাদের সেই চেষ্টাকে সফল হতে দেননি। তারা ইসলামের প্রতিষ্ঠা ও বিকাশের পথ রোধ করতে পারেনি। এমনকি আরবের এইসব নেতাকে শেষ পর্যন্ত ইচ্ছায় হোক-

www.pathagar.com

অনিচ্ছায় হোক ইসলাম গ্রহণ করতে হয়। এই সব নেতা ও সরদারের মধ্যে বনু উমাইয়া শাখার আবু সুফিয়ান ও তার ছেলে আমীর মুয়াবিয়াও ছিলো, যারা মক্কা বিজয়ের পর ইসলাম গ্রহণ করেন। সাহাবী হিসাবে মর্যাদা লাভ করলেও তারা উভয়ে রাসূল (সা) এর দীর্ঘস্থায়ী সান্নিধ্য ও প্রশিক্ষণ লাভ করেননি এবং সে কারণে ইসলামের মূলশিক্ষা ও নৈতিক প্রভাব তাদের অন্তরে ও চরিত্রে দৃঢ়ভাবে বদ্ধমূল হবার সুযোগ পায়নি।

আবু সুফিয়ানের ছেলেদের মধ্যে তিনজন সমধিক খ্যাতি অর্জন করেন। একজন ইয়াযীদ ইবনে আবু সুফিয়ান, দ্বিতীয় জন আমীর মুয়াবিয়া (রা) এবং তৃতীয়জন আবু সুফিয়ানের জারজ সন্তান যিয়াদ।

ইয়াযীদ ইবনে আবু সুফিয়ান ইসলামী যুদ্ধ বিগ্রহে যথেষ্ট শৌর্য-বীর্যের পরিচয় দেয়ায় তাকে প্রথমে সিরিয়ার শাসনকর্তা নিয়োগ করা হয়। ইয়াযীদ ইয়ারমুকের যুদ্ধে শহীদ হবার পর হযরত ওমর (রা) মুয়াবিয়াকে সিরিয়ার শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। তারপর থেকে হযরত ওমরের (রা) শাসনকাল তো বটেই, তৃতীয় খলিফা হযরত উসমান (রা) এবং চতুর্থ খলিফা হযরত আলীর (রা) সমগ্র শাসনকাল ব্যাপীও তিনি সিরিয়ার শাসনকর্তারূপে বহাল থাকেন।

হযরত আলী (রা) ক্ষমতায় এসে তাকে পদচ্যুত করলেও কার্যত ক্ষমতা থেকে হটাতে পারেননি। মুয়াবিয়ার (রা) মা হিন্দা রাসূলে কারীমের চাচা হযরত হামযা ওহুদ যুদ্ধে শাহাদাত বরণ করলে তাঁর হৃদপিণ্ড চিবিয়ে ক্রোধ চরিতার্থ করে। কিন্তু তার বোন উম্মে হাবীবার সাথে রাসূল (সা) এর বিয়ে হবার পর মোশরেক পিতা আবু সুফিয়ান গোপনে মদিনায় চলে গেলে তাকে তিনি রাসূল (সা) এর বিছানার ওপর বসতেও দেননি। আর কুফার শাসক যিয়াদ বিন আবু সুফিয়ানের বিবরণ পরে আসছে। এহেন বিচিত্র পরিবারের সন্তান আমীর মুয়াবিয়া (রা) সিরিয়ার শাসন ক্ষমতা হাতে পাওয়ার পর সেখানকার শাসন কার্য অত্যন্ত সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করেন এবং সমগ্র সিরিয়াকে পুরোপুরিভাবে করায়ত্ব করেন। তিনি ছিলেন সিরিয়ার সর্বময় শাসক। যা চাইতেন তাই করতেন। কেউ টু শব্দটা করতে পারতোনা। ক্রমে সিরিয়ার ওপর আমীর মুয়াবিয়ার (রা) ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব এত জোরদার হয়ে গেল যে, তা মুসলিম সাম্রাজ্যের একটা প্রদেশ বা অংশ গণ্য হলেও তার সম্পর্ক কেন্দ্র ও অন্যান্য প্রদেশের সাথে নামমাত্র ছিল। এভাবে বনু উমাইয়া নবুয়ত থেকে বঞ্চিত থাকলেও পার্থিব ধন, মান, ক্ষমতা ও পদমর্যাদায় শীর্ষস্থান লাভ করে। বনু উমাইয়া সিরিয়াকেই নিজেদের বাসভূমি হিসেবে গ্রহণ করে এবং দলে দলে সেখানে গিয়ে বসবাস করতে থাকে।

আমীর মুয়াবিয়া (রা) অত্যন্ত বুদ্ধিমান, দূরদর্শী, প্রজ্ঞাবান, ঘটনাবলী থেকে শিক্ষাগ্রহণকারী বিচক্ষণ ব্যক্তি ছিলেন। সম্ভাব্য আকস্মিক দুর্ঘটনাবলী থেকে তিনি আগে ভাগেই আত্মরক্ষার ব্যবস্থা নিতে পারতেন। নিজের প্রজ্ঞা ও দূরদর্শিতা দ্বারা তিনি আন্দাজ করতে পেরেছিলেন যে, একদিন তাকে সিরিয়ার শাসনকর্তার পদ থেকে বরখাস্ত করার চেষ্টা করা হবে; এবং তার অতীত কার্যকলাপের বিচার করা হবে। এ ধরনের পরিস্থিতির

www.pathagar.com

উদ্ভবের আগে তিনি সতর্কতামূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে থাকেন।

সিরিয়ায় বসবাসকারী অতীব শক্তিশালী গোত্র বনু কালবের সমর্থন ও সহযোগিতা অর্জন করে নিজের ক্ষমতাকে মজবুত করার উদ্দেশ্যে তিনি ঐ গোত্রের এক মেয়েকে বিয়ে করেন। এই মেয়ের গর্ভেই ইয়াযীদ জন্মগ্রহণ করে।

হযরত উসমানের (রা) শাহাদাতের পর মুয়াবিয়া (রা) খলিফা হবার কোন চেষ্টাই করেননি। এই পদের প্রতি তার কোন আগ্রহ বা লোভও ছিলনা। খলিফা কে হবে বা হবে না তা নিয়ে তার কোন মাথাব্যথাই ছিলনা। তার একমাত্র প্রত্যাশা ছিল, তাকে সিরিয়ার শাসন ক্ষমতা থেকে কেউ যেন না হটায়। কিন্তু বনু হাশেম গোত্রের হযরত আলী (রা) যখন খলিফা হলেন, তখন মুয়াবিয়া (রা) নিশ্চিত হয়ে গেলেন যে, যে মুহূর্তটা নিয়ে তিনি উৎকণ্ঠিত ছিলেন, তা শেষ পর্যন্ত এসেই গেল। তিনি বুঝতে পারলেন, হযরত আলী (রা) তাকে কিছুতেই সিরিয়ার গভর্ণর পদে বহাল রাখবেন না, বরং তাকে পদচ্যুত করে তার কাছে নির্ভরযোগ্য ও বিশ্বস্ত অপর কোন ব্যক্তিকে ঐ পদে নিয়োগ করবেন। তাই তিনি হযরত আলীর (রা) বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা ও তার কাছে হযরত উসমানের (রা) হত্যার বিচার চাওয়াকেই নিজের জন্য নিরাপদ মনে করলেন।

হযরত আলী (রা) যদি তাকে সিরিয়ার গভর্ণর পদে বহাল থাকতে দিতেন এবং তার বিরুদ্ধে কোন পদক্ষেপ না নিতেন, তাহলে আমীর মোয়াবিয়া (রা) যে হযরত আলীর জন্য কোন সমস্যার সৃষ্টি করতেন না, তা সুনিশ্চিত। কিন্তু হযরত আলী (রা) যখন তাকে পদচ্যুত করা ও ভবিষ্যতে আর কোন পদে নিয়োগ না করার সিদ্ধান্ত নিয়েই ফেললেন, তখন তার সামনে এ ছাড়া আর কোন বিকল্প রইলনা যে, আমর ইবনুল আসের সাথে মিলিত হয়ে তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ শুরু করে দিলেন। পাশাপাশি হযরত উসমানের (রা) হত্যার প্রতিশোধ দাবী করলেন এবং অভিযোগ তুললেন যে, হযরত আলী (রা) হযরত উসমানকে (রা) সাহায্য না করে বরং নিজের আচরণ দ্বারা বিদ্রোহীদেরকে উস্কানী দিয়েছেন। তিনি দামেস্কের জামে মসজিদে হযরত উসমানের (রা) রক্তাক্ত জামা ও তাঁর স্ত্রী হযরত নায়েলার রক্তাক্ত বিচ্ছিন্ন আঙ্গুলগুলোকে ঝুলিয়ে রেখে দিলেন, যার ফলে সমগ্র সিরিয়ায় প্রতিহিংসার আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠলো। লোকেরা দলে দলে মসজিদে আসতো এবং এই জিনিসগুলো দেখে হাউ মাউ করে কাঁদতো। এভাবে আমীর মোয়াবিয়া (রা) সিরিয়াবাসী ও সাধারণ আরব জনতার সহানুভূতি অতি সহজেই পেয়ে গেলেন এবং রাতারাতি জনপ্রিয়তার শীর্ষে উঠে গেলেন।

আমীর মুয়াবিয়া (রা) এভাবে জনমতকে নিজের পক্ষে নিয়ে নিজের ক্ষমতা সম্পর্কে নিশ্চিত হবার পর হযরত আলী (রা) ও তার অন্যান্য বিরোধীদেরকে প্রতিহত করতে চাইলেন। তার সবচেয়ে ধারালো অস্ত্র ছিল দান দক্ষিণা ও উৎকোচ। এই অস্ত্র দিয়েই তিনি বিরোধী ও আরব গোত্রগুলোকে পদানত করতেন–। তিনি মানুষের বিবেক খরিদ করার জন্য প্রচুর নগদ অর্থ ও অন্যান্য সামগ্রী দান করতেন। এ প্রসংগে তাবারী একটা

www.pathagar.com

বিশেষ ঘটনা বর্ণনা করেছেন ঃ

"আমীর মুয়াবীয়া (রা) বনু তানীমের জনৈক বিশিষ্ট সরদার আবু মুনাযিলকে একবার সত্তর হাজার দিরহাম দান করলেন। তার পাশাপাশি আবু মুনাযিলের চেয়ে নিম্নতর মর্যাদাসম্পন্ন কয়েকজন সরদারকে এক এক লাখ দিরহাম দিলেন। আবু মুনাযিল এটা দেখে আমীর মুয়াবিয়াকে (রা) বললো ঃ

"আপনি আমাকে অন্যান্য লোকের চেয়ে কম দিরহাম দিয়ে বনু তানীম গোত্রের মধ্যে আমাকে অপমানিত করেছেন। আমি কি তাদের চেয়ে কম সম্ভ্রান্ত বংশীয় বা তাদের চেয়ে কম বয়স্ক? আমি কি আমার গোত্রে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি নই?"

আমীর মুয়াবিয়া (রা) ঃ নিঃসন্দেহে তুমি শ্রেষ্ঠ।

আবু মুনাযিল (রা) ঃ তাহলে আপনি অন্যদের তুলনায় আমাকে কম দিরহাম দিলেন কেন?

আমীর মুয়াবিয়া ঃ আমি অর্থ দিয়ে তাদের বিবেক কিনে নিয়েছি। কিন্তু যেহেতু তুমি একজন বিবেকবান মানুষ এবং হযরত উসমান (রা) সম্পর্কে ভালো ধারণা পোষণ কর, তাই তোমার বিবেক কিনতে চাইনি। তোমাকে তোমার বিবেকের কাছেই ন্যস্ত করলাম।"

আবু মুনাযিল ঃ আপনি আমার কাছ থেকেও আমার বিবেক কিনে নিন।

আমীর মুয়াবিয়া (রা) তৎক্ষণাত তাকেও এক লাখ দিরহাম দেয়ার হুকুম দিলেন। আমীর মুয়াবিয়া (রা) ছিলেন একজন জন্মগত রাজনীতিক ও স্বভাবগত দানশীল। জনৈক কবি তার গুণাবলীর বিবরণ দিয়েছেন এভাবে ঃ

"যখন আমরা আমীর মুয়াবিয়ার (রা) দিকে মনোযোগ দেই, তখন এমনভাবে মনোযোগ দেই, যেন তিনি আমাদের বাবা। যখন তার স্বভাব চরিত্র ও আচরণ দেখি, তখন আমাদের মনে হয়, তিনি অত্যন্ত দানশীল ও দয়ালু।"

এই পর্যায়ে এসে প্রত্যেকের মনে প্রশ্ন জাগে, আমীর মুয়াবিয়া (রা) হযরত উসমানের (রা) শাহাদাতের কারণে যে বিদ্রোহ করেছিলেন, তা কি নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে করেছিলেন, যাতে হযরত উসমানের (রা) হত্যাকারীদেরকে সত্যি সত্যি শাস্তি দেয়া যায়? না কি তার পেছনে রাজতান্ত্রিক প্রেরণা ও উদ্দীপনা সক্রিয় ছিল? এভাবে কি তিনি আসলে নিজের গদি ও সাম্রাজ্যকে দীর্ঘস্থায়ী করতে চেয়েছিলেন? এ প্রশ্নের জবাব হযরত আমীর মুয়াবিয়া (রা) ও হযরত উসমানের (রা) মেয়ে আয়েশার মধ্যে অনুষ্ঠিত সংলাপ থেকেই পাওয়া যায়। ইতিহাস থেকে জানা যায়, আমীর মুয়াবিয়া (রা) হযরত উসমানের (রা) শাহাদাতের পর যখন মদিনায় আসেন, তখন হযরত উসমানের (রা) বাড়ীতেও যান। তাকে দেখে হযরত উসমানের (রা) মেয়ে আয়েশা কাঁদতে থাকে এবং চিৎকার করে বলে ওঠেঃ ওয়া আবাতাহ, (হায়, আমার আব্বা!)।

www.pathagar.com

মুয়াবিয়া (রা) বললেন! স্নেহের ভাতিজী! লোকেরা আমাদেরকে নিরাপত্তা দিয়েছে, আর আমরাও তাদেরকে নিরাপত্তা দিয়েছি। আমরা তাদের প্রতি সহিষ্ণুতা দেখালেও আমাদের অন্তরে ক্ষোভ ও ক্রোধের আগুন জ্বলছে। ওদিকে হযরত উসমানের (রা) বিরোধীরা আমাদের প্রতি আনুগত্য দেখালেও তাদের অন্তরে লুকিয়ে আছে আমাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র ও বিদ্বেষ। প্রত্যেক মানুষের সাথে তার তরবারী রয়েছে এবং প্রত্যেকেই নিজ নিজ সমর্থক ও সহযোগীর সন্ধানে আছে। আমরা যদি তাদের সাথে প্রতিশ্রুতি ভংগ করি তবে ওরাও তাই করবে। তারপর কেউ জানেনা আমরা জয় লাভ করবো, না ওরা। ভাতিজী, তুমি প্রতিশোধ স্পৃহা চরিতার্থ করতে গিয়ে মুসলমানদের শান্তি ও সম্ভ্রম বিনষ্ট করতে চাইবে- এর চেয়ে আমীরুল মুমিনীনের মেয়ে হিসেবে ধৈর্য ও ক্ষমার পরিচয় দেয়াটাই হবে তোমার জন্য অধিকতর শোভনীয়।"

এই সংলাপ থেকে আমীর মুয়াবিয়ার (রা) রাজনীতি ও মানসিকতা বেশ ভালোভাবেই অবহিত হওয়া যায়। তবে এটা আরো সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে তার নিম্নোক্ত উক্তির মধ্য দিয়ে।

"যেখানে লাঠি দিয়ে সফলতা লাভ করা যায়, সেখানে আমি তরবারী উত্তোলন করিনা। আর যেখানে আমার মুখের কথায় কাজ হয়, সেখানে আমি লাঠি প্রয়োগ করিনা। আমাকে ও অন্যদেরকে যদি কোন সূতো দিয়ে বেঁধে দেয়া হয়, তবে সেই সূতো কখনো ছিঁড়বেনা।"

তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলোঃ কিভাবে?

তিনি জবাব দিলেন ঃ তারা যখন সূতোয় টান দেবে, তখন আমি সূতো ঢিল করে দেব। আর তারা যখন ঢিল দেবে, তখন আমি টান দেব।"

তার এই শেষোক্ত উক্তি দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যায়, তিনি কত সহনশীল রাজনীতিক ও শান্ত স্বভাবের লোক ছিলেন। যখন তাকে নানা রকমের বিপদ-মুসিবত ও দুর্যোগের ঘনঘটায় আচ্ছন্ন করে ফেলতো, তখন তিনি নিজের স্নায়ূকে নিয়ন্ত্রণ করে সেই সব বিপদ মুসিবত থেকে নিজেকে তো উদ্ধার করতেনই, উপরন্তু নিজের শত্রুদেরকেও নিত্য নতুন বিপদ মুসিবতে ও সংকটে নিক্ষেপ করতেন।

আমীর মুয়াবিয়া (রা) রাজনৈতিক জীবনে যে পদ্ধতি অনুসরণ করতেন, সে সম্পর্কে ইমাম শা'বী বলেন ঃ

"মুয়াবিয়া (রা) ছিলেন সেই বিশেষ শ্রেণীর উটের মত, যাকে কিছু না বললে ক্রমাগত চলতেই থাকে, আর তার ওপর কড়াকাড়ি করলে থেমে যায় এবং এক পাও সামনে অগ্রসর হয়না।"

রাজনীতিকরা সাধারণত অনুদার ও সংকীর্ণমনা হয়ে থাকে। কেননা রাজনীতি ও ঔদার্যের মধ্যে কোন যোগসূত্র নেই। রাজনীতিকদেরকে উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য কখনো কখনো

www.pathagar.com

এমন কাজ করতে হয়, যা উদারতা ও মহানুভবতার সম্পূর্ণ পরিপন্থী। কিন্তু আমীর মুয়াবিয়ার (রা) বৈশিষ্ট ছিল এই যে, তিনি একই সাথে উচ্চাংগের রাজনীতিক যেমন ছিলেন, তেমনি ছিলেন অত্যন্ত উদারচেতা। এর উৎকৃষ্টতম উদাহরণ হলো, হযরত হাসান (রা) কে খিলাফতের দাবী ত্যাগ করতে উদ্বুদ্ধ করার ঘটনা। কেননা এখানে তিনি যে অসাধারণ উদারতা ও মহানুভবতার পরিচয় দিয়েছিলেন, তা যাদুর মত অব্যর্থ প্রমাণিত হয়েছিল।

আমীর মুয়াবিয়া (রা) ইমাম হাসানকে (রা) চিঠিতে লিখলেনঃ

"খোদাভীতি ও নিষ্কলুষ নৈতিকতার দিক দিয়ে খেলাফতের জন্য আপনার চেয়ে যোগ্য ব্যক্তি আর কেউ নেই। আমি যদি নিশ্চিত হতাম যে, দেশ শাসনের কাজটাও আপনি সূচারুরূপে করতে পারবেন এবং মুসলিম উম্মাহকে আপনি যাবতীয় সমস্যা ও সংকট থেকে মুক্ত রাখতে পারবেন, তবে আমিই সর্ব প্রথম আপনার হাতে বায়য়াত করতাম। (অর্থাৎ আনুগত্যের শপথ নিতাম) কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে আপনার পক্ষে খিলাফতের দাবী ত্যাগ করাটাই সমীচীন হবে। এর বিনিময়ে আপনি যা চাইবেন, আমি তাই আপনার সামনে পেশ করবো।"

এই চিঠির সাথে সাথে আমীর মুয়াবিয়া (রা) তাঁকে নিজের সিলমোহর যুক্ত একটা সাদা কাগজ পাঠিয়ে জানালেন, "এই কাগজে আপনি যা কিছুই লিখে দেবেন, তাই আমি মেনে নেব।"

এই চিঠির ভাষা ও কাগজের ধরণ ইমাম হাসানকে (রা) মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় অভিভূত করে ফেললো। তিনি কাল বিলম্ব না করে আমীর মুয়াবিয়ার (রা) অনুরোধ মোতাবেক খেলাফতের দাবী পরিত্যাগের কথা ঘোষণা করলেন। আর সেই সাদা কাগজে নিজের ও নিজের সহযোগীদের জন্য প্রয়োজনীয় স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির তালিকা লিখে দিলেন। এই তালিকা আমীর মুয়াবিয়া (রা) সানন্দে মেনে নিলেন।

কিন্তু বিস্ময়ের ব্যাপার তিনি ইয়াযীদকে উত্তরাধিকারী মনোনীত করে তার স্বপক্ষে ইরাকীদের আনুগত্যের শপথ আদায় করার সময় এই উদারতা দেখাতে পারেননি। বরং তখন তিনি চরম স্বার্থপর ও হৃদয়হীনের ন্যায় আচরণ করেন এবং সমস্ত নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধ বিসর্জন দেন। সৈয়দ আমীর আলী বলেন ঃ

"ইরাকীদেরকে ঘুষ দিয়ে, ফুসলিয়ে অথবা বলপ্রয়োগ করে ইয়াযীদের প্রতি আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করতে বাধ্য করা হয়।"

আমীর মুয়াবিয়া (রা) মুসলিম সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে যে সব শাসক নিয়োগ করেন, তাতেও তার বিচক্ষণতা ও বুদ্ধিমত্তার প্রমাণ পাওয়া যায়। আমর ইবনুল আস, যিয়াদ বিন আবু সুফিয়ান ও মুগীরা বিন শু'বার আন্তরিক সহযোগিতার বলেই তিনি তার ইচ্ছাকে সফল করতে সক্ষম হন। আমীর মুয়াবিয়ার (রা) সাম্রাজ্যকে মজবুত করা, সাধারণ মানুষের সহানুভূতি অর্জন করা, বিরোধীদেরকে দমন করা, যেখানে নম্রতা ও উদারতার

www.pathagar.com

প্রয়োজন, সেখানে উদারতা প্রয়োগ এবং যেখানে কঠোরতা প্রয়োজন সেখানে কঠোরতা প্রয়োগ করার কাজে তারা তাকে নিশ্ছিদ্র সহযোগিতা প্রদান করেন।

আবু সুফিয়ানের জারজ সন্তান কুফার শাসনকর্তা যিয়াদ ছিলেন অত্যন্ত রুক্ষ মেজাজের ও নিষ্ঠুর হৃদয়ের শাসক। লোকেরা তার নাম শুনলেই ভয়ে কাঁপতো। তবে যেখানে নমনীয়তা ও নম্রতায় কাজ হয়, সেখানে সে নম্র আচরণও করতো। আবার যেখানে প্রয়োজন বোধ করতো, সেখানে বিরোধীদের মুখ বন্ধ করতে অর্থ-কড়িও খরচ করতো। জনৈক প্রভাবশালী খারেজী আবুল খায়ের বিদ্রোহ করতে পারে- এই সন্দেহের বশবর্তী হয়ে তাকে ডেকে এনে যিয়াদ নিশাপুরের শাসনকর্তা মনোনীত করে এবং তার মাসিক বেতন চার হাজার দিরহাম ও বাৎসরিক বেতন এক লাখ দিরহাম ঘোষণা করে। এই কৌশলে আবুল খায়ের অনুগত হয়ে যায়। পরবর্তীকালে সে বলতোঃ "আনুগত্য ও দলভুক্ত থাকার চেয়ে ভালো আর কিছুই আমি দেখিনি।"

মুগীরা বিন শু'বার (রা) অবস্থাও তদ্রুপ। একবার তিনি জুময়ার খুতবা দিচ্ছিলেন। এই সময় হাজর বিন আদী নামক এক ব্যক্তি তাকে পাথরের টুকরো ছুড়ে মারে। মুগীরা (রা) তৎক্ষণাত মিম্বর থেকে নেমে নিজ ভবনে চলে যান। সেখান থেকে তিনি পাঁচ শো দিরহাম হাজর বিন আদীকে পাঠিয়ে দেন। লোকেরা মুগীরা (রা)কে জিজ্ঞেস করলোঃ আপনি আপনার কট্টর বিরোধী হাজরের সাথে এত উদার আচরণ করলেন কেন?

মুগীরা জবাব দিলেন ঃ "আমি এই অর্থ দিয়ে তাকে হত্যা করেছি।"

আমীর মুয়াবিয়া (রা) যে কেবল ফন্দি-ফিকির ও কলাকৌশল প্রয়োগ করে বিরোধীদের ওপর সাফল্য লাভ করেছিলেন, সেটা তিনি নিজেও বুঝতেন। তিনি বলেন ঃ "চারটে কারণে আলী আমার কাছে পরাভূত হয়েছেন ঃ

১. তিনি নিজের গোপন কথা কারো কাছ থেকেই লুকাতে পারতেন না। কিন্তু আমি গোপন কথা কারো কাছে প্রকাশ করতামনা।

২. আলী (রা) অত্যন্ত ভাবলেশহীন ও নিশ্চিন্ত মানুষ ছিলেন। কোন বিপদ মুসিবতে পুরোপুরি আক্রান্ত না হওয়া পর্যন্ত তিনি তা থেকে আত্মরক্ষার কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করতোনা। কিন্তু আমি আগে থেকেই যে কোন বিপদের মোকাবিলা করার জন্য প্রস্তুত থাকতাম।

৩. তিনি যে বাহিনী পোষেন, তারা তার কোন নির্দেশের তোয়াক্কা করতোনা। কিন্তু আমার বাহিনী আমার নির্দেশ অমান্য করার সাহস রাখেনা।

৪. তিনি কুরাইশের সমর্থন থেকে বঞ্চিত ছিলেন। আমি কুরাইশের সমর্থনপুষ্ট।

এ সব কারণেই আমি যা চেয়েছি পেয়েছি। আর আলী যা চেয়েছেন পাননি।

স্বয়ং হযরত আলীও (রা) আমীর মুয়াবিয়ার (রা) এই সাফল্যের স্বীকৃতি দিতেন। যিয়াদ বিন আবু সুফিয়ান যখন তাঁর অনুগত ছিল, তখন তাকে তিনি বলতেনঃ

www.pathagar.com

"মুয়াবিয়া জনগণকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করার অসাধারণ ক্ষমতা রাখেন। কাজেই তার ব্যাপারে সাবধান থেক।"

নিজের অসাধারণ কর্মকুশলতা ও দক্ষতার বলে আমীর মুয়াবিয়া নিজের পথের সকল কাঁটা দূর করতে সক্ষম হন এবং দোর্দণ্ড প্রতাপের সাথে এক নাগাড়ে প্রায় ২০ বছর যাবত শাসন পরিচালনা করেন। নিজের জীবদ্দশাতেই তিনি নিজের ছেলে ইয়াযীদের স্বপক্ষে আনুগত্যের শপথ আদায় করেন। তিনি ভেবেছিলেন, তিনি তার সকল বিরোধীকে পদানত করে ফেলেছেন, সমগ্র আরব তার সর্বময় কর্তৃত্বের আওতায় এসে গেছে এবং তার হুকুম অমান্য করে এমন সাধ্য কারো নেই। তিনি নিশ্চিত ছিলেন যে, ইয়াযীদের ক্ষমতাকে তিনি সম্পূর্ণ নিষ্কন্টক ও পাকাপোক্ত করে ফেলেছেন। তাই তার পরে ইয়াজীদকে কারো বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হবেনা। সে অত্যন্ত সুখে শান্তিতে ও নিরুপদ্রবে শাসনকার্য পরিচালনা করতে পারবে। কিন্তু এটা ছিল তার কল্পনা বিলাস। এটা ভাবতেও অবাক লাগে, এত বড় ধুরন্ধর ও বিচক্ষণ শাসক হয়েও তিনি কিভাবে এমন অবান্তর কল্পনা বিলাসকে প্রশ্রয় দিতে পারলেন। তিনি নিজে যে দুর্লভ শাসকসুলভ গুণাবলীর অধিকারী ছিলেন, তার ছেলে ইয়াযীদের ভেতরে তার লেশমাত্রও ছিলনা। সে না ছিল তাঁর মত বুদ্ধিমান, উদার ও দানশীল, না ছিল ধর্ম ও রাজনীতি সম্পর্কে অভিজ্ঞ। সে দিনরাত খেলাধুলা ও আমোদ-প্রমোদে লিপ্ত থাকতো। সে ছিল একাধারে পাপাসক্ত, অত্যাচারী, ইন্দ্রিয়পরায়ণ ও নীতিজ্ঞানহীন এবং মদ্যপায়ী ও হৃদয়হীন।

ভন ক্রেমারের ভাষায় ঃ

"মুয়াবিয়ার মত জ্ঞানী ও বিচক্ষণ পিতার পক্ষে তার অযোগ্য ও পাপাসক্ত ছেলেকে উত্তরাধীকারী মনোনয়ন করা সত্যিই বিস্ময়কর।" তখন যদিও মুসলমান সমাজে অনেক দোষত্রুটি ঢুকে গিয়েছিল; কিন্তু তখনো ইসলামের প্রাথমিক যুগ ছিল। রাসূল (সা) এর তিরোধানের পর চল্লিশ বছরও অতিবাতি হয়নি। বহু সুযোগ্য সাহাবী তখনো জীবিত। আমীর মুয়াবিয়া যদিও অন্ধ পিতৃস্নেহবশত চাটুকারদের প্ররোচনায় ইয়াযীদকে উত্তরাধিকারী মনোনীত করতে রাজী হয়ে গিয়েছিলেন, কিন্তু সাধারণ মুসলমানরা কখনো তাতে সম্মত ছিলনা। তারা জানতো, খলিফা হবার জন্য কমের পক্ষে

তিনটে গুণ থাকা চাইঃ

১. ইসলামের জ্ঞানের দিক থেকে বিশিষ্ট জ্ঞানের অধিকারী,

২. উচ্চতর বংশীয় মর্যাদার অধিকারী,

৩. সততা, খোদাভীতি ও নিষ্ঠায় সকল মুসলমানের চেয়ে অগ্রগামী।

কিন্তু ইয়াযীদের ভেতরে দ্বিতীয় গুণটা ছাড়া বাদবাকী দুটো গুণ একেবারেই অনুপস্থিত ছিল।

যখন আমীর মুয়াবিয়ার মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এল, তখন তিনি ইয়াযীদকে ডেকে পাঠান

www.pathagar.com

এবং তাকে নিম্নরূপ ওসিয়ত করেন ঃ

"প্রিয় বৎস! আমি তোমার পথের সব কাঁটা দূর করে দিয়েছি। তোমার শত্রুদেরকে বশীভূত ও নিস্ক্রিয় করে দিয়েছি। আরব জাতির শির তোমার সামনে নত করে দিয়েছি। এত বিপুল সম্পদ রাজকোষে জমা করে দিয়েছি, যার কোন তুলনা হয়না। আমার এই অনুগ্রহের জন্য তোমাকে এভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে হবে যে, তুমি হেজাজবাসীর (মক্কা, মদিনা ও তায়েফ অঞ্চল) সাথে কৃপা ও অনুগ্রহের আচরণ করবে। কেননা তারাই তোমার স্ব-বংশীয়। কোন হেজাজবাসী তোমার কাছে এলে তার যত্ন নিও। ইরাকবাসীর প্রতিও নজর দিও। তারা যদি প্রতিদিন একজন নতুন শাসনকর্তা চায়, তবে তাই দিও। কেননা শাসনকর্তাদেরকে বরখাস্ত করা জনগণের বিদ্রোহ ও অসন্তোষের মোকাবিলা করার চেয়ে ভালো। সিরিয়াবাসীর সাথেও সদাচরণ করবে। তাদেরকে নিজের বিশ্বস্ত সহচর হিসেবে গ্রহণ করবে। শত্রুর দিক থেকে কোন বিপদের আশংকা থাকলে সিরীয়দের সাহায্য নিও। তবে শত্রুকে প্রতিহত করার পর তাদেরকে নিজ নিজ এলাকায় ফেরত পাঠিয়ে দিও। কারণ অন্যান্য এলাকায় বাস করলে তাদের স্বভাব চরিত্র বদলে যেতে পারে।"

"মনে রেখ, খিলাফতের ব্যাপারে কুরাইশ বংশের চার ব্যক্তি তোমার প্রতিদ্বন্দ্বী হতে পারেঃ

আলীর ছেলে হুসাইন (রা), ওমরের ছেলে আব্দুল্লাহ (রা), যুবাইরের ছেলে আবদুল্লাহ, এবং আবু বকরের ছেলে আবদুর রহমান। আবদুল্লাহ ইবনে ওমরকে নিয়ে বেশী উদ্বিগ্ন হবার প্রয়োজন নেই। এবাদত করতে করতে তিনি ক্লান্ত। সবাই যখন আনুগত্যের শপথ করবে, তখন তিনিও করবেন। হুসাইন (রা) সাদাসিধে মানুষ। ইরাকীরা তাকে অবশ্যই তোমার মোকাবিলায় দাঁড় করাবে। তিনি যদি তোমার মোকাবিলায় এসেই পড়েন এবং তুমি বিজয়ী হও, তাহলে তাকে ক্ষমা করে দিও। কেননা তিনি আমাদের ঘনিষ্ঠ আত্মীয় এবং রাসূলুল্লাহর দৌহিত্র। আমাদের ওপর তার যথেষ্ট অধিকার রয়েছে। আবদুর রহমান বিন আবু বকর অপেক্ষাকৃত বিলাসী মানুষ। নিজের আরাম আয়েশের দিকেই তার ঝোক বেশী। সবাইকে যা করতে দেখবেন, উনিও তাই করবেন। তবে যে ব্যক্তি সিংহের মত ওৎ পেতে থাকবে এবং শৃগালের মত চতুর হবে, সে হচ্ছে আবদুল্লাহ বিন যুবায়ের। সে যদি মুকাবিলায় আসে এবং তুমি বিজয়ী হও, তবে তাকে টুকরো টুকরো করে দিও। তবে যতদূর পার, জনগণকে ব্যাপক রক্তপাত থেকে রক্ষা কর।"

কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে, আমীর মুয়াবিয়ার মৃতুর প্রাক্কালে ইয়াযীদ তাঁর কাছে ছিলনা। তিনি এই ওসিয়তগুলো যাহহাক বিন কায়েস ও মুসলিম বিন উকবার মাধ্যমে ইয়াজিদের কাছে পৌছান।

আমীর মুয়াবিয়া (রা) ৬০ হিজরীর ১লা রজব মোতাবেক ৬৮০ খৃষ্টাব্দে ৪ঠা জুলাই ৭৫ বছর বয়সে ইন্তিকাল করেন।

www.pathagar.com

ইমাম হুসাইন (রা)

ইমাম হুসাইন (রা) ৪র্থ হিজরীর ৫ই শাবান মোতাবেক ৬২৬ খৃষ্টাব্দের ৫ই জুন জন্মগ্রহণ করেন। রাসূলুল্লাহ (সা) নিজেই তাঁর নাম রাখেন হুসাইন। রাসূলের (সা) ইন্তিকালের সময় ইমাম হুসাইনের বয়স ছিল সাত বছর সাত মাস সাত দিন। এ জন্য তিনি তাঁর পিতার মত অত দীর্ঘদিন রাসূল (সা) এর সান্নিধ্যে থাকার সুযোগ পাননি।

হাদীস থেকে জানা যায়, রাসূল (সা) তাঁকে ও তাঁর ভাই হাসান (রা) কে অত্যধিক স্নেহ করতেন। তাদেরকে দেখার জন্য তিনি প্রতিদিন একবার হযরত ফাতেমার (রা) বাড়ীতে যেতেন, তাদেরকে ডেকে আদর সোহাগ করতেন ও সাথে নিয়ে বিভিন্ন খাবার জিনিস খাওয়াতেন। জনৈক সাহাবীর বর্ণনা ঃ

"একবার রাসূল (সা) মাগরিব অথবা এশার নামাযের জন্য মসজিদে নববীতে এলেন। তখন তাঁর কোলে ইমাম হাসান অথবা হুসাইন ছিল। নামায পড়ানোর সময় হলে তাকে কোল থেকে নামিয়ে পাশে বসিয়ে রাখলেন এবং নামায শুরু করে দিলেন। তিনি যখন সিজদায় গেলেন, তখন দীর্ঘ সময় সিজদায় পড়ে রইলেন। অনেক সময় কেটে গেলে আমি মাথা উঁচু করে দেখি, শিশুটি তাঁর পিঠের ওপর চড়ে বসে আছে এবং সে জন্য তিনি দীর্ঘ সময় সিজদায় পড়ে আছেন। এটা দেখে আমি পুনরায় সিজদায় চলে গেলাম। নামায শেষে লোকেরা রাসূল (সা) কে জিজ্ঞেস করলো, "হে রাসূল, আপনি একটা সিজদা অস্বাভাবিক দীর্ঘ সময় ধরে করেছেন। আমরা ভেবেছি, আপনি কোন অস্বাভাবিক ঘটনার সম্মুখীন হয়েছেন, অথবা এই সময় আপনার কাছে কোন ওহি নাযেল হয়ে থাকবে।"

রাসূল (সা) বললেন ঃ "এ দুটোর কোনটাই ঘটেনি। আমার নাতি আমার পিঠে চড়াও হয়ে বসেছিল। ওকে নামিয়ে দিতে আমার ইচ্ছে হয়নি।"

একবার রাসূল (সা) হযরত ফাতেমার বাড়ীর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। এ সময়ে ভেতর থেকে হযরত হুসাইনের কান্নার শব্দ শুনলেন। তিনি বাড়ীর ভেতরে চলে গেলেন এবং মেয়েকে বললেন ঃ "তুমি জাননা, ওদের কান্না শুনলে আমার কষ্ট হয়।"

তিরমিযী শরীফে বর্ণিত হয়েছে, হযরত উসামা ইবনে যায়দ বর্ণনা করেন, আমি কোন এক প্রয়োজনে রাতের বেলা রাসূল (সা) এর কাছে উপস্থিত হলাম। তিনি চাদরের ভেতরে কি যেন আবৃত করে বাইরে এলেন। আমি কথা শেষ করে জিজ্ঞেস করলাম, হে রাসূল, আপনি চাদরে কী লুকিয়ে রেখেছেন? তিনি চাদর সরালেন। দেখা গেল, ভেতরে শিশু হাসান ও হুসাইন (রা) রয়েছে। তিনি বললেনঃ "এরা দু'জন আমার মেয়ের

www.pathagar.com

ছেলে। হে আল্লাহ, আমি এদের দু'জনকে ভালোবাসি। তুমিও এদের উভয়কে এবং এদের উভয়কে যারা ভালোবাসে, তাদেরকে ভালোবাস।"

একবার রাসূল (সা) মসজিদে খুতবা দিচ্ছিলেন। সহসা হাসান ও হুসাইন মসজিদে ঢুকে পড়লো। তারা দু'জনে লাল রং এর জামা পরিহিত ছিল। বয়স কম থাকায় তারা চলার সময় বার বার পড়ে যাওয়ার উপক্রম হচ্ছিল। এ অবস্থা দেখে তিনি মিম্বর থেকে নেমে এসে দু'জনকে কোলে নিয়ে নিজের কাছে মেম্বারের ওপর বসালেন এবং বললেন ঃ

"সন্তানাদি ও ধন সম্পদ মানুষের জন্য পরীক্ষার বিষয় হয়ে থাকে"- আল্লাহর একথাটা একেবারেই সত্য। আমি যখন দেখলাম, ছেলে দুটো চলার সময় পড়ে যাওয়ার উপক্রম হচ্ছে, তখন আর নিজেকে সামলে রাখতে পারিনি। আমি খুতবায় বিরতি দিয়ে তাদেরকে ধরে এনে বসালাম।"

হযরত ওমরও (রা) হাসান হুসেন ভ্রাতৃদ্বয়কে খুবই স্নেহ করতেন। হযরত ইবনে আব্বাস বলেন, হযরত ওমর (রা) ইমাম ভ্রাতৃদ্বয়কে এত ভালোবাসতেন যে, নিজের ছেলেদের ওপরও তাদেরকে অগ্রাধিকার দিতেন। একবার তিনি মদীনার মুসলমানদের মধ্যে কিছু মুদ্রা বন্টন করলেন। তন্মধ্যে এই দুই ভাইকে দশ হাজার দিরহাম করে দিলেন। তা দেখে তাঁর ছেলে আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) বললেন ঃ

"আব্বা, আপনি তো জানেন, আমি অনেক আগে ইসলাম গ্রহণ করেছি এবং হিজরতও করেছি। তবুও আপনি এই দুটো ছেলেকে আমার ওপর অগ্রাধিকার দেন?"

হযরত ওমর (রা) বলেন ঃ "আব্দুল্লাহ, তোমার কথা শুনে আমি খুব দুঃখ পেলাম। তুমি আমাকে বল তোমার নানা কি হাসান-হুসাইনের নানার মত? তোমার মা কি তাদের মার মত? তোমার নানী কি তাদের নানীর মত? তোমার চাচা কি তাদের চাচার মত? তোমার ফুফু কি তাদের ফুফুর সমান? শোন, তাদের নানা নবীকুল শিরোমনি রাসূলুল্লাহ (সা)। তাদের মা বেহেশতের মহিলাদের নেত্রী হযরত ফাতেমা (রা)। তাদের নানী হযরত খাদীজা (রা)। তাদের মামা রাসূল (সা) এর ছেলে ইবরাহীম। তাদের খালা রাসূল (সা) এর মেয়ে হযরত যয়নব, হযরত রুকাইয়া ও হযরত উম্মে কুলসুম। তাদের চাচা হযরত জাফর (রা) এবং তাদের ফুফু উম্মে হানী বিনতে আবু তালেব।"

যখন বাইতুল মাল থেকে মুসলমানদের ভাতা বরাদ্দ হলো, তখন হযরত ওমর (রা) এই দুই ভাই এর জন্য তাদের বাবা হযরত আলীর (রা) মত পাঁচ হাজার দিরহাম করে বরাদ্দ করলেন। অথচ বদরযোদ্ধাদের ছেলেরা দু'হাজার দিরহাম করে ভাতা পেত।

একবার ইয়ামান থেকে কিছু মূল্যবান পোশাক মদীনায় এল। হযরত ওমর (রা) সেগুলো জনসাধারণের মধ্যে বিতরণ করে দিলেন। জনগণ নতুন ইয়ামানী পোশাক পরে বাইরে এসে আনন্দ প্রকাশ করতে লাগলো। কিন্তু কিভাবে যেন হাসান ও হুসাইন ভ্রাতৃদ্বয় এই

www.pathagar.com

পোশাক পাননি। তারা যখন হযরত ফাতেমার বাড়ী থেকে বেরুলেন, তখন তাদের পরনে ইয়ামানী পোশাক ছিলনা। এ দৃশ্য দেখে হযরত ওমর (রা) তো অস্থির হয়ে গেলেন। তিনি উপস্থিত অন্যান্য লোকদেরকে বলতে লাগলেন ঃ

তোমাদের নতুন ইয়ামানী পোশাক পরায় আমি খুশী হইনি।" লোকেরা কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন ঃ

"এই দুই বালকের কারণেই সবাই নতুন পোশাক পরেছে। অথচ ওদের পরনে নতুন. ইয়ামানী পোশাক নেই।"

এরপর তিনি তৎক্ষণাত ইয়ামানের শাসককে চিঠি লিখলেন যে, অবিলম্বে হাসান ও হুসাইনের জন্য উৎকৃষ্টমানের দু জোড়া পোশাক পাঠিয়ে দাও। তিনি পাঠিয়ে দিলেন। পোশাক যখন এসে গেল, তখন হযরত ওমর (রা) তাদেরকে পোশাক দুটো পরালেন। তারপর বললেন ঃ "এখন আমি যথার্থই খুশী।"

ইবনে খালদুন ও অন্য কয়েকজন ঐতিহাসিক লিখেছেন, হযরত হাসান ও হুসাইন আফ্রিকা বিজয়ী সেই বাহিনীর সদস্য ছিলেন, যারা মিশর দখল করার পর আফ্রিকার অন্যান্য এলাকায় আক্রমণ চালিয়ে সর্ব পশ্চিম প্রান্ত পর্যন্ত চলে গিয়েছিল।

ইমাম তাবারী স্বীয় 'তারীখুল উমামি ওয়াল মুলুক' গ্রন্থে লিখেছেন ঃ

"তারা উভয়ে তাবারিস্তানের বিরুদ্ধে পরিচালিত জেহাদে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। এ জেহাদ হিঃ ৩০ মোতাবেক ইং ৬৫০ খৃষ্টাব্দে সংঘটিত হয়েছিল।

এ সব ঘটনা থেকে বুঝা যায়, ইমাম হাসান (রা) ও হুসাইন (রা) উভয় ভাই ইসলামের শত্রুদের বিরুদ্ধে পরিচালিত লড়াইগুলোতে সব সময়ই অংশ গ্রহণ করতেন। এবং প্রত্যেক ছোট বড় শহরে ইসলামের বিজয় কেতন উড্ডীন করার কাজে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতেন।

হযরত উসমানের (রা) আমলে যখন ইসলামের প্রথম বিদ্রোহ সংঘটিত হয় এবং বিদ্রোহীরা তাঁর বাসভবনকে চারদিক থেকে ঘিরে ফেলে, তখন গুটিকয় যুবক প্রাণের মায়া ত্যাগ করে বিদ্রোহীদের মোকাবিলা করেছিলেন, তাদের ভেতরে হযরত ইমাম হুসাইনও ছিলেন। বিদ্রোহীরা হযরত উসমানের (রা) বাসভবন ঘেরাও করে প্রথমে তার পানির সরবরাহ বন্ধ করে দেয়। এ কথা জানতে পেরে হযরত আলী (রা) তিন মশক পানি তার বাড়িতে পাঠিয়ে দেন। সেই সাথে নিজের দুই ছেলে হযরত হাসান ও হুসাইনকে সশস্ত্র অবস্থায় তাঁর বাড়ীতে এই বলে পাঠিয়ে দেন যে, তোমরা তরবারী নিয়ে হযরত ওসমানের (রা) বাড়ীর দরজায় দাঁড়িয়ে থেক এবং খলিফার বাড়ীর ভেতরে অসুদদ্দেশ্যে প্রবেশ করতে চায় এমন কাউকে প্রবেশ করতে দিওনা। হযরত আলীর (রা) মত হযরত তালহা, যুবাইর ও আরো কয়েকজন সাহাবীও নিজ নিজ যুবক ছেলেকে

www.pathagar.com

হযরত উসমানের (রা) হেফাজতের জন্য পাঠিয়ে দিয়েছিলেন।

এই অবরোধ চলাকালে একদিন হযরত উসমান (রা) নিজ বাড়ীর ছাদের ওপর উঠে বিদ্রোহীদের একটা ভাষণ দেন। এই ভাষণে তিনি তাঁর বিরুদ্ধে আনীত বিদ্রোহীদের অভিযোগগুলো অমূলক ও অসত্য প্রমাণ করেন। কিন্তু তারা কিছুতেই তার ব্যাখ্যা মেনে নিলনা।

তার বিরুদ্ধে শাসন কার্যে অযোগ্যতা ও অক্ষমতার পরিচয় দান, স্বজনপ্রীতি, রাষ্ট্রীয় কোষাগারের অর্থ আত্মসাত এবং হযরত আবু বকরের ছেলে মুহাম্মদকে হত্যার গোপন নির্দেশ দানের অভিযোগ আনা হয়েছিল। প্রথমোক্ত অভিযোগগুলো আংশিক সত্য হলেও তার জন্য খলিফা প্রত্যক্ষভাবে দায়ী ছিলেননা। দায়ী ছিল তাঁর জামাতা ও প্রধানমন্ত্রী দুর্নীতিবাজ মারওয়ান ইবনুল হাকাম। আর সর্বশেষ অভিযোগটা ছিল সম্পূর্ণ চক্রান্তমূলক ও সাজানো। খলিফার সাক্ষর ও সীল জাল করে কে মুহাম্মদ ইবনে আবু বকরকে হত্যা করার নির্দেশ সম্বলিত গোপন চিঠি মিশরের গভর্ণরের নিকট পাঠিয়েছিল, যা পথিমধ্যে বিদ্রোহীদের হস্তগত হয়েছে, এটা খলিফা আদৌ জানতেন না। সম্ভবত এটা বিদ্রোহীদের সাজানো নাটক অথবা মারওয়ানের কারসাজি ছিল। যাহোক, খলিফার কোন ব্যাখ্যা বিশ্লেষণেই কর্ণপাত না করে বিদ্রোহীরা পেছন দিক থেকে খলিফার ভবনে ঢুকে পড়লো। ইমাম হাসান ও হুসাইনসহ ১৮ জন দেহরক্ষী খলিফাকে রক্ষা করা দূরে থাক, বাড়ীর ভেতরে খলিফার বর্বরোচিত হত্যাকান্ডের কথা তারা জানতেও পারলোনা। বিদ্রোহীদের নেতৃত্বে ছিল হযরত হযরত আবু বকরের ছেলে মুহাম্মদ। সে পেছন দিকের দরজা ডিঙ্গিয়ে যখন দলবলসহ ভেতরে ঢুকলো, তখন হযরত উসমানের (রা) কাছে তাঁর স্ত্রী নায়েলা ছাড়া আর কেউ ছিলনা। হযরত উসমান (রা) কুরআন তেলাওয়াত করছিলেন। মুহাম্মদ বিন আবু বকর (রা) যখন খলিফার দাড়ি ধরে প্রচণ্ড জোরে টান দিল, তখন হযরত উসমান (রা) শুধু বললেন, "ভাতিজা, তোমার বাবা এখানে থাকলে তোমাকে কিছুতেই এমন কাজ করতে দিতেন না।" কথাটা শুনে মুহাম্মদ একটু লজ্জিত হয়ে বাইরে চলে গেল। কিন্তু অন্যেরা তাকে হত্যা করে পালিয়ে গেল। তারা পালিয়ে যাওয়ার সাথে সাথে তাঁর স্ত্রী চিৎকার করে উঠলেন যে, "আমীরুল মুমিনীনকে শহীদ করে ফেলা হয়েছে।"

হৈ চৈ শুনে দরজার ওপর দাঁড়ানো দেহরক্ষীরা ভেতরে গিয়ে দেখলো, হযরত উসমান (রা) নিজের রক্তের ভেতরে শুয়ে আছেন। আর কুরআন শরীফ তার রক্তে ভিজে লাল হয়ে আছে। তার স্ত্রী নায়েলা বাধা দেয়ার ব্যর্থ চেষ্টা করতে গিয়ে নিজের আঙ্গুল হারালেন। তখন পরিতাপ করা ছাড়া কোন উপায় অবশিষ্ট ছিলনা।

হযরত আলী, হযরত তালহা ও হযরত যুবায়ের খলিফার শাহাদাতের খবর শুনে ছুটে

www.pathagar.com

এলেন। হযরত আলী (রা) তার দুই ছেলেকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা দরজার ওপর থাকতে বিদ্রোহীরা ঘরে ঢুকে হযরত উসমান (রা)কে শহীদ করার স্পর্ধা কোথা থেকে পেল? তিনি তাদের দু'জনকেই থাপ্পড় দিলেন। মুহাম্মদ বিন তালহা ও আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়েরকেও ভর্ৎসনা করলেন।

হযরত আলী (রা) খেলাফত কালে যে সব যুদ্ধবিগ্রহ সংঘটিত হয়, সেগুলোতে হযরত হুসাইন (রা) তার বাবার সাথে সাথে থাকতেন। উষ্ট্র যুদ্ধ, সিফফীন যুদ্ধ ও নাহ্রাওয়ানের যুদ্ধে তিনি সর্বোচ্চ মানের বীরত্ব, সাহসিকতা ও শৌর্যবীর্যের পরিচয় দেন। এক যুদ্ধে তিনি সামনে এগিয়ে "হাল মিন মুবারিয" (আমার সাথে যুদ্ধ করার সাহস কারো আছে নাকি?) বলে হাঁক দিলেন। তখন যাবারকান নামক এক ব্যক্তি মস্ত বড় যোদ্ধা হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেছিল। সে এগিয়ে এসে বললো ঃ "তুমি কে?" তিনি জবাব দিলেন, "আমি আলী (রা) ছেলে হুসাইন।"

যাবারকান এ কথা শুনে বললো ঃ "বৎস তুমি বাড়ী চলে যাও। একদিন আমি রাসূল (সা) কে দেখেছি, একটা উষ্ট্রীর পিঠে চড়ে কাবার দিকে যাচ্ছেন, আর তুমি রাসূল (সা) এর সামনে বসে আছ। তোমার রক্তে হাত রঞ্জিত করে রাসূল (সা) এর সাথে মিলিত হই এটা আমার ইচ্ছা নয়।"

ইবনে মুলজাম নামক ঘাতক যখন হযরত আলীকে (রা) তরবারী দিয়ে আঘাত করলো এবং তাঁকে আহত অবস্থায় বাড়ীতে নিয়ে আসা হলো, তখন তিনি মৃত্যু আসন্ন বলে উপলব্ধি করলেন। তাই কাল বিলম্ব না করে সন্তানদেরকে প্রয়োজনীয় ওসিয়ত করা শুরু করলেন। হযরত হুসাইনকে ডেকে বললেনঃ

"আমি তোমাদের দু ভাইকে ওসিয়ত করছি যে, আল্লাহকে ভয় করে চলবে, যে জিনিস হাতছাড়া হয়ে যায় তার জন্য আক্ষেপ করবে না। (সম্ভবত উভয় ছেলের খেলাফত থেকে বঞ্চিত থেকে যাওয়ার সম্ভাবনা তিনি আঁচ করতে পেরেছিলেন, তাই আগে ভাগে তাদেরকে সান্তনা দিলেন) সব সময় মানুষের সাথে সদ্ব্যবহার করবে এবং হত্যাকারীর মোকাবিলায় মজলুমকে সাহায্য করবে।"

"হে আবদুল মুত্তালিবের বংশধর! খবরদার, আমীরুল মুমিনীনকে শহীদ করা হয়েছে— এই অভিযোগ তুলে মুসলমানদের রক্তপাত করোনা। আমার হত্যাকারীকে ছাড়া আর কাউকে হত্যা করোনা। আমার মৃত্যু হয়ে গেলে আমার হত্যাকারীকে এক কোপেই হত্যা করে ফেলবে। তার অংগপ্রত্যংগ কেটনা। কেননা আমি রাসূল (সা)কে বলতে শুনেছি, তোমরা পাগলা কুকুরকেও কষ্ট দিয়ে বা অংগ প্রত্যংগ টুকরো টুকরো করে কেটে হত্যা করোনা, বরং এক কোপে হত্যা কর।" ইমাম হুসাইন (রা) কে এই সব উপদেশ দেয়ার পর তিনি তার তৃতীয় সন্তান মুহাম্মদকে উদ্দেশ্য করে বললেন ঃ

www.pathagar.com

“আমি তোমার ভাইকে যে উপদেশগুলো দিয়েছি, তুমি কি তা শুনেছ? সে বললোঃ “জ্বি হা।”

হযরত আলী (রা) বললেনঃ আমি তোমাকেও এই সব উপদেশ দিচ্ছি। সেই সাথে এ নসিহতও করছি,. তোমার ভাইদের সাথে সদ্ব্যবহার কর, তাদের সম্মান কর, তাদের অগ্রগন্যতার দিকে লক্ষ্য রেখ এবং তাদের সাথে পরামর্শ না করে কোন কাজ করোনা।

এরপর তিনি হযরত হুসাইনকে বললেন ঃ “আমি তোমাকে ওসিয়ত করছি, তুমি মুহাম্মাদের সাথে সদাচরণ কর। কেননা সে তোমাদের ভাই। ওকে আমি ভালোবাসি। তাই তোমরাও ওকে ভালোবাস।”

ইবনে মুলজাম হযরত আলীর ওপর আক্রমণ চালিয়েছিল ১৯শে রমযান (হিঃ ৪০) রাতে। (মোতাবেক ১৯ আগস্ট, ৬৬১) আর সেই আঘাতের প্রভাবে তিনি ২১শে রমযান ইন্তিকাল করলেন। ফজরের আগেই কাফন দাফন সম্পন্ন হলো।

ইবনে মুলজামকে হযরত আলী (রা) যেভাবে নির্দেশ দিয়েছিলেন সেভাবেই হত্যা করা হলো।

হযরত আলীর (রা) তিরোধানে আল্লাহ ও রাসূলের আদর্শে প্রতিষ্ঠিত খেলাফতে রাশেদা তথা ইসলামী প্রজাতন্ত্রের ধারাবাহিক শাসনের বিলুপ্তি ঘটে। তারপর হযরত হাসান অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য নামমাত্র খলিফা নিযুক্ত হন, যার কার্যকরিতা কয়েকটা শহরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। হযরত আলী (রা) সম্পর্কে সৈয়দ আমীর আলী যথার্থই বলেছেন! “তার চরিত্রে যদি হযরত ওমরের কঠোরতা থাকতো, তবে আরবদের মত দুর্দান্ত জাতিকে আরো সাফল্যের সাথে শাসন করতে পারতেন। কিন্তু তার ক্ষমাশীলতা ও উদারতাকে দুর্বলতা গণ্য করা হয়।”

www.pathagar.com

হযরত ইমাম হাসানের (রা) খিলাফত

হযরত আলীর (রা) শাহাদাতের পর তাঁর ছেলে ইমাম হাসানকে (রা) কুফাবাসী খলিফা নির্বাচিত করে। পিতার শাসনাধীন অঞ্চলে খলিফা নির্বাচিত হলে মক্কা ও মদীনার অধিবাসীগণও তাঁর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে। অপর দিকে সিরিয়া ও মিশরের একচ্ছত্র শাসক ও রাজা আমীর মুয়াবিয়ার (রা) সাথে তার বিরোধ অবশ্যম্ভাবী হয়ে দাঁড়ায়। যে আমীর মুয়াবিয়া (রা) হযরত আলীর (রা) খিলাফত মেনে নিতে পারেননি, তিনি হযরত হাসানের (রা) খিলাফত কিভাবে মেনে নেবেন। তাই যে চক্রান্তের মাধ্যমে তিনি হযরত আলীকে (রা) সমগ্র মুসলিম জাহানের শাসন ক্ষমতা থেকে উৎখাত করার প্রচেষ্টা চালাতে থাকেন, ঠিক সেই একই উপায় তিনি সরলমতি ও দুর্বলচিত্ত ইমাম হাসানকেও খিলাফত থেকে বঞ্চিত করার দুরভিসন্ধী আঁটেন।

তিনি ইমাম হাসানের (রা) বিরুদ্ধে অনতিবিলম্বে রাজধানী কুফায় একদল সৈন্য প্রেরণ করেন। ইমাম হাসান (রা) হযরত আলীর (রা) রেখে যাওয়া ৪০ হাজার সৈন্যের সুশৃংখল বাহিনীর অধিকারী হলেও নিজে যুদ্ধবিদ্যায় তেমন পারদর্শী ছিলেন না। তিনি সেনাপতি কায়েসের নেতৃত্বে ১২ হাজার সৈন্যের একটা বাহিনীকে মুয়াবিয়ার (রা) বাহিনীর প্রতিরোধের জন্য পাঠালেন। কায়েস বীরবিক্রমে যুদ্ধ করে মুয়াবিয়ার (রা) বাহিনীর প্রচুর ক্ষতি সাধন করেন। মুয়াবিয়া (রা) অবস্থা বেগতিক দেখে আবার চক্রান্তের আশ্রয় নিয়ে গুজব ছড়ালো যে, কায়েস পরাজিত ও নিহত হয়েছেন। এর ফলে হাসানের (রা) বাহিনীর মনোবল ভেঙ্গে পড়ে। এতে ইমাম হাসান (রা) বিচলিত হয়ে কুফা ছেড়ে পারস্যের রাজধানীতে আশ্রয় গ্রহণ করেন। কারো কারো মতে, ইমাম হাসান (রা) নিজেই যুদ্ধ পরিচালনা করেন। কিন্তু মুয়াবিয়ার (রা) বাহিনীকে প্রতিহত করতে ব্যর্থ হন। কুফাবাসীর কাপুরুষতা দেখে তিনি যুদ্ধ জয়ের আশা ত্যাগ করে মুয়াবিয়ার (রা) কাছে সন্ধির প্রস্তাব সম্বলিত চিঠি পাঠান। আমীর মুয়াবিয়া (রা) তৎক্ষণাত সন্ধিতে সম্মত হন। সন্ধির শর্তাবলী ছিল নিম্নরূপ ঃ

১. ইমাম হাসান (রা) মুয়াবিয়াকে (রা) খলিফা বলে স্বীকৃতি দেবেন।
২. মুয়াবিয়ার মৃত্যুর পর ইমাম হাসানের (রা) দ্বিতীয় ভাই ইমাম হুসাইন (রা) খলিফা হবেন। ততদিন ইমাম হুসাইন বার্ষিক ২০ লাখ দিরহাম ভাতা পাবেন।
৩. ইরাকবাসীকে পূর্ণ নিরাপত্তা দেয়া হবে এবং কাউকে অতীত ঘটনার জন্য কোন শাস্তি দেয়া হবেনা।
৪. আহওয়াজের রাজস্ব ইমাম হাসানের (রা) নামে লিখে দেয়া হবে।
৫. ইমাম হাসানকে (রা) এককালীন নগদ পঞ্চাশ লক্ষ দিরহাম দেয়া হবে।

www.pathagar.com

৬. বনু হাশেমের সদস্যদেরকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে দান ও উপঢৌকন প্রদান করা হবে।

আমীর মুয়াবিয়া (রা) অম্লান বদনে সবকটা শর্ত মেনে নেন। আর তৎক্ষণাত ইমাম হাসান (রা) সপরিবারে মদীনায় গিয়ে অবসর জীবন যাপন করতে শুরু করেন। আট বছর পর ৬৬৯ খৃষ্টাব্দে মুয়াবিয়ার (রা) ছেলে ইয়াযীদের চক্রান্তে মায়মুনা নাম্মী এক কুটীল রমনীর প্ররোচনায় স্বীয় স্ত্রী যায়েদার হাতে বিষ খেয়ে ইমাম হাসান (রা) শহীদ হন।

বনু হাশেম গোত্র ইমাম হাসানের (রা) সন্ধিতে সায় দেয়নি। ইমাম হুসাইনও হাসানকে এই সন্ধি করতে নিষেধ করেন। কিন্তু ইমাম হাসান ইরাকবাসীর দোদুল্যমানতা, চঞ্চলতা ও নিজের বাহিনীর ভীরুতা ও অদক্ষতা দেখে সন্ধি করাই শ্রেয় মনে করেন। তাদের ওপর তিনি মোটেই আস্থা রাখতে পারেননি। তারা সুযোগ পেলেই মুয়াবিয়ার (রা) দলে ভিড়ে যাবে বলে তার আশংকা হচ্ছিল! এমতাবস্থায় তিনি যে সিদ্ধান্ত নেন, সেটাই বাস্তব সম্মত ছিল! এতে সিফফীন যুদ্ধের ন্যায় আরেকটা ব্যাপক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ থেকে মুসলমানরা রক্ষা পেল। কেননা মুয়াবিয়া কোন অবস্থাতেই রক্তপাত এড়ানোর জন্য ক্ষমতা ত্যাগ করতে রাযী হতেন না, যেমন ইতিপূর্বেও করেননি।

ইমাম হাসানের (রা) সাথে সন্ধিচুক্তি সম্পাদনের পর আমীর মুয়াবিয়া (রা) বীর দর্পে কুফায় প্রবেশ করে নিজেকে খলিফা বলে ঘোষণা করলেন। তিনি কার্যত সমগ্র মুসলিম জাহানের একচ্ছত্র শাসকে পরিণত হলেন। তবে সেটা হলেন রক্তপাত, ষড়যন্ত্র, বিদ্রোহ ও নৈরাজ্য সৃষ্টির মাধ্যমে।

হযরত আমীর মুয়াবিয়া (রা) নিঃসন্দেহে একজন বিশিষ্ট সাহাবী ছিলেন এবং তার কার্যকলাপের নিন্দা বা সমালোচনা করা পছন্দনীয় কাজ নয়। তথাপি ঐতিহাসিক বাস্তবতা ও শরীয়াতের সুস্পষ্ট বিধির আলোকে এ কথা না বলে পারা যায় না যে, তিনি অন্তত চারটে কাজ এমন করেছেন যার প্রতি সমর্থন জানানোর কোনই উপায় নেই এবং বিগত চৌদ্দশো বছরের ভেতরে উম্মাতের কোন একজন মনীষীও তাকে ইসলাম সম্মত বা ন্যায় সংগত বলে রায় দেননি। বরং সর্বকালের সকল মনীষী সর্বসম্মতভাবে এগুলোকে অন্যায়, অবৈধ ও গর্হিত কাজ বলেছেন। সেই কাজ হলো ঃ

১. মুসলমানদের নির্বাচিত খলিফার বিরোধিতা করে ও তার বিরুদ্ধে প্রকাশ্য সশস্ত্র বিদ্রোহ করে ইসলামের মূলনীতির ওপর কুঠারাঘাত করেছেন।

২. নিজের ক্ষমতাকে পাকাপোক্ত করার জন্য তিনি মুসলমানদের রাজকোষ থেকে যথেচ্ছা অপরিমিত অর্থ ব্যয় করেন।

৩. খিলাফত ও পরামর্শভিত্তিক শাসন ব্যবস্থার পতন ঘটিয়ে তিনি শুধু যে রাজতান্ত্রিক শাসন প্রবর্তন করেছেন তাই নয়, বরং রাসূল (সা) ও চার খলিফার প্রতিষ্ঠিত

www.pathagar.com

"পরামর্শভিত্তিক সর্বাপেক্ষা সৎ ব্যক্তির নেতৃত্বে"র রীতি লংঘন করে জেনে শুনে নিজের চরম অসৎ ছেলে ইয়াযীদের পক্ষে বল প্রয়োগে আনুগত্য আদায় করেন ও তাকে পরবর্তী রাজা নিয়োগ করেন।

৪. তিনি হযরত হাসানের (রা) সাথে সম্পাদিত চুক্তি অনুসারে ইমাম হুসাইনকে খলিফা নিযুক্ত না করে ইয়াযীদকে নিযুক্ত করেন।

তবে কথায় বলে "আল্লাহর মার দুনিয়ার বার"। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, "তিনি যাকে ইচ্ছা রাজত্ব দান করেন এবং যাকে চান রাজত্ব থেকে বঞ্চিত করেন।" কোন বান্দার পক্ষে আল্লাহর ইচ্ছার বিরুদ্ধে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়া বা থাকা সম্ভব নয়। আমীর মুয়াবিয়া (রা) যে রাজত্ব তার ছেলেকে দিয়ে যান, তার শোচনীয় পরিণতি কারো অজানা নেই। আমীর মুয়াবিয়ার (রা) ইন্তিকালের পর থেকেই এই রাজত্বের পতনের সূচনা হয় এবং মাত্র নব্বই বছরের মধ্যেই উমাইয়া রাজবংশের মর্মান্তিক বিলুপ্তি ঘটে।

www.pathagar.com

ইয়াযীদ বিন মুয়াবিয়া ও তার রাজনীতি

আগেই উল্লেখ করেছি, ইমাম হাসানের (রা) সাথে আমীর মুয়াবীয়া (রা) যে সন্ধিচুক্তিতে স্বাক্ষর করেন, তাতে তিনি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিলেন যে, তাঁর মৃত্যুর পর ইমাম হাসানের ছোট ভাই ইমাম হুসাইন (রা) খলিফা হবেন। কিন্তু ৬৭৯ খৃষ্টাব্দে তিনি মৃত্যুর এক বছর আগে সন্ধিচুক্তির শর্ত ভংগ করে নিজের ছেলে ইয়াযীদকে উত্তরাধিকারী নিযুক্ত করলেন। ফলে ৬৮০ খৃষ্টাব্দে আমীর মুয়াবিয়ার (রা) মৃত্যু হলে ইয়াযীদ সিংহাসনে আরোহন করেন। ইয়াযীদকে এই সিংহাসন লাভ করার জন্য কোন চেষ্টা করতে হয়নি এবং এর কোন যোগ্যতাই তার ছিলনা। একদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে সে দেখতে পেল, নিজের বাবার স্থলে সে রাজা হয়ে গেছে। কিন্তু সাধারণ মুসলমানরা তার রাজত্বকে মোটেই পছন্দ করেনি। কারণ ইয়াযীদের চারিত্রিক ত্রুটিগুলো বিশদভাবে সমাজের সবাই না জানলেও ইমাম হুসাইন (রা) যে তার তুলনায় অনেক বেশী সৎ ও চরিত্রবান, সেটা সবাই জানতো। সবার ধারণা ছিল, হযরত আলীর (রা) সাথে হযরত মুয়াবিয়ার (রা) যত বিবাদ-বিসম্বাদ ও যুদ্ধবিগ্রহ সংঘটিত হোক না কেন, রাসূলে করীমের একজন ঘনিষ্ঠ সাহাবী ও ওহী লেখক হয়ে তিনি অন্তত ইয়াযীদকে খলিফা নিয়োগ করবেন না, বরং হয় নিজের বিশ্বস্ত লোকদের মধ্যে থেকে কাউকে এ দায়িত্ব দিয়ে যাবেন, নতুবা পরবর্তী খলিফা নির্বাচনের কাজ তিনি সাধারণ মুসলমানদের ওপর ন্যস্ত করে যাবেন। কিন্তু তিনি এ দুটোর কোনটিই করেননি। ডন ক্রোমার বলেন, মুয়াবিয়ার (রা) মত জ্ঞানী ও বিচক্ষণ পিতার পক্ষে তার অযোগ্য ও পাপাসক্ত ছেলেকে উত্তরাধিকারী মনোনয়ন ঐতিহাসিকদের নিকট সত্যিই দুর্বোধ্য। ইয়াযীদের খলিফা নিযুক্তিকে সাধারণ মুসলমানরা, বিশেষত মক্কা ও মদীনার মুসলমানরা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ও অন্যায় বলে অভিহিত করেন এবং দামেস্কে প্রতিনিধি পাঠিয়ে মুয়াবিয়ার (রা) চুক্তিভংগের প্রতিবাদ করেন। আসলে খিলাফতের জন্য প্রয়োজন ছিল সৎ, সত্যবাদী, ন্যায়পরায়ণ ও রাজনৈতিক দূরদৃষ্টিসম্পন্ন একজন অভিজ্ঞ ব্যক্তির। তখনকার সমাজে এ ধরণের ব্যক্তিত্বের অভাব ছিলনা। আমীর মুয়াবিয়া (রা) যদি নিজের ছেলের পক্ষপাতী না হয়ে নিরপেক্ষভাবে খলিফা মনোনয়ন করতে চাইতেন, অথবা জনগণকে নির্বাচন করার সুযোগ দিতেন, তাহলে ইমাম হুসাইন (রা) অথবা আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রা) এ পদের উপযুক্ত পাত্র ছিলেন। মুসলিম জাতির বৃহত্তর স্বার্থ ও নেতা হবার যোগ্যতা সংক্রান্ত কুরআন ও হাদীসের সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনার আলোকে বিচার বিবেচনা করলে কোন অবস্থাতেই এ পদে ইয়াযীদ মনোনয়ন লাভ করতে পারতোনা।

যাহোক। ইয়াযীদ রাজত্ব লাভের পর তিন বছরের বেশী বেঁচে থাকেনি। এই তিন বছরে

www.pathagar.com

সে মুসলমানদের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশকে অতিষ্ট করে তুলেছিল এবং নিজের শত্রু বানিয়ে ফেলেছিল। কেয়ামত পর্যন্ত সে ইসলাম ও মুসলিম জাতির জঘণ্যতম দুশমন হিসেবে চিহ্নিত হয়ে গেছে। পবিত্র মক্কা ও মদীনায় আক্রমণ চালিয়ে উভয়ের পবিত্রতা ক্ষুন্ন করা ও ইমাম হুসাইনকে (রা) শহীদ করা এত বড় অপরাধ যে, এর যে কোন একটাই কাউকে মুসলমানদের দৃষ্টিতে নিকৃষ্টতম যালেম শাসক হিসেবে চিহ্নিত করার জন্য যথেষ্ট।

পাশ্চাত্যের কিছু কিছু ঐতিহাসিক ইয়াযীদের পক্ষে কিছু কিছু খোঁড়া ওজুহাত দাঁড় করার চেষ্টা করে থাকেন। যেমন বার্ণার্ড লুইস বলেন, ইয়াযীদ রাজোচিত গুণাবলীর অধিকারী ছিল। সে সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা করতো। ইত্যাদি ইত্যাদি। আবার কেউ কেউ বলেন, কারবালার ঘটনার জন্য সে সরাসরি দায়ী নয়, ওবায়দুল্লাহ বিন যিয়াদই প্রত্যক্ষভাবে দায়ী। কারবালা থেকে শত শত মাইল দূবরর্তী দামেস্কে বসে ইয়াযীদ ইমাম হুসাইনের (রা) হত্যাকাণ্ডের বিষয়ে কিছুই জানতোনা। ইমাম হুসাইনের (রা) ছিন্নমস্তকসহ তার পরিবার পরিজনকে দামেস্কে বন্দীরূপে নিয়ে যাওয়া হলে ইয়াযীদ তাদেরকে মুক্তি দেয় এবং সসম্মানে মদীনায় পাঠিয়ে দেয়। আর ওবায়দুল্লাহ গংকে হুসাইনের (রা) হত্যার জন্য তিরস্কার করে। ইত্যাদি।

কিন্তু আরব ঐতিহাসিকদের লেখা পুস্তকাদিতে তার এসব মনগড়া সদগুণাবলীর কোন উল্লেখ দেখা যায় না। হাশিমী বিদ্বেষ যে তার মজ্জাগত ছিল, উমাইয়া বংশের নিরাপত্তার জন্য সে যে শত্রুমুক্ত হতে চেয়েছিল এবং সেজন্য প্রয়োজনীয় সব কিছু করার যোগ্যতাসম্পন্ন লোকদেরকে সে বেছে বেছে যথাস্থানে নিয়োগ করে তদ্রূপ নির্দেশ দিয়ে রেখেছিল সে কথা কেউ অস্বীকার করতে পারেনা। তা ছাড়া কারবালার ঘটনার জন্য প্রত্যক্ষভাবে দায়ী ব্যক্তি শিমার ও ওবায়দুল্লাহ বিন যিয়াদের বিরুদ্ধে সে কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে– এমন কথাও জানা যায়না। খ্যাতনামা প্রাচ্যবিদ লামেন্স ইয়াযীদের পক্ষে সাফাই গাইতে গিয়ে পুরো একখানা বই লিখে ফেলেছেন। ঐ বইতে তিনি প্রামাণ্য অপ্রামান্য হরেক রকম তথ্য দিয়ে ইয়াযীদকে অত্যন্ত সৎ ও নিষ্পাপ প্রমাণ করতে চেয়েছেন। কিন্তু লামেন্সের এ বই ইতিহাসের বিকৃতি ছাড়া কিছু নয় এবং শুধু সাধারণ মুসলিম জনমত কর্তৃকই তা প্রত্যাখ্যাত হয়নি, বরং সকল নিরপেক্ষ ঐতিহাসিকই তা অগ্রাহ্য করেছেন।

কোন কোন প্রাচ্যবিদ এ কথাও বলে থাকেন যে, ইয়াযীদ আসলে তার বাবা ও অন্যান্য উমাইয়া ব্যক্তিবর্গের বেপরোয়া কার্যকলাপের শাস্তি ভোগ করেছে। সাধারণ মুসলমানদের যে পুঞ্জীভূত ক্ষোভ ও ক্রোধ আমীর মুয়াবিয়ার (রা) কঠোর শাসনের দরুণ প্রকাশ পায়নি, ইয়াযীদের আমলে তার বিস্ফোরণ ঘটেছে।

www.pathagar.com

এ সব মতামত নিয়ে সবিস্তারে আলোচনা করা এ পুস্তকের উদ্দেশ্য নয়। এখানে শুধু প্রকৃত ঘটনাবলী তুলে ধরাই আমার লক্ষ্য। তথাপি এ কথা না বলে পারা যায় না যে, পাশ্চাত্যের ঐতিহাসিকদের এই ইয়াযীদ প্রীতির সাথে ইসলাম বিদ্বেষী মানসিকতা ছাড়া ঐতিহাসিক সত্যের কোন দূরতম সম্পর্কও নেই। ইয়াযীদ ক্ষমতায় এসেই এমন সব কাজ শুরু করে দেয়, যা থেকে মনে হয়, তার ভেতরে ইনসাফ, সত্য প্রীতি ও ন্যায় পরায়ণতা তো দূরে থাক, ন্যূনতম রাজনৈতিক প্রজ্ঞা, দূরদর্শিতা ও কাণ্ডজ্ঞান পর্যন্ত ছিলনা। বিভিন্ন এলাকায় প্রশাসক নিয়োগ করার সময় সে যেমন দক্ষতার পরিচয় দেয়নি, তেমনি তাদেরকে জনসাধারণের সাথে সদয় ও ন্যায়সংগত আচরণ করার উপদেশও দেয়নি। সুতরাং তার শাসনামলে যা কিছু ঘটেছে এবং তার কর্মকর্তা, কর্মচারী ও প্রশাসকরা যে সব কাজ করেছে, সে সবের জন্য ইয়াযীদ প্রত্যক্ষভাবেই দায়ী। ইয়াযীদ যদি তার অধীনস্থ প্রশাসকদেরকে সদয় ও নম্র আচরণ করতে বলতো এবং অন্যায় অত্যাচার করলে শাস্তির ব্যবস্থা করতো, বা অন্তত ভয় দেখাতো, তাহলে কেউ তার হুকুম অমান্য করার ধৃষ্টতা দেখাত না। বিদ্রোহ দমনের নামে মক্কা ও মদীনায় আক্রমণ ও গণহত্যা, যত্রতত্র কথায় কথায় হত্যা এবং সর্বশেষে ইমাম হুসাইনের (রা) হত্যাকাণ্ড– বলতে গেলে এগুলো নিয়েই ইয়াযীদের তিন বছরব্যাপী শাসনামল কেটে গেছে। কর্মকর্তা ও কর্মচারীদেরকে সদাচরণ করার উপদেশ দেয়ার পরিবর্তে সে তাদেরকে চরম সেচ্ছাচারমূলক আচরণ করার অবাধ অনুমতি দিয়ে রেখেছিল। তার আমলের সার্বিক তৎপরতা পর্যালোচনা করলে মনে হয় কুরআন ও সুন্নাহকে রাজনৈতিক অংগন থেকে অঘোষিতভাবে হলেও পুরোপুরি নির্বাসিত করা হয়েছিল। এমন কি কেউ তাকে কোন ব্যাপারে কুরআন ও হাদীসের নির্দেশ, ইসলামী মূল্যবোধ বা মানবতার দাবী সম্পর্কে কোন সদুপদেশ দিতেও সাহস করতোনা। কেননা এ ধরণের সদুপদেশ দানের ধৃষ্টতা কেউ দেখালে কারাদণ্ড নয়, বরং প্রাণদণ্ডই ছিল তার ন্যূনতম শাস্তি। রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পর্যায় থেকে এহেন নিষ্ঠুর নিপীড়নমূলক শাসন ব্যবস্থার প্রচলন, বিশেষত এমন এক সময়ে, যখন রাসূল (সা) এর পবিত্র যুগের পর এক শতাব্দীও পার হয়নি এবং তাঁর ও খোলাফায়ের রাশেদীনের প্রতিষ্ঠিত ইসলামী সমাজ শত শত জীবিত সাহাবী সমেত বিদ্যমান, –এত বড় কাণ্ডজ্ঞানহীনতার নামান্তর ছিল, যা কোন অবস্থাতেই মার্জনীয় বিবেচিত হতে পারেনা। আর ইসলামের প্রথম শতাব্দীতেই এহেন অন্যায় ও হিংস্র রাজনীতির প্রচলনে ইসলামী রাষ্ট্রের এত বড় ক্ষতি সাধিত হয়, যা পূরণ করার আর কোন সম্ভাবনাই অবশিষ্ট থাকেনি।

ইয়াযীদের জন্ম হয়েছিল হযরত উসমানের শাসনামলে, ২৫ অথবা ২৬ হিজরী সনে, মোতাবেক ৬৪৬ বা ৬৪৭ খৃষ্টাব্দে। বাবা হযরত মুয়াবিয়ার ইন্তিকালের পর যখন তাকে রাজকীয় মুকুট পরানো হয়, তখন সর্বপ্রথম তার মাথায় এই চিন্তা প্রবেশ করে যে, যারা

www.pathagar.com

তার বাবার আনুগত্য স্বীকার করেনি, তাদেরকে যে কোন প্রকারেই হোক, আনুগত্য স্বীকার করতে বাধ্য করা চাই-ই চাই। তাই সে মদীনার প্রশাসক ওলীদ বিন উকবাকে হযরত মুয়াবিয়ার ইন্তিকালের খবর জানিয়ে চিঠিতে নির্দেশ দিল যে, "হযরত আলীর (রা) ছেলে ইমাম হুসাইন (রা), হযরত ওমরের (রা) ছেলে আব্দুল্লাহ (রা) এবং হযরত যুবাইরের (রা) ছেলে আব্দুল্লাহর (রা) (হযরত আবু বকরের দৌহিত্র) কাছ থেকে অবিলম্বে আনুগত্যের শপথ আদায় করে নাও, আনুগত্যের শপথ না করা পর্যন্ত তাদেরকে তোমার কাছ থেকে যেতে দিওনা।"

ইয়াযীদের চিঠি পাওয়া মাত্রই ওলীদ তার পূর্বতন মদীনার শাসক মারওয়ান বিন হাকামকে ইয়াযীদের চিঠি দেখালো ও তার পরামর্শ চাইল। মারওয়ান পরামর্শ দিল যে, এই সাহাবীত্রয়কে এক্ষুনি ডেকে এনে আনুগত্যের শপথ করতে বাধ্য বরা উচিত। সে একথাও বললোঃ

"আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) ক্ষমতার দাবীদার নন। উনি যদি আনুগত্যের শপথ নাও করেন, ক্ষতি নেই। ক্ষতির আশংকা আছে ইমাম হুসাইন (রা) ও আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইরের (রা) পক্ষ থেকে। কাজেই ঐ দু'জনকে কাল বিলম্ব না করে এক্ষুনি ডেকে আনাও এবং আনুগত্যের শপথ করতে বাধ্য কর। করলে ভালো। নচেত তাদেরকে জীবিত বাইরে যেতে দিওনা।"

ওলীদ একজন বালককে পাঠালো ইমাম হুসাইন (রা) ও আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইরকে (রা) ডেকে আনতে। তারা দু'জন তখন মসজিদে নববীতে ছিলেন। এমন অসময়ে ডাক পড়াকে তারা দু'জনেই অশনি সংকেত মনে করে বললেন : "মনে হচ্ছে, মুয়াবিয়া (রা) মারা গেছেন। এ জন্য আমাদেরকে ইয়াযীদের আনুগত্যের শপথ করতে ডাকা হচ্ছে।" হযরত হুসাইন (রা) কয়েকজন লোক সাথে নিয়ে ওলীদের কাছে গেলেন। লোকগুলোকে বললেন "তোমরা দরজার ওপর বসে থাক। আমি যদি তোমাদেরকে ডাকি অথবা যদি শুনতে পাও, আমি উচ্চ কণ্ঠে কথা বলছি, তাহলে সবাই ঘরের ভেতরে চলে আসবে। তবে এ ধরনের কিছু না ঘটলেও দরজা থেকে সরবেনা যতক্ষণ আমি বাইরে না আসি।"

নিজের অনুগত কয়েক ব্যক্তিকে পাহারারত রেখে হযরত হুসাইন (রা) ভেতরে অবস্থানরত ওলীদ ও মারওয়ানের কাছে গেলেন। ওলীদ তাঁকে আমীর মুয়াবিয়ার (রা) ইন্তিকালের খবর জানালো এবং ইয়াযীদের চিঠি পড়ে শোনালো। ইমাম হুসাইন (রা) ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন" পড়লেন এবং বললেন : আল্লাহ হযরত মুয়াবিয়ার ওপর করুনা করুন। তবে আমার মত ব্যক্তি গোপনে আনুগত্যের শপথ করতে পারেনা। আপনি এ উদ্দেশ্যে সাধারণ মানুষের সমাবেশ আহ্বান করুন। আমিও

www.pathagar.com

তাদের সাথে আসবো। সকলে যা সমীচীন মনে করে, সেটাই করা হবে।”

ইমাম হুসাইনের (রা) এই রাজনীতিক সুলভ কুশলী জবাবে ওলীদ ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল এবং তাকে যাওয়ার অনুমতি দিল। তাঁর চলে যাওয়ার পর মারওয়ান ওলীদকে বললো : 'তুমি হুসাইনকে (রা) চলে যেতে দিয়ে ভুল করলে। এখন মনে হচ্ছে, তোমাদের সাথে হুসাইনের (রা) রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে পড়েছে। বিনা যুদ্ধে হুসাইনকে তুমি আর বাগে আনতে পারবেনা।”

ওলীদ বললো : “তুমি বল কী? তুমি কি সত্যই চাও আমি হুসাইনকে হত্যা করি? আল্লাহর কসম, কেয়ামতের দিন যাকে হুসাইনের খুনী হিসাবে আসামী করা হবে, তার আর নিস্তার থাকবেনা।”

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর ওলীদের কাছ থেকে একদিনের সময় চাইলেন এবং রাতের ভেতরেই মদীনা ত্যাগ করে মক্কা অভিমুখে রওনা হলেন। সকাল বেলা যখন ওলিদ জানলো যে, আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর মদীনা থেকে পালিয়েছেন। তখন সে তাঁর পেছনে কয়েকজন ঘোড় সওয়ার জওয়ানকে পাঠালো। কিন্তু তিনি মক্কার দিকে এমন এক অজানা পথ ধরে অগ্রসর হয়েছিলেন, ওলীদের লোকেরা যার হদিস পেলনা এবং ব্যর্থ হয়ে ফিরে এল।

পরের দিন অর্থাৎ ২৭শে রজব, ৬০ হি: (৩রা মে, ৬৮০ খৃ.) গভীর রাতে ইমাম হুসাইনও (রা) পরিবার পরিজনসহ মক্কা রওনা হয়ে গেলেন। একমাত্র তার ভাই মুহাম্মাদ ইবনুল হানফিয়া মদীনায় থেকে গেলেন। এরপর ওলীদ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর ও আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাসকে ডেকে আনালেন। উভয়ে বিনা বাক্য হয়ে ইয়াযীদের আনুগত্যের শপথ করলেন।

ইমাম হুসাইন (রা) মক্কায় পৌছলেন ৩রা শাবান তারিখে। তিনি শিয়াবে আলীতে অবস্থান করতে লাগলেন। মক্কাবাসী দলে দলে তার কাছে আসতে লাগলো। আর হযরত ইবনে যুবাইর কা'বা শরীফে অবস্থান করতে লাগলেন এবং দিনরাত এবাদাতে মশগুল হয়ে গেলেন। তিনি মাঝে মাঝে ইমাম হুসাইনের (রা) কাছে এসে আলাপ আলোচনাও করতেন।

www.pathagar.com

ইরাক থেকে গণ আমন্ত্রণ

হযরত ইমাম হুসাইন (রা) ইরাকে অত্যধিক জনপ্রিয় ছিলেন। ইরাক থেকে তাঁর ভক্তবৃন্দ তাকে ক্রমাগত চিঠি লিখতে থাকে যে, আপনি এখানে চলে আসুন। আমরা আপনাকে সর্বতোভাবে সমর্থন করবো এবং আমীর মুয়াবিয়ার বিরুদ্ধে আপনাকে সর্বপ্রকারে সাহায্য করবো। চিঠি ও দূত প্রেরণের মাধ্যমে এই গণ আমন্ত্রণের ধারা হযরত হাসানের (রা) আমল থেকেই শুরু হয়েছিল। কিন্তু হযরত হুসাইন (রা) সব সময় একই জবাব দিতেন : অপেক্ষা কর ও ধৈর্য ধারণ কর। আমীর মুয়াবিয়া অংগীকার করেছিলেন, যতদিন বেঁচে থাকবেন, ইমাম হুসাইনকে (রা) তিনি বিব্রত করবেননা এবং নিয়মিত ভাতা দিতে থাকবেন। এই প্রতিশ্রুতি তিনি যথারীতি পালনও করে যাচ্ছিলেন। তাই ইমাম হুসাইন (রা) আমীর মুয়ারিয়া (রা) কে উত্যক্ত করার কোন প্রয়োজনবোধ করেননি।

ইরাকের জনগণের সাথে, বিশেষত কুফাবাসীর সাথে হযরত হুসাইনের (রা) যে চিঠির আদান প্রদান চলতো, আমীর মুয়াবিয়ার (রা) আঞ্চলিক প্রশাসক, কর্মকর্তা-কর্মচারী ও গোয়েন্দারা তার খবরাদি সব সময় আমীর মুয়াবিয়াকে (রা) পৌছাতো। এই সুত্র ধরে তারা আমীর মুয়াবিয়াকে (রা) এরূপ ধারণা দেয়ার চেষ্টা করতো যে, ইমাম হুসাইন (রা) বিদ্রোহের প্রস্তুতি নিচ্ছেন, তাই তার বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ ও বাইতুল মাল থেকে তার ভাতা বন্ধ করে দেয়া উচিত। কিন্তু আমীর মুয়াবিয়া (রা) প্রতিবার তাদেরকে বলতেন, তোমরা হুসাইনকে (রা) কোনভাবে বিব্রত করোনা, তাঁর স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করোনা। সেই সাথে নির্দিষ্ট সময়ে তাঁর ভাতা তাঁর কাছে পৌছিয়ে দিতে কোনই ত্রুটি করতেন না।

আমীর মুয়াবিয়ার আমলে ওলীদ বিন উতবা নামক তার জনৈক প্রশাসক ইমাম হুসাইন (রা) ও তার সমর্থকদের মাঝে সম্পর্কচ্ছেদ ঘটানোর চেষ্টা করেছিলেন। তবে এই চেষ্টা তিনি আমীর মুয়াবিয়ার (রা) নির্দেশে করেছিলেন, না নিজের বিবেচনা অনুসারে করেছিলেন, তা জানা যায়নি। ওলীদ অত্যন্ত নম্র, ভদ্র ও সদাশয় প্রশাসক ছিলেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) তাঁর সম্পর্কে বলেন ঃ ওলীদ যখন মদীনার গভর্ণর হয়ে এলেন, তখন জেলখানায় যত কয়েদী ছিল, সবাইকে মুক্ত করে দিলেন এবং শহরে যত ঋণগ্রস্ত লোক ছিল, সবার ঋণ পরিশোধ করে দিলেন। ইমাম হুসাইনকে তিনি খুবই সম্মান ও ভক্তি করতেন। তাই তার এই চেষ্টার উদ্দেশ্য সম্ভবত এই যে, এভাবে তিনি ইমাম হুসাইনকে (রা) আমীর মুয়াবিয়ার আক্রোশ থেকে রক্ষা করতে চেয়েছিলেন।

www.pathagar.com

কেননা হযরত হুসাইন (রা) ও তার সমর্থকদের মাঝে যখন যোগাযোগ থাকবেনা তখন আমীর মুয়াবিয়া (রা) ইমাম হুসাইন (রা) এর দিক থেকে নিশ্চিন্ত হয়ে যাবেন এবং তার ওপর কোন রকম নির্যাতন চালাবেন না।

ইরাকের অন্য সব শহরের তুলনায় কুফাবাসী ইমাম হুসাইনের (রা) সবচেয়ে বেশী ভক্ত ও অনুরক্ত ছিল এবং তার নেতৃত্বে মুয়াবিয়ার (রা) বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার জন্য সবচেয়ে বেশী উদগ্রীব ছিল। তারা যখন শুনলো, আমীর মুয়াবিয়ার (রা) মৃত্যু হয়েছে এবং ইমাম হুসাইন (রা) ইয়াযীদের আনুগত্যের শপথ (বায়য়াত) করেননি, তখন তারা সুলায়মান বিন সারদ খাযায়ীর বাড়ীতে একটা গোপন সমাবেশে মিলিত হলো। এই সমাবেশে সুলায়মান ভাষণ দিতে গিয়ে বললেন : 'হুসাইন (রা) মদীনা থেকে বের হয়ে মক্কা চলে গেছেন। তোমরা তাঁর ও তাঁর বাবার সমর্থক ও অনুসারী। এই সময়ে তোমরা যদি তাঁকে সাহায্য করতে ও তার শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই করতে চাও, তবে তাকে চিঠি লিখে দাও, যেন উনি এখানে চলে আসেন। কিন্তু তোমরা যদি নিজেদেরকে দুর্বল ভেবে ভয় পাও, তাহলে অনর্থক তাকে বিপদে ফেলনা।"

স্মরণ করা যেতে পারে, ঠিক এ ধরনেরই একটা ভাষণ ও সতর্ক বাণী উচ্চারিত হয়েছিল রাসূল (সা) এর মদীনায় হিজরতের প্রাক্কালে আকাবার বায়য়াতের সময় মদীনার আনসারদের এক নেতার মুখ থেকে। কিন্তু পরিতাপের বিষয়, মদীনার আনসাররা রাসূলে করীমের (সা) ব্যাপারে শেষ পর্যন্ত যেরূপ দৃঢ়তা ও নির্ভিকতা দেখিয়েছিলেন, হযরত আলী (রা) ও ইমাম হুসাইন (রা) এর সমর্থকবৃন্দ যে তার ভগ্নাংশও দেখাতে পারেনি, কারবালার মর্মন্তদ ঘটনাই তার সাক্ষী।

সুলায়মানের ভাষণ শুনে উপস্থিত ভক্তবৃন্দ সমস্বরে বলে উঠলো : "আমরা অবশ্যই হুসাইনের (রা) শত্রুর বিরুদ্ধে লড়বো। প্রয়োজনে জীবন বাজী রেখে তাকে বিজয়ী করবো।"

এরপর সর্বসম্মতভাবে ইমাম হুসাইনকে একটা চিঠি লেখা হলো, যার বক্তব্য ছিল নিম্নরূপ :

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

সুলাইমান বিন সারদ খাযায়ী, মুসাইয়াব বিন বাখবা, রিফাহ বিন শাদ্দাদ, হাবীব বিন মুযাহির, আব্দুল্লাহ বিন ওয়াল ও অন্যান্য ঈমানদার ভক্তবৃন্দ ও সমর্থকবৃন্দের পক্ষ থেকে আমীরুল মুমিনীন হুসাইন বিন আলীর নিকট বিনীত নিবেদন।

আল্লাহ আপনাকে শান্তিতে ও নিরাপদে রাখুন। আল্লাহর শোকর, তিনি আপনার সেই দুশমনকে চিরনিদ্রায় শায়িত করেছেন যে চরম দাম্ভিক ও অত্যাচারী ছিল, (অর্থাৎ হযরত

www.pathagar.com

মুয়াবিয়া (রা)) যে মুসলিম উম্মাহর গোটা রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক অবকাঠামোকে লণ্ডভণ্ড ও তার শান্তি শৃংখলাকে বিনষ্ট করেছে, জনগণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাদের ওপর শাসন চালিয়েছে, উম্মাতের পুণ্যবান লোকদেরকে শহীদ করেছে, অসৎ ও দুষ্ট প্রকৃতির লোকদেরকে সাথী বানিয়েছে এবং আল্লাহর সম্পদকে সাথীদের ও আত্মীয়দের মধ্যে নির্বিচারে বিতরণ করেছে। আমাদের এখন কোন নেতা নেই। আপনি চলে আসুন, যেন আপনার সাহায্যে ও নেতৃত্বে আমরা সত্যের ওপর ঐক্যবদ্ধ হতে পারি। কুফার শাসক নুমান ইবনে বশীর সরকারী ভবনে আছে। তার পেছনে আমরা জুময়ার নামাযও পড়িনা, ঈদের নামাযও পড়িনা। আপনি আসছেন জানতে পারলে ওকে আমরা সিরিয়ায় পাঠিয়ে দেব। হে আল্লাহর রাসূলের প্রিয় দৌহিত্র, আপনার ওপর শান্তি, রহমত ও বরকত বর্ষিত হোক। মহীয়ান গরীয়ান আল্লাহ ছাড়া আর কেউ শক্তি ও সামর্থের যোগান দিতে সক্ষম নয়।"

কুফাবাসীর এই চিঠি আব্দুল্লাহ ইবনে মাসমা হামযানী ও আব্দুল্লাহ বিন ওয়ালের হাতে সোপর্দ করা হলো। তারা দু'জনে অতি দ্রুত গতিতে দশই রমযান তারিখে মক্কায় পৌঁছলেন এবং ইমাম হুসাইনের (রা) নিকট চিঠিটা হস্তান্তর করলেন।

কুফাবাসী ক্রমেই অধীর হয়ে উঠলো। উক্ত চিঠি পাঠানোর দু'দিন যেতে না যেতেই তারা কায়েস বিন মাশহাদসহ ৪/৫ জনকে শহরের আরো দেড়শো গণ্যমান্য ব্যক্তির চিঠি দিয়ে ইমাম হুসাইনের (রা) কাছে পাঠালো। এ সব চিঠিতেও তাকে তাড়াতাড়ি কুফা আসতে বলা হয়েছিল। এর পরও তারা দেরী সইতে পারলোনা। তারা এই দেড়শো চিঠি পাঠিয়েও ক্ষান্ত হলোনা এবং নিশ্চিন্ত হতে পারলোনা। দু'দিন অপেক্ষা করে পুনরায় হানী বিন সাবীয়ী ও সাঈদ বিন আব্দুল্লাহ আল-হানাফী নামক দু'ব্যক্তিকে এই মর্মে এক চিঠি দিয়ে পাঠালো ঃ

"ঈমানদার ভক্ত ও একনিষ্ঠ সমর্থকদের পক্ষ থেকে হযরত হুসাইন বিন আলীর কাছে প্রেরিত সাদর আমন্ত্রণ।

জনগণ অধীর আগ্রহে আপনার জন্য অপেক্ষমান। তারা আপনার ছাড়া আর কারো শাসন মেনে নেবেনা। আপনি যত শীঘ্র সম্ভব এখানে চলে আসুন। ওয়াস্ সালাম।"

এই চিঠির পর আরো একটা চিঠি লেখা হয়। তাতে লেখা হয়েছিল ঃ

"সমগ্র ইরাকে সবুজের সমারোহ ঘটেছে। সমস্ত ফলমূল পেকে গেছে। আপনার সাহায্যের জন্য বাহিনী প্রস্তুত। আপনি চলে আসুন।"

অথচ পরম পরিতাপের বিষয়, এমন উপচে পড়া আবেগে পরিপূর্ণ চিঠির পর চিঠি পাঠিয়েও কুফাবাসী ইমাম হুসাইনকে (রা) দেয়া ওয়াদা রক্ষা করেনি।

যখন ইমাম হুসাইনের (রা) কাছে ক্রমাগত কুফাবাসীর পক্ষ থেকে আমন্ত্রণপত্র আসতে

www.pathagar.com

লাগলো, তখন তিনি তার অভিজ্ঞ উপদেষ্টাদের সাথে পরামর্শ করার পর হানী ও সাঈদ নামক দূত দ্বয়ের কাছে কুফাবাসীকে সম্বোধন করে নিম্নরূপ চিঠি লিখে পাঠালোন:

"আপনাদের ইচ্ছা আমি ভালোভাবেই উপলব্ধি করেছি। আমি আমার চাচাতো ভাই ও বিশ্বস্ত মুসলিম বিন আকীলকে আপনাদের কাছে পাঠাচ্ছি। আমি তাকে বলে দিয়েছি, সাঠিক পরিস্থিতির খোঁজ খবর নিয়ে সে যেন আমাকে জানায়। আমি যদি বুঝতে পারি, কুফার জনসাধারণ ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ চিঠিতে যেমন ব্যক্ত করেছেন, ঠিক তেমনিভাবেই আমার খলিফা হওয়ার ব্যাপারে আগ্রহী, তাহলে আমি ইনশায়াল্লাহ শীগগীরই আপনাদের কাছে পৌছে যাবো। আসল কথা হলো, মুসলমানদের নেতা এমন ব্যক্তিরই হওয়া উচিত যিনি আল্লাহর কিতাব অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলেন, ন্যায় বিচার করেন এবং সত্যদ্বীনকে পরিপূর্ণভাবে অনুসরণ করেন।" .

মুসলিম বিন আকীলকে কুফা পাঠানোর উদ্দেশ্য ছিল এই যে, তিনি কুফাবাসীর সত্যিকার অবস্থান সম্পর্কে পুরোপুরি নিশ্চিত হতে চান, তাঁর সমর্থকদের সংখ্যা জেনে নিতে চান এবং কুফাবাসী তাকে সাহায্য ও সহযোগিতা করতে পুরোপুরিভাবে প্রস্তুত কিনা, সে সম্পর্কে আগেভাগেই গ্যারান্টি চান। এ পদক্ষেপ থেকে ধরে নেয়া যায় যে, ইমাম হুসাইনের (রা) পক্ষ থেকে কুফা রওনা হবার আগে যতটা সতর্কতা অবলম্বন করা সম্ভব ও প্রয়োজন ছিল, তা অবলম্বন করতে তিনি সজ্ঞানে ও সচেতনভাবে কোন ক্রটি করেননি।

কিন্তু ইমাম হুসাইনের (রা) ঘনিষ্ঠ সাথীরা কুফাবাসীকে মোটেই বিশ্বাস করতে প্রস্তুত ছিলনা। যখন ক্রমাগত চিঠি আসতে লাগলো, তখন তারা হযরত হুসাইনকে (রা) অনেক বুঝালেন যে, এই লোকেরা আপনার বাবাকেও প্রয়োজনের মুহূর্তে সাহায্য না করে তাকে বিপদের মুখে ঠেলে দিয়েছিল। তারপর তারা আপনার বড় ভাই হাসানের (রা) সাথেও বিশ্বাসঘাতকতা করেছে এবং আনুগত্যের শপথ ভংগ করেছে। তারা আপনার সাথেও একই আচরণ করে বসলে তাতে বিস্ময়ের কিছু থাকবেনা। তাই আপনি নিজে যাওয়ার আগে মুসলিমকে সেখানে পাঠান, যাতে তিনি সেখানে গিয়ে পরিস্থিতির যথাযথ অনুসন্ধান চালাতে পারেন এবং আপনাকে প্রকৃত অবস্থা অবহিত করেন।

মুসলিম বিন আকীল কুফা চলে গেলেন। তিনি মুখতার বিন আবি উবাইদের বাড়ীতে উঠলেন। হযরত আলীর (রা) পুরানো ভক্তরা মুসলিমের কাছে দলে দলে আসতে লাগলো। তিনি তাদেরকে হযরত হুসাইনের (রা) চিঠি পড়ে শুনাতে লাগলেন। তারা কেঁদে কেঁদে নিজেদের অনুরাগ ও আবেগ উজাড় করে দিয়ে অংগীকার করতে লাগলো যে, হযরত হুসাইনের (রা) নিরাপত্তা ও জয়ের জন্য প্রয়োজনে তারা জীবন বিসর্জন দিতেও কুণ্ঠিত হবেনা। মাত্র কয়েক দিনের মধ্যে আঠারো হাজার, মতান্তরে ত্রিশ হাজার

www.pathagar.com

কুফাবাসী মুসলিম বিন আকীলের হাতে হাত দিয়ে ইমাম হুসাইনের আনুগত্যের বায়য়াত করলো। মুসলিম ইমাম হুসাইনের (রা) নির্দেশ অনুসারে আবেস বিন আবি শুবাইব নামক দূতের মাধ্যমে তার কাছে একটা চিঠি পাঠালেন। এই চিঠিতে লেখা ছিল! " আঠারো হাজার ব্যক্তি বায়য়াত করেছে। আপনি নির্দ্বিধায় চলে আসুন। ইরাকবাসী আপনার সমর্থক এবং মুয়াবিয়ার (রা) বংশধরকে কোন অবস্থাতেই ক্ষমতায় দেখতে চায়না।

এ সময়ে কুফার প্রশাসক ছিলেন রাসূল (সা) এর বিশিষ্ট সাহাবী হযরত নুমান বিন বশীর (রা)। তিনি এ সব ঘটনা জানতে পেরে জামে মসজিদের মিম্বরে আরোহন করে আল্লাহর প্রশংসা করার পর নিম্নোক্ত ভাষণ দিলেন :

"হে আল্লাহর বান্দারা, আল্লাহকে ভয় কর এবং মুসলিম জাতির ভেতরে বিভেদ, বিশৃংখলা, অরাজকতা ও অস্থিরতা সৃষ্টি করোনা। ভালোভাবে স্মরণ রাখ বিভেদ, বিশৃংখলা ও অরাজকতা হত্যা, রক্তপাত ও লুণ্ঠনের পথ সুগম করে। আমি নিছক ধারণা ও অনুমাণের ভিত্তিতে কারো বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে চাইনা। যে ব্যক্তি আমার সাথে যুদ্ধ করতে চায় না, আমিও তার সাথে যুদ্ধ করবোনা। যে ব্যক্তি আমার ওপর আক্রমণ চালাবেনা, আমিও তার ওপর আক্রমণ চালাবোনা। তবে তোমরা প্রকাশ্য বিদ্রোহ ও ইয়াযীদের আনুগত্যের প্রতিশ্রুতি ভংগ করলে আমি যতক্ষণ ক্ষমতায় আছি, তরবারী হাতে নিয়ে তোমাদের মস্তক ছেদন করতে থাকবো।"

নুমান বিন বশীর অপেক্ষাকৃত নমনীয় ও উদার প্রকৃতির শাসক ছিলেন। তার এ ভাষণের পর জনৈক উগ্রপন্থী উমাইয়া বংশীয় উঠে দাড়িয়ে বললো : আমীর সাহেব, আপনি তো দুর্বলতা প্রকাশ করলেন। এতে কাজ হবেনা। সরকারের অবাধ্য লোকদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।"

নুমান জবাব দিলেন : "আমি আল্লাহর আনুগত্য ও ফরমাবরদারী অব্যাহত রাখলে আমাকে যদি কেউ দুর্বল ভাবে, তবে তাতে আমার কিছুই আসে যায়না। তবে আল্লাহর হুকুম অমান্য করে প্রতাপশালী আখ্যায়িত হতে চাইনা।"

এই লোকটা ইয়াযীদকে সব খবরাখবর জানিয়ে দিল। সে লিখলো : মুসলিম বিন আকীল কুফায় এসেছে এবং জনগণ দলে দলে তার হাতে বায়য়াত হচ্ছে। কিন্তু নুমান বিন বশীর (রা) তা ঠেকাতে পারছেন না। আপনি যদি কুফার ওপর অধিকার টিকিয়ে রাখতে ইচ্ছুক হয়ে থাকেন, তাহলে এখানে কোন কঠোর ও দৃঢ়চেতা ব্যক্তিকে শাসনকর্তা বানিয়ে পাঠান, যিনি আপনার প্রতিটা আদেশকে কার্যকরী করবেন এবং আপনার শত্রুদেরকে কঠোর হাতে দমন করবেন।

ইয়াযীদের কাছে এ ধরণের চিঠি আরো কয়েক ব্যক্তিও পাঠালো। ইয়যীদ যখন একের

www.pathagar.com

পর এক এ ধরনের চিঠি পেতে লাগলো, তখন সে নিজের বিশ্বস্ত খৃষ্টান সহযোগী ইবনে সারজোনের মতামত চাইল। সে বললো, বসরার শাসক উবায়দুল্লাহ বিন যিয়াদকে কুফার শাসক নিয়োগ করুন। উনি এ পরিস্থিতিকে সামাল দিতে পারবেন। ইয়াযীদ তার এ পরামর্শ গ্রহণ করে উবায়দুল্লাহ্ বিন যিয়াদকে বসরার সাথে সাথে কুফারও শাসক নিযুক্ত করলো। ওবায়দুল্লাহকে সে লিখলো, কুফায় গিয়ে মুসলিম বিন আকীলকে সেখান থেকে বহিষ্কার কর অথবা হত্যা করে ফেল। ইয়াযীদের এ চিঠি পেয়ে সে কুফা যাওয়ার প্রস্তুতি নিতে শুরু করে দিল।

ইতিমধ্যে হযরত হুসাইনের (রা) একটা চিঠি তাঁর ভৃত্য সুলায়মানের মাধ্যমে বসরার ইয়াযীদ বিন মাসউদ নাহশালী ও মুনযির বিন জারুদ প্রমুখ গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের কাছে পৌছলো। ঐ চিঠিতে তিনি বসরাবাসীর সাহায্য, সমর্থন ও আনুগত্যের উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছিলেন। এ চিঠি পেয়ে ইয়াযীদ বিন মাসউদ বনুতামীম, বনু হানযালা ও বনুসা'দ এ তিন গোত্রের লোকজনকে সমবেত করলো এবং জিজ্ঞেস করলো ঃ

"হে বনুতামীম, বলতো আমার বংশ মর্যাদা ও সম্মান প্রতিপত্তি তোমাদের দৃষ্টিতে কেমন ?"

তারা বললো ঃ হে সরদার, এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করার কী আছে? সবাই জানে, আভিজাত্যে, সম্মানে ও প্রভাব প্রতিপত্তিতে আপনার সমকক্ষ কেউ নেই।"

ইয়াযীদ বিন মাসউদ বললো ঃ "তোমাদের কাছ থেকে কিছু পরামর্শ, মতামত ও সাহায্য চাওয়ার জন্য আমি আজ তোমাদেরকে এখানে ডেকেছি।"

জনতা বললো ঃ 'আপনি বলুন, আমরা মনোযোগ দিয়ে শুনবো। আমরা আপনার প্রতিটি উপদেশ ও সিদ্ধান্ত মেনে নিতে প্রস্তুত।" এরপর ইয়াযীদ বিন মাসউদ নিম্নরূপ ভাষণ দিলঃ

"মুয়াবিয়ার (রা) মৃত্যু হয়েছে। তার মৃত্যুর সাথে সাথে অত্যাচার ও অনাচারের পথ বন্ধ হয়ে গেছে। যুলুমের প্রাসাদ ভূমিস্যাত হয়েছে। তিনি ভেবেছিলেন, তার সাম্রাজ্যকে তিনি মজবুত করে গড়ে তুলছেন। কিন্তু এটা তার আকাশকুসুম কল্পনা প্রমাণিত হয়েছে। মুয়াবিয়ার (রা) মৃত্যুর পর একজন মদখোর পাপাচারী খলিফা হবার দাবী করছে এবং মুসলমানদের ওপর জোরপূর্বক ও তাদের অসম্মতি সত্ত্বেও তার শাসন চাপিয়ে দিতে চাইছে। তার না আছে ইসলামের জ্ঞান, না আছে সহনশীলতা ও উদারতা। আমি আল্লাহর কসম খেয়ে বলছি, এই জঘণ্য ব্যক্তির (ইয়াযীদ) সাথে জেহাদ করা মোশরেকদের বিরুদ্ধে জেহাদ করার চেয়েও উত্তম। এই দেখ, আমার কাছে রাসূলুল্লাহর (সা) নাতি ও হযরত আলীর ছেলে হুসাইনের চিঠি এসেছে। তাঁর চেয়ে সৎ ও সম্মানিত ব্যক্তি পৃথিবীতে আর কেউ নেই। তাঁর জ্ঞান ও মহত্ত্বের পরিচয় দেয়া সূর্যকে

www.pathagar.com

প্রদীপ দেখানোর মত নির্বুদ্ধিতার কাজ। মহত্ব, শ্রেষ্ঠত্ব, বয়স, ইসলামের জন্য ত্যাগ ও কুরবানী এবং রাসূল (সা) এর নিকটাত্মীয় হিসেবে খিলাফতের যোগ্য ব্যক্তি একমাত্র হুসাইন (রা), যিনি ছোটদেরকে স্নেহ ও বড়দেরকে সম্মান করেন। এখন তোমরা আল্লাহর জ্যোতি অর্জনে বেশী করে অংশগ্রহণ কর এবং বাতিলের পথে গিয়ে নিজেদেরকে ধ্বংস করোনা। উষ্ট্রযুদ্ধের সময় সুখর বিন কায়েসের নেতৃত্বে যুদ্ধ থেকে তোমরা পিছু হটে এসেছিলে। এখন আল্লাহ তোমাদেরকে আরো একটা সুযোগ দিয়েছেন। তোমরা জীবন বাজি রেখে রাসূল (সা) এর দৌহিত্রের সাহায্যের জন্য ঝাঁপিয়ে পড় এবং অতীতের কলংক মুছে ফেল। আল্লাহর কসম, এখন যে ব্যক্তি হুসাইনের (রা) সাহায্য করা থেকে পিছু হটবে, আল্লাহ তার বংশধরকে অপমান ও লাঞ্ছনার আস্তাকুড়ে নিক্ষেপ করবেন এবং তার বংশের ওপর ধ্বংস নাযিল করবেন। দেখ, আমি যুদ্ধের জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত। এখনও যে ব্যক্তি জেহাদে অংশগ্রহণ করবেনা, সে যেন মনে রাখে, সে অপমানজনকভাবে নিহত হওয়া থেকে নিস্তার পাবেনা।"

ইয়াযীদ বিন মাসউদের ভাষণ শেষ হওয়ার সাথে সাথে বনু হানযালার লোকেরা উঠে দাঁড়ালো এবং বললো ঃ

"হে সম্মানিত সরদার, আমাদেরকে আপনি আপনার ধনুকের তীর ও আপনার গোত্রের ঘোড়া মনে করতে পারেন। আপনি যদি আমাদেরকে শত্রুর বিরুদ্ধে ব্যবহার করেন, তবে তা হবে অব্যর্থ। আমাদেরকে সাথে নিয়ে জেহাদ করলে আপনি ইনশাআল্লাহ জয়ী হবেন। আপনি যেখানে যাবেন, আমরা আপনার সাথে যাবো। আপনি যে যুদ্ধে অংশ নেবেন, আমরা আপনার কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে তাতে অংশ নেব। আমরা তরবারী দিয়ে আপনাকে সাহায্য করবো এবং জীবনের বিনিময়ে আপনাকে রক্ষা করবো। আমরা প্রস্তুত। আপনি যেখানে ইচ্ছা আমাদেরকে নিয়ে চলুন।"

বনু হানযালার পর বনু সা'দ দাঁড়িয়ে বললো ঃ "হে ইয়াযীদ বিন মাসউদ, আপনার মতের বিরুদ্ধে কোন মত দেয়া এবং আপনার বিরোধিতা করার মত ঘৃণ্য কাজ আমাদের কাছে আর কিছু নেই। তথাপি আমাদেরকে সামান্য একটু সময় দিন, আমরা একটু পরামর্শ করে নেই।"

বনু আমের তামীমী বললো ঃ

"হে প্রিয় সরদার, আমরা আপনার সাহায্যকারী ও সমর্থক। আমরা আপনার ক্রোধ ও অসন্তোষ সহ্য করতে পারিনা। আপনি আমাদেরকে হুকুম দিয়ে দেখুন, কিভাবে আপনার কাছে ছুটে আসি। আপনি আদেশ দিন, আমরা জীবন দিয়ে আপনার আনুগত্য করবো।"

এ সব উৎসাহ ব্যঞ্জক বক্তব্য শুনে ইয়াযীদ বিন মাসউদ অত্যন্ত প্রীত ও আনন্দিত হলেন। তিনি ইমাম হুসাইনকে (রা) চিঠি লিখলেন ঃ

www.pathagar.com

"আপনার চিঠি আমি পেয়েছি, যে কাজের প্রতি আপনি আমাকে আহ্বান জানিয়েছেন, সেটা আমি ভালোভাবেই হৃদয়ঙ্গম করেছি। আপনার আনুগত্য ও সাহায্য করা আমার জন্য দুর্লভ সৌভাগ্য। এতে আমি গর্ব বোধ করি। আল্লাহ তায়ালা পৃথিবীকে কখনো সৎ ও ন্যায়পরায়ণ শাসক থেকে বঞ্চিত করেননি। এ যুগে আপনি আল্লাহ্‌র বান্দাদের জন্য আল্লাহ্‌র অকাট্য প্রমাণ এবং পৃথিবীতে তাঁর আমানত স্বরূপ। আপনি যেন একটা মনোরম যয়তুন গাছের ডাল এবং রাসূল (সা) তার মূল। আপনি নির্দ্বিধায় এখানে চলে আসুন। বনু তামীমের মাথাগুলো আপনার সামনে আনত থাকবে। যে উট পাঁচ দিন সফরের পর পানির কাছে উপস্থিত হয়, সেই উটের চেয়েও আপনি অধিক অনুগত দেখতে পাবেন বনু তামীমকে। শুধু বনু তামীম নয়, বনু সা'দও আপনাকে প্রাণপন সাহায্য করবে।

বসরার এক ব্যক্তি মুনযির বিন জারুদ ছিল ইবনে যিয়াদের শ্বশুর। দুর্ভাগ্যক্রমে সে এই চিঠির তথ্য জেনে ফেললো। সে পত্রবাহক দূতকে পথিমধ্য থেকে ধরে এনে উবায়দুল্লাহ বিন যিয়াদের কাছে পৌছে দিল। ইবনে যিয়াদ দূতকে তো তৎক্ষনাত হত্যা করলোই। উপরন্তু নিজে জামে মসজিদের মিম্বরে উঠে নিম্নরূপ ভাষণ দিল ঃ

"হে বসরাবাসী, আমীরুল মুমিনীন (ইয়াযীদ) আমাকে কূফার গভর্ণর নিযুক্ত করেছেন। আমি অনতিবিলম্বে কূফায় যাচ্ছি। আমার অবর্তমানে আমার সহোদর উসমান বিন যিয়াদকে তোমাদের শাসক নিযুক্ত করে যাচ্ছি। খবরদার। তোমরা তার হুকুম অমান্য করবেনা। কেউ করলে তাকে, তার বন্ধুবান্ধবকে এবং তার মহল্লার সরদারকে পর্যন্ত হত্যা করে ফেলবো।"

উবায়দুল্লাহ বিন যিয়াদের এই ভাষণের উদ্দেশ্য ছিল বসরাবাসীকে আতংকিত করে দেয়া, যাতে তার অনুপস্থিতিতে কোন বিশৃংখলা না হয়। তার এ উদ্দেশ্য সফল হলো। ফলে তার কূফা চলে যাওয়ার পর কারো মনে তার ভাই এর বিরোধিতা করা বা ইমাম হুসাইনের (রা) পক্ষ সমর্থনের কোন আকাংখাই জাগতে দেখা গেলনা। ক্ষমতা ও অস্ত্রের দাপটের সামনে নিরীহ ও মৃত্যুর ভয়ে ভীত সৎ লোকদের উত্তাল ও বিস্ফোরনোম্মুখ আবেগ উচ্ছাস অল্প সময়ে বুদবুদের মত হাওয়ায় মিলিয়ে গেল।

www.pathagar.com

রক্তপিপাসু ইবনে যিয়াদ
ও
তার গুপ্তচর বাহিনী

কূফার শাসনকর্তা নুমান ইবনে বশীর (রা) একজন নিরীহ প্রকৃতির ও সদাশয় প্রশাসক ছিলেন। উমাইয়াদের চাকরীতে নিয়োজিত থেকেও তিনি নবীর বংশধরের যাতে কোন ক্ষতি না হয় এবং অন্তত তার শাসনামলে তাদের রক্ত না ঝরে, সে জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে যাচ্ছিলেন। এ জন্যই মুসলিম বিন আকীল কূফায় পৌঁছে যে সব তৎপরতা চালাচ্ছিলেন, তা ইয়াযীদের স্বার্থের বিরোধী হলেও এবং সব কিছু তার জানা থাকলেও তাতে হস্তক্ষেপের কোন চেষ্টা করেননি, এমনকি তার উপস্থিতিকে তিনি আদৌ আমলই দেননি। মুসলিম বিন আকীলের প্রতি তার এই সহিষ্ণুতা ও উদারতাকে উমাইয়া সমর্থকরা বিশেষত উগ্র সমর্থকরা তার উদাসীনতা ও দুর্বলতা হিসেবে গণ্য করলো। তারা ইয়াযীদকে ঘন ঘন চিঠি লিখে নুমানকে অযোগ্য ও দুর্বল প্রশাসক হিসেবে চিত্রিত করে তার পরিবর্তে একজন নতুন শাসক নিয়োগের আবেদন জানালো। আমরা আগেই বলেছি, ইয়াযীদ তার খৃস্টান উপদেষ্টা ইবনে সারজোনের সাথে পরামর্শ করলো। ইবনে সারজোন উবায়দুল্লাহ বিন যিয়াদকে কূফার গভর্ণর নিয়োগ করার পরামর্শ দিল। ইয়াযীদ উবায়দুল্লাহকে পছন্দ করতোনা। তাই সে এই পরামর্শ গ্রহণে একটু ইতস্তত ভাব দেখালো। ইবনে সারজোন তাকে বললো ঃ

"আপনাকে যদি আপনার মরহুম আব্বাজানের কোন অভিমত জানানো হয়, তবে কি আপনি তা গ্রহণ করবেন?"

ইয়াযীদ বললো ঃ অবশ্যই।

ইবনে সারজোন বললো ঃ আপনার জানা দরকার যে, আপনার বাবা নিজের মৃত্যুর আগে ইবনে যিয়াদকে কূফার শাসনকর্তা নিয়োগ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন এবং সে ইচ্ছার কথা ইবনে যিয়াদকেও জানিয়েছিলেন। কিন্তু এ সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের আগেই তিনি ইন্তেকাল করেন। কাজেই আপনার বাবার ইচ্ছার প্রতি সম্মান দেখিয়ে তাকে কুফার শাসক নিয়োগ করা উচিত।

এ কথা শুনার পর ইয়াযীদের জন্য ইবনে যিয়াদকে কূফার শাসকর্তা নিযোগ না করে আর কোন উপায় ছিলনা।

উবাইদুল্লাহ বিন যিয়াদ অত্যন্ত সাহসী, দৃঢ়চেতা, ও নিষ্ঠুর প্রকৃতির মানুষ ছিল। হযরত আমীর মুয়াবিয়ার (রা) আমলে তাকে সর্বপ্রথম খুরাসানের গভর্ণর নিয়োগ করা হয়। ইবনে আসাকিরের মতে, সে সময় তার বয়স ছিল মাত্র পঁচিশ বছর। সে তখন সেখানে অত্যধিক শৌর্যবীর্য ও দু:সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছিল। সেখানে দু'বছর ব্যাপী

www.pathagar.com

শাসনকালে সে তুর্কীদের সাথে অবিরাম যুদ্ধবিগ্রহ পরিচালনা করে। তারপর তাকে বসরায় বদলী করা হয়। পিতা যিয়াদের মৃত্যুর পর খারেজীরা বিশৃংখলার সৃষ্টি করলে উবায়দুল্লাহ বিন যিয়াদ তাদেরকে কঠোর হস্তে দমন করে। উবায়দুল্লাহ মেধা , বুদ্ধিমত্তা ও প্রজ্ঞায় পিতার সমকক্ষ না হলেও নিষ্ঠুরতা ও কঠোরতায় তার চেয়ে অগ্রগামী ছিল। ইয়াযীদ যখন তাকে বসরার সাথে কূফারও গভর্ণর নিয়োগ করলো, তখন সমগ্র ইরাকের শাসন ক্ষমতা তার মুঠোর মধ্যে এসে গেল এবং তার শক্তি ও প্রতাপ অকল্পনীয়ভাবে বেড়ে গেল।

উবায়দুল্লাহ ইবনে যিয়াদ সকাল বেলা কূফায় প্রবেশ করলো। তখন প্রচণ্ড গরম পড়তে আরম্ভ করেছিল। বসরার খ্যাতনামা ব্যক্তি শরীফ বিন আওয়ার ও মুনযির বিন জারূদ তার সাথে সাথে আসছিল। উবায়দুল্লাহ কালো পাগড়ি পরা ছিল। আর একটা কাপড় দিয়ে তার মুখ ঢাকা ছিল। কূফাবাসী শুনেছিল, হযরত হুসাইন (রা) আসছেন। ইবনে যিয়াদকে দেখে তারা ভাবলো, হযরত হুসাইন (রা) চলে এসেছেন। আর যায় কোথায়। সে যেদিক দিয়েই যাচ্ছিল, আকাশ বাতাস মুখরিত করে তাকে লক্ষ্য করে শ্লোগান দেয়া হচ্ছিল;

"মারহাবা, হে রসূলে খোদার নাতি।" মারহাবা হে রাসূলুল্লাহর দৌহিত্র।"

ইবনে যিয়াদ নির্বিকার। সে চুপচাপ ঘোড়ায় চড়ে গভর্ণর ভবনে যেয়ে হাজির হলো। বিপুল সংখ্যক মানুষ তার পেছনে পেছনে চলছিল। লোকজনের শোরগোল ও শ্লোগান শুনে নুমান বিন বশীরেরও দৃঢ় প্রত্যয় জন্মে গেল যে, ইমাম হুসাইন (রা) চলে এসেছেন। তিনি গভর্ণর ভবনের গেট বন্ধ করার আদেশ দিলেন এবং নিজে ছাদের ওপর চলে গেলেন। সামনে উবায়দুল্লাহ বিন যিয়াদ দণ্ডায়মান। অথচ তার পেছনে শত শত মানুষ তাকে হুসাইন (রা) ভেবে হর্ষধ্বনি করছে। নুমানও তাকে হুসাইন (রা) মনে করে বললো ঃ

"আল্লাহর কসম, আমি আমার এই গুরু দায়িত্বের আমানত আপনার হাতে সোপর্দ করবোনা। আপনার সাথে আমার যুদ্ধ করার ইচ্ছা নেই। আল্লাহর দোহাই, আপনি চলে যান। গভর্ণর ভবনে ঢুকবার চেষ্টা করবেন না।"

উবায়দুল্লাহ বিন যিয়াদ তাকে ধমক দিল এবং দরজা খোলার নির্দেশ দিল। জনতার মধ্য থেকে এক ব্যক্তি উবায়দুল্লাহর কণ্ঠস্বর চিনতে পেরে পিছু হটে গেল। সে বললো ঃ "হে জনতা, ইনি তো হুসাইন নন। এতো ইবনে যিয়াদ।"

এতক্ষনে নুমান বিন বশীরও ইবনে যিয়াদের কণ্ঠস্বর চিনে ফেললো এবং দরজা খুলে দিল। ইবনে যিয়াদ ভবনের ভেতরে ঢুকে পড়লো এবং জনতা বিক্ষিপ্ত হয়ে চলে গেল।

ইবনে যিয়াদ যা দেখলো, তা তাকে বিচলিত করে তুললো। সে যত শীগগীর সম্ভব, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার সিদ্ধান্ত নিল। পরদিন অতি প্রত্যুষে সমগ্র শহরে ঘোষকরা ঘোষণা করতে লাগলো ঃ

www.pathagar.com

"সকলে মসজিদে সমবেত হও!" সে যুগে প্রত্যেক নয়া শাসক আপন পদে অধিষ্ঠিত হওয়ার পূর্বমুহূর্তে জনগণকে মসজিদে সমবেত করে প্রথমে নিজের নিয়োগপত্র পড়ে শোনাতো, তারপর নিজের নীতি ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে একটা ভাষণ দিত।'

রীতি অনুযায়ী পর দিন লোকেরা মসজিদে সমবেত হলো। ইবনে যিয়াদ মিম্বরে আরোহন করে ভাষণ দিল।

"আমীরুল মুমিনীন আমাকে কুফার গভর্ণর নিয়োগ করেছেন। তিনি আমাকে নির্যাতিতদের প্রতি সুবিচার, অনুগতদের প্রতি অনুগ্রহ ও সদাচার, এবং অবাধ্য ও বিশ্বাসঘাতকদের প্রতি কঠোর আচরণ করার নির্দেশ দিয়েছেন। আমি এ নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে বাস্তবায়িত করবো। বন্ধুদের সাথে আমার আচরণ হবে স্নেহ বৎসল বাবার মত। কিন্তু যে ব্যক্তি আমার হুকুম অমান্য করবে, আমি তাকে আমার তরবারী কত ধারালো এবং আমার বেত্রাঘাত কেমন যন্ত্রণাদায়ক, তা দেখিয়ে দেব। সুতরাং সবার নিজ নিজ প্রাণের প্রতি সদয় হওয়া উচিত।"

এই ভাষণ দেয়ার পর উবায়দুল্লাহ বিন যিয়াদ মিম্বর থেকে নেমে এলো। নুমান বিন বশীর কাল বিলম্ব না করে নিজ আবাসভূমি সিরিয়া চলে গেলেন। ইবনে যিয়াদ শহরের সকল গণ্যমান্য ব্যক্তিকে সমবেত করলো এবং তাদেরকে আদেশ দিল ঃ

"তোমরা নিজ নিজ পাড়া ও মহল্লার বিদেশী মুসাফির ও সন্দেহভাজন লোকদেরকে আমার কাছে ধরে আনবে। এ আদেশ যে মানবে, তাকে কিছু বলা হবেনা। কিন্তু যে ব্যক্তি এ আদেশ পালনে ব্যর্থ হবে এবং মহল্লার কেউ যদি আমীরুল মুমিনীনের বিরুদ্ধে কিছু করে, তবে ঐ মহল্লার প্রধানকে তার বাড়ীর দরজার ওপরই প্রকাশ্যে ফাঁসি দেয়া হবে। আর সেই মহল্লার লোকদের ভাতা বন্ধ করে দেয়া হবে।"

মুসলিম বিন আকীল যখন উবাইদুল্লাহর কূফায় আগমণ ও তার এই সব বিধিব্যবস্থার বিষয় জানলেন, তখন তিনি মুখতার বিন আবি উবাইদের বাড়ী থেকে বেরিয়ে কুফার একজন শীর্ষস্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তি হানী বিন উরওয়া মুরাদীর কাছে এলেন এবং তার কাছে আশ্রয় চাইলেন। হানী জবাব দিলেন ঃ "আপনি আমার ওপর আমার ক্ষমতার অতিরিক্ত দায়িত্ব চাপিয়েছেন। আপনি যদি আমার বাড়ীতে প্রবেশ না করতেন, তাহলে আমি অক্ষমতা প্রকাশ করতাম। কিন্তু ঢুকেই যখন পড়েছেন, তখন আসুন।"

এরপর হযরত ইমাম হুসাইন (রা), হযরত আলী (রা) ও নবীর পরিবারের ভক্তবৃন্দ গোপনে গোপনে হানীর বাড়ীতে সমবেত হতে লাগলো এবং পূর্ণ সতর্কতা বজায় রাখতে লাগলো, যাতে ইবনে যিয়াদ কিছুতেই জানতে না পারে মুসলিম বিন আকীল কোথায় অবস্থান করছেন। ওদিকে মুসলিম যে কূফাতেই অবস্থান করছেন, সে কথা ইবনে যিয়াদ জানতো। তাই সে মুসলিমের অবস্থান স্থলের সন্ধান নেয়ার জন্য মাকাল তামীমী নামক এক ব্যক্তিকে গোয়েন্দা নিয়োগ করলো। ইবনে জিয়াদ মাকালকে তিন হাজার দিরহাম দিল। তারপর নির্দেশ দিল যে, মুসলিমের সন্ধান পেলে তার কাছে চলে যাবে এবং

www.pathagar.com

তাকে এই তিন হাজার দিরহাম উপঢৌকন হিসাবে দিয়ে তার কাছে বায়য়াত করার ইচ্ছা প্রকাশ করবে।

মাকাল ইবনে যিয়াদের নির্দেশে মুসলিমকে খুঁজতে লাগলো। অবশেষে সে মুসলিম বিন আওসাজা আসাদী নামক এক বৃদ্ধের সন্ধান পেল। মুসলিমের হাতে এই বৃদ্ধ ইমাম হুসাইনের (রা) প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে বায়য়াত করেছিলেন। মুসলিম বিন আওসাজা জামে মসজিদে নামায পড়ছিলেন। মাকালও সেখানে চলে গেল এবং কখন তার নামায শেষ হয়, সেজন্য অপেক্ষা করতে লাগলো। নামায শেষ হলেই তার সাথে কথাবার্তা বলবে– এই ছিল মাকালের উদ্দেশ্য। মুসলিম ইবনে আওসাজার নামায শেষ হলে মাকাল এগিয়ে গেল এবং বললো ঃ

"জনাব, আমি সিরিয়ার অধিবাসী এবং নবীর পরিবারের অতিশয় ভক্ত। শুনেছি, নবীর পরিবারের এক ব্যক্তি এখানে এসেছে এবং হযরত হুসাইনের (রা) পক্ষে বায়য়াত গ্রহণ করছে। আমার আন্তরিক ইচ্ছা, তাঁর সাথে সাক্ষাত করি। আমার কাছে তিন হাজার দিরহাম রয়েছে, যা আমি তাঁকে দিতে চাই। কিন্তু আমি এমন লোক পাইনি, যে আমাকে তার কাছে পৌঁছে দিতে পারে বা তার ঠিকানা জানাতে পারে। একটু আগে এখানে কয়েকজন লোক মারফত জানতে পারলাম, আপনিও নবী (সা) এর পরিবারের একজন ভক্ত। এ জন্য আপনার কাছে উপস্থিত হয়েছি। আমার অনুরোধ, আপনি আমার কাছ থেকে এই দিরহামগুলো নিয়ে নিন এবং আমাকে সেই ব্যক্তির কাছে পৌছায়ে দিন, যাতে আমি তার কাছে বায়য়াত হতে পারি।"

মুসলিম বিন আওসাজা এ কথা শুনে বললেন ঃ "তোমার সাথে সাক্ষাত হওয়ায় আমি খুশীও হয়েছি, দুশ্চিন্তায়ও পড়েছি। খুশী হয়েছি এ জন্য যে, আল্লাহ তায়ালা তোমাকে রাসূল (সা) এর পরিবারকে ভালোবাসার মত নিয়ামত দান করেছেন। আর দুশ্চিন্তায় পড়েছি এ জন্য যে, এখনো আমাদের আন্দোলন তেমন মজবুত হতে পারলোনা। অথচ এরই মধ্যে তুমি এর কথা জেনে ফেললে। এই গোপন তথ্য যদি আরো ছড়িয়ে পড়ে এবং ইবনে যিয়াদের কানে পৌছে যায়, তাহলে সে যুলুম নির্যাতনের চূড়ান্ত করে ছাড়বে।"

মা'কাল বললো ঃ "আপনি যদি আপাতত আমাকে মুসলিম বিন আকীলের কাছে নিয়ে যেতে না পারেন, তাহলে আপনি নিজেই আমার বায়য়াত গ্রহণ করুন।" ইবনে আওসাজা অগত্যা নিজেই তার বায়য়াত গ্রহণ করলেন। তারপর তার ভক্তি ও নিষ্ঠা দেখে মুসলিম বিন আকীলের কাছেও তার উল্লেখ করলেন। তিনি মুসলিম বিন আকীলকে এ কথাও বললেন যে, আপনি অনুমতি দিলে তাকে আপনার কাছে নিয়ে আসতে পারি। মুসলিম বিন আকীল অনুমতি দিয়ে দিলেন। সরলতার দরুণ দু'জনের কেউই মাকালের অভিনয়ের বিন্দু বিসর্গও বুঝতে পারলেন না।

মাকাল মুসলিম বিন আকীলের কাছে উপস্থিত হলো। সে তার কাছে বায়য়াত হলো এবং ইবনে যিয়াদের দেয়া তিন হাজার দিরহাম উপঢৌকন বা নজরানা হিসাবে তার হাতে সমর্পণ করলো। মুসলিম বিন আকীল অতপর এই অর্থ আবু ছামামা সায়েদীকে অস্ত্র

www.pathagar.com

কেনার জন্য দিলেন।

মা'কালের তখন পোয়া বারো। সে এখন ঘন ঘন মুসলিম বিন আকীলের কাছে আসা যাওয়া করতে লাগলো। তার সাক্ষাত প্রার্থীদের মধ্যে সে-ই সবার আগে আসতো এবং সবার শেষে যেত। এতে করে একদিকে সে মুসলিম বিন আকীল ও মুসলিম বিন আওসাজার নিকট ক্রমেই ঘনিষ্ঠ থেকে ঘনিষ্ঠতর এবং প্রিয় থেকে প্রিয়তর হতে লাগলো, আর অপর দিকে যে সমস্ত তথ্য ইবনে যিয়াদের জানার দরকার ছিল, তা সে একে একে সংগ্রহ করে যেয়ে যেয়ে তাকে জানাতে লাগলো।

হানী ইবনে উরওয়া ইবনে যিয়াদের দিক থেকে ঝুকির সম্মুখীন ছিলেন। হানী যেহেতু কুফার গন্যমান্য ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত গণ্য হতেন, তাই ইবনে যিয়াদের কাছে প্রতিদিন হাজিরা দেয়া তার অবশ্য কর্তব্য ছিল। কিন্তু এই ভীতির কারণেই তিনি উবায়দুল্লাহ বিন যিয়াদের কাছে যাওয়ার সাহস করেননি এবং সচেতনভাবেই তিনি রুগ্ন হওয়ার ভান করলেন। ইবনে আসীর বর্ণনা করেছেন যে, ইবনে যিয়াদ যখন হানীর অসুখের কথা শুনলো, তখন সে নিজেই তার অবস্থা জানার জন্য তার বাড়ীতে গেল। এই সময় আম্মারা বিন সালুলী নামক একজন হুসাইনভক্ত মুসলিম বিন আকীলকে পরামর্শ দিল যে, এই খোদাদ্রোহী নরপশুটা যখন তোমাদের নাগালের মধ্যে এসেছে, তখন এমন সুবর্ণ সুযোগ হাতছাড়া করোনা, ওকে হত্যা করে ফেল। কিন্তু হানী রাজী হলেন না। তিনি বললেন ঃ

"আমার বাড়ীতে ওকে হত্যা করা আমার মনোপুত নয়।" কিছু দিন পর কুফার আরেক গণ্যমান্য ব্যক্তি শরীক বিন আওয়ার সত্যি সত্যি রোগাক্রান্ত হয়ে শয্যাশায়ী হয়ে গেলেন এবং ইবনে যিয়াদের ওখানে হাজিরা দেয়া বন্ধ করে দিলেন। তিনি হানীর বাড়ীতেই থাকতেন। ইবনে যিয়াদ ও কুফার অন্যান্য কর্মকর্তারা তাকে অত্যধিক ভক্তিশ্রদ্ধা করতো। শরীক ও রোগাক্রান্ত জানতে পেরে ইবনে যিয়াদ খরব পাঠালো যে, সে রাতের বেলা তাকে দেখতে আসবে। শরীক বিন আওয়ার মুসলিম বিন আকীলকে ডেকে বললেন ঃ

"এই পাপিষ্ঠ নরাধমটা রাতের বেলা আমাকে দেখতে আসবে। সে এসে বসামাত্রই আকস্মিকভাবে তার ওপর আক্রমণ চালিয়ে তাকে খুন করে ফেল। তারপর গভর্ণর ভবনটা দখল করে নাও।"

কথামত ইবনে যিয়াদ রাতের বেলা এল এবং শরীকের সাথে অনেকক্ষন ধরে আলাপ আলোচনা করলো। এই সময়ে রাসূল (সা) এর একটা হাদীস মুসলিম বিন আকীলের মনে পড়ে গেল। ঐ হাদীসে রাসূল (সা) বলেছেন ঃ "কোন মুসলমান অন্য কোন মুসলমানের ওপর গোপনে আক্রমণ চালাবেন না।" এ হাদীসটা মনে পড়ে যাওয়ায় তিনি নিজ কক্ষে চুপচাপ বসে রইলেন। অথচ ইচ্ছে করলে তিনি ইবনে যিয়াদকে খতম করে ফেলতে পারতেন। ইবনে যিয়াদ চলে যাওয়ার পর শরীক বিন আওয়ার মুসলিমকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি নিস্ক্রীয় বসে থাকলে কেন? মুসলিম জবাবে রাসূলের (সা) হাদীস শুনিয়ে দিলেন।

www.pathagar.com

শরীফ বললেন ঃ "তুমি যদি ওকে হত্যা করে ফেলতে, তবে একজন পাপিষ্ঠ, ধোকাবাজ কাফেরকে হত্যা করতে - মুসলমানকে নয়।"

এর তিনদিন পর শরীক ইন্তিকাল করলেন।

হানী বিন উরওয়া এর পরও রোগীর অভিনয় করে যেতে থাকলেন এবং ইবনে যিয়াদের মজলিশ থেকে অনুপস্থিত থাকতে লাগলেন। কিছুদিন পর ইবনে যিয়াদ আবার জিজ্ঞেস করলো, হানী তার কাছে কেন আসেনা? লোকেরা জবাব দিল যে, তিনি অসুস্থ। ইতিমধ্যে গোয়েন্দাদের মাধ্যমে ইবনে যিয়াদ হানীর বাড়ীর সমস্ত খবরাখবর জেনে ফেলেছে। সে মুহাম্মাদ ইবনে আশয়াছ, আসমা বিন খারিজা ও আমর ইবনুল হাজ্জাজকে ডাকলো এবং জিজ্ঞেস করলো ঃ

"হানী বিন আমর আমার কাছে কেন আসে না?" তারা বললো ঃ "শুনেছি, উনি কিছুদিন যাবত অসুস্থ।" ইবনে যিয়াদ বললো ঃ "আমি বিশ্বস্ত সূত্রে জানতে পেরেছি, সে সম্পূর্ণ সুস্থ এবং প্রতিদিন নিজের বাড়ীর দরজার ওপর বসে থাকে। তোমরা তিনজনে তার কাছে যাও এবং ওকে আমার কাছে নিয়ে এস।"

তিনজনই হানীর কাছে গেল। তারা গিয়ে দেখলো, সত্যিই হানী দরজার সামনে বসে আছে। তারা তাকে ইবনে যিয়াদের হুকুম শুনালো এবং সাথে করে ইবনে যিয়াদের কাছে নিয়ে গেল। ইবনে যিয়াদ হানীর দিকে তাকিয়ে পরম পুলকে কবিতা আবৃত্তি করলো ঃ

"আমি যাকে বাঁচাতে চাই, সে আমাকে চায় হত্যা করতে। মুরাদ গোত্র থেকে নিজের একজন বন্ধু সুপারিশের জন্য নিয়ে এস।"

হানী বিন উরওয়া বললো ঃ গভর্ণর সাহেব, আপনি এসব কী বলছেন?

ইবনে যিয়াদ বললো ঃ "বেশ ভালোই অভিনয় করতে পার। তবে আমার সাথে এ সব অভিনয় চলবেনা। বল, তুমি নিজের বাড়ীতে আমীরুল মুমিনীন ইয়াযীদের বিরুদ্ধে কী কী ষড়যন্ত্র চালিয়ে যাচ্ছ? তুমি মুসলিম বিন আকীলকে নিজের বাড়ীতে লুকিয়ে রেখেছ। তুমি তার জন্য অস্ত্র সংগ্রহ করছ। তার সমর্থকরা তোমার বাড়ীতে সমবেত হয় এবং আমীরুল মুমিনীনের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে। তুমি কি ভেবেছিলে তোমার এ সব তৎপরতা আমার অগোচরেই থেকে যাবে?"

হানী বললেন ঃ "আমি আমীরুল মুমিনীনের বিরুদ্ধে কোন ষড়যন্ত্রও পাকাচ্ছিনা, আর মুসলিম বিন আকীলও আমার বাড়ীতে নেই।" ইবনে যিয়াদ বললো ঃ "তুমি মিথ্যা বলছ। তোমার গোপন তৎপরতার হাড়ি আমি এক্ষুনি ভেঙ্গে দিচ্ছি।" তারপর সে তার গোয়েন্দা মাকালকে ডাকলো। মাকাল এসে সবিনয়ে তার সামনে দাঁড়ালো। ইবনে যিয়াদ হানীকে জিজ্ঞেস করলো ঃ

www.pathagar.com

"তুমি এই লোককে চিন?"

হানী বললেন ঃ হ্যাঁ।

হানী এবার বুঝতে পারলেন যে, মাকালকে আসলে গোয়েন্দা হিসাবে নিয়োগ করা হয়েছিল এবং সে-ই এই সব তথ্য ইবনে যিয়াদকে সরবরাহ করেছে। এখন সব কিছু অকপটে স্বীকার করা ছাড়া তার আর গত্যন্তর ছিল না। তিনি বললেন ঃ "মাননীয় গভর্ণর সাহেব, দয়া করে আমার বক্তব্য শুনুন ও তা বিশ্বাস করুন। আমি উপযাচক হয়ে মুসলিমকে আশ্রয় দেইনি। উনি নিজেই আমার বাড়ীতে এসেছিলেন এবং আশ্রয় চেয়েছিলেন। আমি এক রকম বাধ্য হয়েই তাকে আশ্রয় দিয়েছিলাম।"

ইবনে যিয়াদ বললো ঃ "এ কথা যদি সত্য হয়, তাহলে মুসলিমকে আমার কাছে নিয়ে এস।"

হানী বললেন ঃ "সেটা অসম্ভব। আমি আমার অতিথিকে হত্যার জন্য আপনার হাতে তুলে দিতে পারিনা। মরে গেলেও না।"

এ কথা শুনে পাষন্ড ইবনে যিয়াদ ক্রোধে অগ্নিশর্মা হয়ে গেল। সে লাঠি দিয়ে হানীকে নিষ্ঠুরভাবে পেটাতে শুরু করলো। পিটুনিতে হানির নাক ভেঙ্গে তার সমস্ত মুখমন্ডল রক্তাক্ত হয়ে গেল। হানী ইবনে যিয়াদকে হত্যা করার জন্য তার পাশে দাঁড়ানো সিপাই এর তরবারী ছিনিয়ে নিতে চেষ্টা করলেন। কিন্তু পারলেন না। এটা দেখে ইবনে যিয়াদ বললো ঃ

"এখন তো আল্লাহ্ আমার জন্য তোর রক্ত হালাল করে দিয়েছেন।" তারপর ভবনের একটা কক্ষে তাকে আটক করার আদেশ দিল।

এই অত্যাচার দেখে আসমা বিন খারেজা সহ্য করতে পারলো না। সে বললো ঃ আপনি হানীকে আপনার কাছে নিয়ে আসার হুকুম দিয়েছিলেন। যখন নিয়ে এসেছি, এখন আপনি তার ওপর এমন অমানুষিক নির্যাতন করলেন যে, তার নাক ভেঙ্গে আহত ও রক্তাক্ত করে দিলেন। আপনার এ রকম ইচ্ছা, তা আগে জানলে কখনো তাকে আপনার কাছে হাজির করতামনা।"

এ কথা শুনে ইবনে যিয়াদ আসমাকেও মারপিট করলো। উভয়ের এই দশা দেখে মুহাম্মদ বিন আশয়াছ ভয় পেয়ে গেল। সে আত্মরক্ষার্থে বললো ঃ "গভর্ণর সাহেব যা করেছেন, ঠিকই করেছেন। আমাদের গভর্ণরের আদেশ মেনে চলা উচিত।"

আমর ইবনুল হাজ্জাজ হানীকে ইবনে যিয়াদের কাছে পৌঁছিয়ে দিয়ে নিজে চলে গিয়েছিল। সে গুজব শুনেছিল, হানীকে ইবনে যিয়াদ হত্যা করে ফেলেছে। তাই সে মাজহাজ গোত্রকে জড় করে তাদেরকে সাথে নিয়ে গভর্ণর ভবন ঘেরাও করে ফেললো।

www.pathagar.com

ঘেরাও করার পর চিৎকার করে বললো ঃ

"আমি আমর ইবনুল হাজ্জাজ, মাজহাজ গোত্রের সকল যোদ্ধা আমার সাথে রয়েছে। আমরা গভর্নরের আনুগত্য পরিত্যাগ করিনি। কিন্তু খবর পেয়েছি, আমাদের নেতা হানীকে হত্যা করা হয়েছে। আমরা এর প্রতিশোধ না নিয়ে ছাড়বোনা।"

এ পরিস্থিতি দেখে উবায়দুল্লাহ বিন যিয়াদ প্রমাদ গুনলো। সে বিচারপতি শুরাইহকে নির্দেশ দিল ঃ "হানীর কাছে গিয়ে দেখে আসুন সে জীবিত না মৃত। জীবিত থাকলে ঘেরাওকারী জনতাকে জানিয়ে দিন, হানী জীবিত।" বিচারপতি শুরাইহ তৎক্ষণাৎ হানীকে দেখে এসে জনতাকে জানালেন, "আমি স্বচক্ষে দেখে এসেছি, হানী জীবিত। তাকে হত্যা করার খবর মিথ্যা। গভর্নর ইবনে যিয়াদ তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্য আটক করেছে।"

এ কথা শুনে আমর ইবনুল হাজ্জাজ ও তার সাথীরা অবরোধ তুলে নিয়ে চলে গেল।

www.pathagar.com

শহীদের কাতারে মুসলিম বিন আকীল

নিজের আশ্রয়দাতা হানী গ্রেফতার হয়ে যাওয়ার পর মুসলিম বিন আকীল বুঝতে পারলেন, আত্মগোপন করে বসে থাকার সময় শেষ হয়ে গেছে। এখন আত্মরক্ষা ও ইবনে যিয়াদের শক্তি চূর্ণ করা ছাড়া আর কোন উপায় নেই। তিনি নিজের সমর্থকদেরকে সমবেত করা শুরু করলেন। কয়েক দিনের মধ্যেই চার হাজার লোক সমবেত হয়ে গেল। মুসলিম যথারীতি একটা সেনাবাহিনী গঠন করে বাহিনীর প্রতিটা অংশের একজন অধিনায়ক নিয়োগ করলেন। আব্দুল্লাহ বিন কিরিয কান্দীকে কান্দা ও রবীয়া গোত্রের অধিনায়ক, মুসলিম বিন আওসাজা আসাদীকে মাজহাজ ও আসাদ গোত্রের অধিনায়ক, আবু তামামা সায়েদীকে তামীম ও হামাদানবাসীর অধিনায়ক এবং আব্বাস বিন জু'দা বিন লুবায়বাকে কুরাইশ ও আনসার গোত্রের অধিনায়ক নিযুক্ত করার পর গোটা বাহিনীকে নিয়ে গভর্নর ভবন ঘেরাও করে ফেললেন। এ সময়ে ভবনে মাত্র ত্রিশজন রক্ষী ও বিশজন গণ্যমান্য নাগরিক উপস্থিত ছিলেন।

ইবনে যিয়াদ কাসীর বিন শিহাবকে ডেকে এনে মাজহাজ গোত্রের কাছে যাওয়ার আদেশ দিল। তাকে বলে দিল, "তাদেরকে যুদ্ধের ভয়াবহতা বুঝিয়ে ও ইয়াযীদের শাস্তির ভয় দেখিয়ে মুসলিম বিন আকীলের আনুগত্য ত্যাগ করতে বাধ্য কর।" মুহাম্মাদ বিন আশয়াছকেও সে ডেকে আদেশ দিল যে, কান্দা ও হাযরা মাউতের গোত্রগুলোর কাছে গিয়ে তাদেরকে ভয় দেখিয়ে মুসিলম বিন আকীলের বাহিনী থেকে বিচ্ছিন্ন কর। এছাড়া বাদবাকী লোকদেরকে সে বন্দী করলো।

কাছীর বিন শিহাব ও মুহাম্মাদ বিন আশয়াছ ইবনে যিয়াদের আদেশ বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে তৎক্ষণাত গভর্নর ভবন ত্যাগ করলো। প্রত্যেক গোত্রকে বুঝিয়ে সুজিয়ে তাদের লোকদেরকে মুসলিম বিন আকীলের বাহিনী ত্যাগ করতে উদ্বুদ্ধ করার পরামর্শ দিল। এভাবে বহু লোক মুসলিমের বাহিনী ত্যাগ করে ঐ দু'জনের চারপাশে সমবেত হলো। আর তারা দু'জন ওদেরকে নিয়ে গভর্ণর ভবনে পৌঁছে গেল। কিন্তু এর পরও মুসলিম বিন আকীলের কাছে যে বাহিনী ছিল, তা দ্বারা তিনি নিশ্চিতভাবে ইবনে যিয়াদকে পরাজিত করতে পারতেন। সন্ধ্যা হয়ে গেল। তখনো মুসলিমের বাহিনীকে প্রতিহত করতে পারেনি ইবনে যিয়াদ। অবস্থা বেগতিক দেখে গভর্নর ভবনে বন্দী করে রাখা অবশিষ্ট লোকদেরকে সে বিপুল অর্থের প্রলোভন দেখিয়ে হুকুম দিল যে, তোমরা মুসলিমের বাহিনীতে যোগদান কর এবং ঐ বাহিনীর লোকদেরকে "ইয়াযীদের বিশাল বাহিনী কুফার দিকে এগিয়ে আসছে" বলে ভয় দেখিয়ে মুসলিমের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী করে তোল।

যথার্থই তারা মুসলিমের বাহিনীতে চলে গেল এবং সৈন্যদেরকে মুসলিমের আনুগত্য

www.pathagar.com

থেকে সরিয়ে নিতে শুরু করলো। তারা তাদেরকে বললো ঃ নিজেদের জীবনের মায়া থাকলে মুসলিমের বাহিনী থেকে কেটে পড়। আমীরুল মুমিনীন ইয়াযীদের এক বিশাল বাহিনী কুফার দিকে আসছে। সে বাহিনীর সাথে লড়বার ক্ষমতা তোমাদের নেই। এক্ষুনি লড়াই থেকে বিরত হও। নচেত অঘোরে মারা পড়বে। ইবনে যিয়াদ বলেছে, তোমরা যদি মুসলিমের সংগ ত্যাগ না কর এবং নিজ নিজ বাড়ীতে চলে না যাও, তাহলে তোমাদের সন্তানদের ভাতা বন্ধ করে দেয়া হবে এবং এমন শাস্তি দেবে যে, তোমরা ধ্বংস হয়ে যাবে। ইয়াযীদের বাহিনী আসার আগেই যারা রণে ভংগ দিয়ে ইবনে যিয়াদের সাথে দেখা করবে, তারা বিপুল পারিতোষিক পাবে।"

এই হুমকি ও প্রলোভন কুফার লোকদের ওপর ধীরে ধীরে কার্যকরী হতে লাগলো। তারা ভাবলো, মুসলিমের এত অর্থ কোথায়, যা দ্বারা ইবনে যিয়াদের ভাতা বন্ধ হলে বিকল্প জীবিকার সংস্থান হবে? আর তার এত ক্ষমতাই বা কোথায়, যা দ্বারা তিনি ইয়াযীদের বাহিনীর প্রত্যক্ষ আঘাত থেকে তাদেরকে রক্ষা করবেন! এই চিন্তার ফলশ্রুতিতে তারা ক্রমান্বয়ে মুসলিমের আনুগত্য ত্যাগ করে সুড় সুড় করে পালাতে লাগলো। শেষ পর্যন্ত মাত্র ত্রিশজন লোক তার সাথে থেকে গেল, এবং তদেরকে নিয়েই তিনি মাগরিবের নামায পড়লেন। অন্ধকার আরো খানিকটা গাঢ় হলে এই ত্রিশজনও তাঁকে ছেড়ে চলে গেল। তাকে সাহস যোগানো, সান্ত্বনা দেয়া এমনকি পালানোর পথ দেখানোর মতও কেউ তার সাথে রইল না। হতাশ হয়ে তিনি একাকী কুফার অলি গলিতে ঘুরতে লাগলেন। তিনি বুঝে উঠতে পারছিলেন না যে, কোথায় যাবেন এবং কার কাছে আশ্রয় নেবেন। ঘুরতে ঘুরতে তিনি কান্দা গোত্রের এক মহিলা 'তাওয়া'র বাড়ীতে পৌছলেন। এই মহিলা ছিল আশয়াশ বিন কায়েসের সাবেক দাসী। আশয়াস তাকে মুক্ত করে দেয়ায় উসাইদ হাযরানীর সাথে তার বিয়ে হয়। এই স্বামীর ঔরসে তার বিলাল নামে একটা ছেলে জন্মে। বিলাল তখন বাইরে গিয়েছিল। তার মা তার জন্য অপেক্ষা করছিল। মুসলিম তাওয়াকে সালাম করলেন এবং পানি চাইলেন। তাওয়া পানি পান করালো। পানি পান করার পর মুসলিম ওখানে বসেই রইলেন। মহিলা বললো ঃ "এখন তোমার বাড়ীতে চলে যাও।" মুসলিম নিরুত্তর রইলেন। মহিলা আবার বললো ঃ "কী হলো? যাচ্ছনা কেন? আমার বাড়ীর দরজায় তোমার এভাবে দাঁড়িয়ে থাকা ঠিক নয়।"

মুসলিম বললেন ঃ "হে সম্মানিতা মহিলা, এই শহরে আমার ঘরবাড়ীও নেই, পরিবার পরিজন বা আত্মীয় স্বজনও নেই। আমি আপনার কাছে একটা বিনীত আবেদন জানাতে চাই। আশা করি, আপনি আবেদনটা রাখবেন এবং হয়তো পরে আমি আপনাকে এর বদলা দিতে পারবো।"

তাওয়া বললো ঃ তোমার আবেদনটা কি?

মুসলিম বলেন ঃ আমি ইমাম হুসাইনের ভ্রাতা মুসলিম বিন আকীল। কুফাবাসী আমাকে আশ্রয় দিয়ে এখন আমাকে ত্যাগ করেছে। এখন আমি বন্ধুহীন, সংগীহীন, আত্মীয়হীন ও

www.pathagar.com

সহায় সম্বলহীন। আপনি দয়া করে আমাকে আপনার বাড়ীতে আশ্রয় দিন। বিলম্ব করলে আমার জীবনের আশংকা রয়েছে।"

তাওয়া তাকে তৎক্ষণাত নিজের গৃহের একটা কক্ষে লুকিয়ে ফেললো। তাকে বিছানা বিছিয়ে দিল এবং খাবার দিল। কিন্তু তিনি খাবার খেলেন না। ইতিমধ্যে মহিলার ছেলে বিলাল এসে গেল। সে দেখলো তার মা একটা কক্ষে ঘন ঘন যাচ্ছে। তার সন্দেহ ও বিস্ময় লাগলো। সে তার মাকে ঐ কক্ষে বারবার যাওয়ার কারণ জিজ্ঞেস করলো। প্রথমে তাওয়া বলতে চায়নি। কিন্তু বিলালের পীড়াপীড়িতে বাধ্য হয়ে কারো কাছে প্রকাশ করবে না - এই মর্মে বিলালের কাছ থেকে শপথ আদায় করে তাকে মুসলিমের সমস্ত ঘটনা খুলে বললো।

ওদিকে মুসলিম বিন আকীলের সমর্থক ও সহযোদ্ধাদের আর কোন শব্দ শুনতে না পেয়ে ইবনে যিয়াদ তার লোকদেরকে নির্দেশ দিল বিদ্রোহীদের অবস্থার খোঁজ খবর নিতে। তারা খোঁজ নিয়ে ফিরে এসে জানালো, মুসলিম বা তার সমর্থকদের কারো পাত্তা নেই। একথা শুনে ইবনে যিয়াদ তার সংগী সাথীদের নিয়ে কেন্দ্রীয় মসজিদে এল। এই মসজিদটা ছিল গভর্ণর ভবনের সাথে সংলগ্ন। বড় বড় আলোর মশাল জ্বালানো হলো এবং সমগ্র কুফা শহরে ঢেড়া পিটিয়ে ঘোষণা করা হলো, সকল প্রাপ্ত বয়স্ক পুরুষকে এশার নামায কেন্দ্রীয় মসজিদে পড়তে হবে। যে ব্যক্তি মসজিদে হাজির হবে না তার রক্ষা নেই।

ঘোষণা করার সাথে সাথে লোকেরা দলে দলে মসজিদে আসতে শুরু করলো এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই সমগ্র মসজিদ পূর্ণ হয়ে গেল। এশার নামাযের পর ইবনে যিয়াদ তার বেতনভূক প্রহরীদেরকে জায়গায় জায়গায় দাঁড় করিয়ে রাখলো যাতে কেউ তার ওপর আক্রমণ করতে না পারে। নিজেই নামায পড়ালো। তারপর মিম্বরে আরোহন করে ভাষণ দিল ঃ

"শোনো কুফাবাসী, নির্বোধ মুর্খ মুসলিম বিন আকীল কুফায় এসে বিভেদ ও বিশৃংখলার জাল বুনেছিল। তার পরিণাম তো তোমরা দেখেছ। মনে রেখ, যার বাড়ীতে মুসলিমকে পাওয়া যাবে, তাকে প্রাণদন্ড দেয়া হবে। আল্লাহর ভয় কর। আমার আনুগত্যের যে শপথ তোমরা করেছ, তা ভংগ করোনা এবং বিভেদ বিশৃংখলার পথে যেয়োনা। তা হলে ধ্বংস হয়ে যাবে।"

এরপর সে হুসাইন বিন নুমাইরকে নির্দেশ দিল ঃ "প্রত্যেকটা বাড়ীতে তল্লাশী চালাও এবং মুসলিমকে গ্রেফতার করে আমার কাছে নিয়ে এস।"

তাওয়ার ছেলে বিলাল বিন উসাইদ ভাবলো, তাদের বাড়ীর তল্লাশী নিলে তাদের উপায় থাকবেনা। তাই সে মুসলিমের সন্ধান জানিয়ে দেবে বলে সিদ্ধান্ত নিল। সে পরদিন প্রত্যুষে মুহাম্মাদ ইবনে আশয়াসের ছেলে আব্দুর রহমানের সাথে দেখা করলো এবং

www.pathagar.com

তাকে জানিয়ে দিল যে, মুসলিম তাদের বাড়ীতে লুকিয়ে আছে। আব্দুর রহমানের বাবা মুহাম্মাদ ইবনে আশয়াস তখন ইবনে যিয়াদের দরবারে। আব্দুর রহমান তৎক্ষণাত তার কাছে গেল এবং সমস্ত ব্যাপার তাকে জানালো। ইবনে যিয়াদ তৎক্ষণাত মুহাম্মাদ ইবনে আশয়াসকে হুকুম দিয়ে পাঠালো যে, এক্ষুনি মুসলিমকে গ্রেফতার করে নিয়ে এস। তার সাথে ষাট সত্তর জন পুলিশের লোক পাঠালো। যারা সবাই কুরাইশ বংশোদ্ভুত ছিল।

ইবনে আশয়াস ষাট সত্তর জন পুলিশ সাথে নিয়ে তাওয়ার বাড়ীতে এল। মুসলিম বিন আকীল যখন ঘোড়ার পায়ের ক্ষুরের শব্দ ও লোকজনের হৈ চৈ শুনলেন, তখন তিনি বুঝলেন যে, শত্রুরা এসে গেছে। তিনি নগ্ন তলোয়ার হাতে নিয়ে কক্ষ থেকে বেরিয়ে এলেন। শত্রুরা তাকে গ্রেফতার করার চেষ্টা করতেই তিনি তলোয়ার প্রয়োগ করতে শুরু করলেন এবং তাদেরকে বাড়ীর ভেতর থেকে হটিয়ে দিলেন। পুলিশ দল দ্বিতীয়বার বাড়ীর ওপর আক্রমণ চালালো। কিন্তু মুসলিম তাদেরকে তিষ্টাতে দিলেন না। অবশেষে অবস্থা বেগতিক দেখে তারা বাড়ীর ছাদের ওপর উঠে সেখান থেকে পাথর ও তীর নিক্ষেপ করা শুরু করলো। এবার মুসলিম তলোয়ার হাতে নিয়ে বাড়ী থেকে বেরিয়ে এলেন এবং রাস্তার ওপর শত্রুর বিরুদ্ধে লড়তে শুরু করলেন। এ অবস্থা দেখে মুহাম্মাদ বিন আশয়াস তাকে বললো ঃ

"আপনি অনর্থক নিজের জীবন বিপন্ন করছেন কেন? আমি আপনাকে নিরাপত্তার আশ্বাস দিচ্ছি। আপনি আমার কাছে আত্মসমর্পণ করুন।"

মুসলিম বিন আকীলের সমস্ত শরীর তখন ক্ষতবিক্ষত। তিনি বাড়ীর প্রাচীরের সাথে হেলান দিয়ে কোন রকমে দাঁড়িয়ে ছিলেন। তিনি কোন উত্তর দিলেন না। ইবনে আশয়াস তার আশ্বাসবানীর পুনরাবৃত্তি করলো। এবার মুসলিম জিজ্ঞেস করলেন ঃ

"তুমি কি সত্যিই ওয়াদা করছ, আমার জীবনের নিরাপত্তা দেবে?"

ইবনে আশয়াস বললো ঃ "হ্যাঁ, আমি আপনাকে জীবনের নিরাপত্তা দেয়ার ওয়াদা করছি।" সেই সাথে অন্যরাও তার প্রাণ রক্ষার আশ্বাস দিল।

মুসলিম বললেন ঃ "তোমরা জীবনের নিরাপত্তার আশ্বাস না দিলে আমি কখখনো তোমাদের কাছে আত্মসমর্পণ করতাম না।"

এরপর একটা খচ্চর আনা হলো এবং মুসলিমকে তার ওপর আরোহন করানো হলো। তিনি খচ্চরে আরোহন করা মাত্রই আকস্মিকভাবে সিপাইরা চারদিক থেকে ঘেরাও করে তার কাছ থেকে তরবারী ছিনিয়ে নিল। এটা দেখে তিনি বুঝতে পারলেন, তিনি তাদেরকে বিশ্বাস করে যে ভুল করেছেন, তা আর পূরণ হবার নয় এবং তাকে ধোকা দিয়ে আত্মসমর্পন করানো হয়েছে। তার চোখে পানি এসে গেল। তিনি বললেন ঃ "এই বুঝি আল্লাহর ইচ্ছা ছিল।"

www.pathagar.com

মুহাম্মাদ ইবনে আশয়াস বললো ঃ 'আমি আশবাদী, আপনার কোন ক্ষতি করা হবে না।"

মুসলিম জবাব দিলেন ঃ তুমি বলছ, আমার কোন ক্ষতি হবে না। তুমি এইমাত্র আমাকে যে নিরাপত্তার আশ্বাস দিলে, তা কোথায় গেল? এখন "ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন পড়া ছাড়া আমার আর কী করার আছে? এই কথা বলতে বলতে তার চোখ দিয়ে পানি গড়িয়ে পড়তে লাগলো।

তার চোখে পানি দেখে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস সালামী বললো ঃ

"যে দায়িত্বে আপনি নিয়োজিত, তাতে অন্য কেউ নিয়োজিত হলে এবং সে আপনার মত অবস্থার শিকার হলে কান্নাকাটি করতো না।"

মুসলিম বললেন ঃ 'তুমি ভেবেছ, আমি মৃত্যুর ভয়ে কাঁদছি? কখখনো নয়! আমার নিজের জীবনের কোন পরোয়া নেই। আমাকে হত্যা করা হবে সে ভয়ে আমি ভীত নই। আমি আমার পরিবারের সেই লোকগুলোর জন্য কাঁদছি, যারা অনতিবিলম্বে তোমাদের কাছে আসবে। আমি হুসাইন (রা) ও তাঁর পরিবারের আসন্ন পরিণতির কথা ভেবে কাঁদছি।" কিছুক্ষণ থেমে তিনি মুহাম্মাদ বিন আশয়াসকে বললেন ঃ

"আমি নিশ্চিত যে, তোমরা আমাকে নিহত হওয়া থেকে বাঁচাতে পারবে না। তবে তোমাদের কাছে আমার এই মিনতি, তোমরা তোমাদের কোন একজনকে আমার ভাই হুসাইনের (রা) কাছে পাঠিয়ে দাও, তিনি যেন কুফাবাসীর ধোকায় না পড়েন। কেননা তাঁর বাবা হযরত আলী (রা) সব সময় কুফাবাসীর কবল থেকে নিস্তার পাবার চেষ্টা করতেন। তাকে বলে দিও, কুফাবাসী আপনার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করতে প্রস্তুত হয়ে আছে। কাজেই নিজের পরিবার পরিজনকে সাথে নিয়ে তিনি যেন স্বদেশে ফিরে যান।"

ইবনে আশয়াস ওয়াদা করলো যে, তার এই বাণী হযরত হুসাইন (রা) এর কাছে পৌছানো হবে। সে এ কথাও বললো যে, সে ইবনে যিয়াদকে জানাবে, সে তাঁকে (মুসলিমকে) আশ্রয় দিয়েছে।

ইবনে আশয়াছ তৎক্ষণাত ইয়াস বিন আছাল তাইকে ডাকলো এবং একটা চিঠিতে মুসলিমের কথাগুলো লিখে তার হাতে দিয়ে বললো ঃ "এই চিঠিটা যত শীগগীর পার, হুসাইনের (রা) কাছে পৌছে দাও।

এরপর মুসলিম বিন আকীলকে নিয়ে তারা ইবনে যিয়াদের প্রাসাদে উপনীত হলো এবং খবর জানালো। ইবনে যিয়াদ ইবনে আশয়াছকে ভেতরে ডাকলো। ইবনে আশয়াছ ভেতরে গিয়ে তাকে মুসলিমের সমস্ত ঘটনা জানালো এবং এ কথাও বললো যে, সে মুসলিমকে আশ্রয় ও জীবনের নিরাপত্তার আশ্বাস দিয়েছে। কাজেই তার যেন কোন ক্ষতি করা না হয়।

ইবনে যিয়াদ বললো ঃ "তুমি আশ্রয় দেয়ার কে? আমি তো তোমাকে মুসলিমকে আশ্রয়

www.pathagar.com

দেয়ার জন্য নয়, বরং গ্রেফতার করে আনার জন্য পাঠিয়েছি।"

ইবনে আশয়াছ আর কী বলবে? হতবুদ্ধি হয়ে চুপ করে রইল। ইবনে যিয়াদ মুসলিমকে তার সামনে উপস্থিত হবার আদেশ দিল। তাকে তৎক্ষণাত তার সামনে হাজির করা হলো। মুসলিম উপস্থিত হয়ে ইবনে যিয়াদকে সালাম করলেন না।

দরবারের রক্ষী বললো ঃ

"গভর্ণর সাহেবকে সালাম কর।"

মুসলিম জবাব দিলেন ঃ "গভর্ণর সাহেব যদি আমাকে হত্যা করতে চায় তবে তাকে সালাম করার আমার কোন দরকার নেই। তবে উনি যদি আমাকে হত্যা করতে না চান, তবে আমি ছালাম করতে প্রস্তুত।"

ইবনে যিয়াদ বললো ঃ "আমি নিজের প্রাণের শপথ করে বলছি, তোকে অবশ্যই হত্যা করবো।"

মুসলিম বললো ঃ সত্যিই?

ইবনে যিয়াদ বললো ঃ হ্যা।

মুসলিম বললেন ঃ তাহলে আমাকে একটুখানি সময় দাও, আমি কারো কাছে জীবনের শেষ কথাটা (ওসিয়ত) বলে যাই।

ইবনে যিয়াদ অনুমতি দিল।

মুসলিম দরবারে উপস্থিত সবার দিকে একবার তাকালেন। হযরত সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাসের (রা) ছেলে আমর বসা ছিল। তাকে তিনি বললেন ঃ "ওহে আমর, তুমি আমার আত্মীয়। আমি তোমাকে একটা কথা বলতে চাই। এদিকে এসে আমার কথাটা শোন।"

আমর প্রথমে তার অনুরোধ শুনেও না শোনার ভান করলো। ইবনে যিয়াদ তা দেখে আমরকে বললো ঃ কি হে, তোমার চাচাত ভাই এর কথা শোন না কেন? যাও, তার কথাটা শোন।" এবার আমর উঠলো। মুসলিম তাকে প্রাসাদে এমন এক কোণে নিয়ে গেল, যেখানে ইবনে যিয়াদ তাকে দেখতে পায়। সেখানে গিয়ে নিভৃতে বললো ঃ

"কুফা আসার পর আমি বিভিন্ন লোকের কাছ থেকে সাতশো দিরহাম ঋণ করেছি। আমার তলোয়ার ও বর্ম বিক্রি করে ঐ ঋণ পরিশোধ করে দিও। আর আমাকে হত্যা করার পর আমার লাশটা ইবনে যিয়াদের কাছ থেকে নিয়ে হুসাইনের (রা) কাছে পাঠিয়ে দিও, যাতে তিনি আমার লাশ দেখে কুফায় না আসেন, কিংবা রওনা হয়ে থাকলে পথিমধ্যে থেকে ফিরে যান। কেননা আমি ইতিপূর্বে তাকে লিখেছি, কুফার লোকেরা আপনার পক্ষে আছে। তাই আমার ধারণা, কয়েক দিনের মধ্যেই তিনি এখানে এসে

www.pathagar.com

পড়তে পারেন।"

আমর ফিরে এসে সমস্ত কথা ইবনে যিয়াদকে জানালো। ইবনে যিয়াদ তাকে মুসলিমের শেষ ইচ্ছা পূরণ করার অনুমতি দিল। তারপর মুসলিমকে উদ্দেশ্য করে সে বললো ঃ

"আমি আমানতদার মানুষ। কখনো তোর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করবো না। তোর জিনিসপত্র তোরই থাকবে এবং তুই ওগুলো যেখানে ইচ্ছা খরচ করতে পারবি। আমি কোন বাধা দেব.না। তোর লাশের ব্যাপারে আমার কথা হলো, তোকে হত্যা করার পর. তোর লাশ নিয়ে আমার আর কোন মাথাব্যথা থাকবে না। হুসাইন (রা) সম্পর্কে তুই যা কিছু বলেছিস, সেটা তোর বিবেচনা। আমি এতটুকু আশ্বাস দিতে পারি যে, উনি যদি আমাদের মোকাবিলা না করেন, তবে আমরা তাকে কোন রকম উত্যক্ত করবোনা।"

"শোন্ মুসলিম বিন আকীল, জনগণ ঐক্যবদ্ধ ছিল। তুই এসে তাদের মধ্যে অনৈক্য, বিভেদ ও কলহ কোন্দল বাধিয়ে দিলি। এ কাজটা তুই কী উদ্দেশ্যে করলি?"

মুসলিম জবাব দিলেন ঃ তুমি যা কিছুই বলছ, ভুল বলছ। আমি কখনো বিভেদ সৃষ্টির উদ্দেশ্য নিয়ে এখানে আসিনি। কুফাবাসীর জনমত সম্পূর্ণরূপে তোমাদের বিপক্ষে এবং ইমাম হুসাইনের (রা) পক্ষে ছিল। কারণ তারা জানতো, তোমার বাবা যিয়াদ তাদের মুরব্বী ও সৎ লোকদেরকে হত্যা করেছে, তাদের রক্তপাত করেছে এবং রোম ও পারস্যের সম্রাটের ঐতিহ্য বহাল রেখেছে। তারা আমাদেরকে এখানে এসে কুরআন ও সুন্নাহ অনুসারে ইনসাফ ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করতে আমন্ত্রণ জানিয়েছিল। কিন্তু তুমি ও তোমার ইয়াযীদ সরকার জনগণকে ভীতি প্রদর্শন করে ও জনগণের সম্পদ লুণ্ঠন করে উৎকোচ দিয়ে জনমত পাল্টে ফেলেছ।"

ইবনে যিয়াদ বললো ঃ "কোথায় তোমরা, আর কোথায় কুরআন ও সুন্নাহ্ ভিত্তিক ইনসাফ কায়েমের আহ্বান? আমি তোমাকে এমন নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করবো যে, ইসলামের সূচনাকাল থেকে এ পর্যন্ত আর কাউকে সেভাবে হত্যা করা হয়নি।"

মুসলিম জবাব দিলেন ঃ "সেটাই স্বাভাবিক। কারণ ইসলামে বিদয়াত (অভিনব অনৈসলামিক কার্যকলাপ) আমদানী করায় তোমাদের জুড়ি নেই। নোংরামি ও পাশবিকতায় তোমাদের সমকক্ষ কেউ নেই।"

এরপর ইবনে যিয়াদ ও মুসলিমের ভেতরে তিক্ত বাক্য বিনিময় শুরু হয়ে গেল। উত্তেজনার চরম পর্যায়ে গিয়ে ইবনে যিয়াদ বুকাইর বিন ইমরান আল-আহমারীকে হুকুম দিল, মুসলিমকে প্রাসাদের ছাদের ওপর নিয়ে গিয়ে সবার সামনে তরবারী দিয়ে মস্তক ছেদন করতে। বুকাইর হুকুম মত কাজ করলো। মুসলিমকে সাথে নিয়ে ছাদের ওপর চলে গেল। মুসলিম অবিরাম আল্লাহু আকবর ধ্বনি দিতে এবং তওবা ইসতিগফার ও দরূদ পড়তে লাগলেন। তারপর বললেন ঃ

www.pathagar.com

"হে আল্লাহ, আমাদের ও এই লোকদের মধ্যে তুমি সত্য অনুসারে ফায়সালা করে দিও, যারা আমাদের সাথে প্রতারণা ও বিশ্বাসঘাতকতা করেছে।" প্রাসাদের সামনে বিপুল সংখ্যক জনতা দাঁড়িয়েছিল। বুকাইর মুসলিমকে ছাদের ওপর নিয়ে সমগ্র জনতার সামনে তার মথা উড়িয়ে দিল। ৯ই জিলহজ্জ ৬০ হিঃ মোতাবেক ১০ই সেপ্টেম্বর ৬৮০ খৃঃ বুধবার অকুতোভয় বীর, হযরত মুসলিম বিন আকীল ইয়াযীদের পদলেহী নরপশু কুফার গভর্ণর উবায়দুল্লাহ বিন যিয়াদের হুকুমে শাহাদাত বরণ করলেন।

মুসলিম বিন আকীলের এহেন শোচনীয় পরিণতি দেখে মুহাম্মাদ বিন আশয়াছ মুসলিমের আসল আশ্রয়দাতা হানী বিন আমর সম্পর্কে উৎকণ্ঠিত হয়ে পড়লো, যাকে ইবনে যিয়াদ নিজ প্রাসাদে বন্দী করে রেখেছিল। সে ইবনে যিয়াদকে বললো ঃ

"আপনি তো জানেন, হানী কুফার কত বড় মর্যাদাবান ব্যক্তি এবং কুফায় তিনি ও তার পরিবার কত প্রভাবশালী। লোকেরা জানে যে, আমিই তাকে আপনার কাছে এনেছিলাম, কাজেই আমি মিনতি করছি, আপনি তাকে কোন করম কষ্ট দেবেন না। নচেত আমার উপায় থাকবেনা।"

ইবনে যিয়াদ ইবনে আশয়াছকে আশ্বাস দিল যে, তাকে কোন কষ্ট দেয়া হবে না। কিন্তু পরে এই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করলো না। সে বাজারে নিয়ে গিয়ে হানীর মাথা উড়িয়ে দেয়ার নির্দেশ দিয়ে দিল। সিপাইরা যখন তাকে নিয়ে গেল, তখন হানী তার মিত্র গোত্র মাজহাজকে সাহায্যের জন্য ডাকলো। কিন্তু কেউ এগিয়ে এলনা। অবশেষে হানী নিজের বাহুবলের ওপর ভর করে রক্ষীদের কাছ থেকে নিজের হাত ছাড়িয়ে নিল। কিন্তু রক্ষীরা আবার তার ওপর ঝাপিয়ে পড়লো এবং পুনরায় শক্তভাবে তার হাত বেঁধে ফেললো। এরপর ইবনে যিয়াদের জনৈক তুর্কী ক্রীতদাস তলোয়ার বের করে হানীকে খতম করে ফেললো।

মুসলিম বিন আকীল ও হানী বিন উরওয়ার শাহাদাতের পর ইবনে যিয়াদ তাদের মাথা ইয়াযীদের কাছে পাঠানোর ব্যবস্থা করলো এবং নিম্নরূপ চিঠি লিখে পাঠালো ঃ

"মহান আল্লাহর শোকর, যিনি আমীরুল মুমিনীন ইয়াযীদের রাজত্বে ব্যাঘাত সৃষ্টির সুযোগ দেননি এবং তাঁর শত্রুদেরকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছেন। আমীরুল মুমিনীন হয়তো অবগত আছেন যে, মুসলিম বিন আকীল হানী বিন উরওয়ার গৃহে আশ্রয় নিয়েছিল। আমি তাদের দু'জনকে খুঁজে বের করার জন্য গোয়েন্দা নিয়োগ করেছিলাম। আমি সর্বোচ্চ মানের বিচক্ষণতা ও কুশলতা প্রয়োগ করে বিভিন্ন ফন্দিফিকির করে উভয়ের সন্ধান পেয়েছি। আল্লাহ আমাকে উভয়কে গ্রেফতার করার ক্ষমতা দিয়েছেন। আমি তাদের উভয়কে হত্যা করেছি এবং আপনার কাছে তাদের উভয়ের মাথা পাঠিয়ে দিচ্ছি। বাহক হানী বিন হাইয়া ও যুবাইর ইবনুল আরওয়াহ খুবই বিশ্বস্ত ও আমীরুল মুমিনীনের অনুগত। ঘটনার বিশদ বিবরণ আপনি উক্ত বাহকদ্বয়ের কাছ থেকে সংগ্রহ করতে পারেন। কেননা তারা সব কিছুই ভালোভাবে জানে।"

www.pathagar.com

মুসলিম বিন আকীল ও হানী বিন উরওয়ার মাথা এবং সেই সাথে ইবনে যিয়াদের চিঠি পেয়ে ইয়াযীদের আনন্দ আর দেখে কে? সে তৎক্ষণাত ইবনে যিয়াদকে চিঠির জবাবে লিখলো ঃ

"তোমার চিঠি এবং হানী ও মুসলিমের মাথা পেলাম। তুমি অত্যন্ত বিচক্ষণতা ও বীরত্বের পরিচয় দিয়েছ। সার্বিক পরিস্থিতির আলোকে আমি এ কথা বুঝতে পেরে আনন্দিত যে, তোমাকে যে দায়িত্ব দিয়েছি, তা পালনে তুমি কোন ত্রুটি রাখনি। তুমি আমার ইচ্ছা ও বাসনা পূর্ণ করেছ। তোমার পাঠানো দূতদ্বয়ের কাছ থেকে আমি সমস্ত বিবরণ শুনেছি। তুমি যেমন লিখেছ, ওরা সে রকমই। আমি শুনেছি, হুসাইন ইরাক অভিমুখে রওনা হয়েছে। তুমি গোয়েন্দাবৃত্তি ও প্রহরার কাজটা কঠোরভাবে চালিয়ে যাও। কারো সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র কোন সন্দেহ হলে তাকে বন্দী কর। যার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের অভিযোগ প্রমাণিত হবে, তাকে হত্যা করবে। তবে যতক্ষণ কেউ তোমার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ না করে, ততক্ষণ তুমিও তার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করোনা। যখন যে পরিস্থিতির সম্মুখীন হও, আমাকে জানিও।"

এই বিবরণ থেকে জানা যায়, আল্লাহ তায়ালা মুসলিম বিন আকীলকে অসাধারণ বীরত্ব ও সাহস দান করেছিলেন। ইবনে যিয়াদের দরবারে উপস্থিত হবার পর তাকে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় জানিয়ে দেয়া হয় যে, তাকে হত্যা করা হবে। তথাপি তিনি বিন্দুমাত্র ভড়কে যাননি। অত্যন্ত দুঃসাহসিকতার সাথে তিনি তার রক্তচক্ষুর ভ্রুকুটিকে উপেক্ষা করে তার সাথে কথা বলেন। তার আরো বড় দুঃসাহসিকতার প্রমাণ এই যে, তিনি শত্রুর হাতে ধরা পড়ার পরও হযরত হুসাইনকে (রা) পরিস্থিতি সম্পর্কে ওয়াকিফহাল করার দায়িত্ব পালন করেন। তাঁকে তিনি জানান যে, কুফার লোকরদের ওপর নির্ভর করা ঠিক হবে না এবং তারা তাদের আনুগত্যের অংগীকার ভঙ্গ করে ইবনে যিয়াদের সাথে মিলে গেছে। কাজেই তিনি যেন এখানে আসার ইচ্ছা ত্যাগ করেন। কেননা তার সাথে যে আচরণ করা হয়েছে, ইমাম হুসাইন (রা) এলে তার সাথেও একই আচরণ করা হবে। তাঁর সাথে তো তার মুষ্টিমেয় ক'জন সাথী ও পরিবার পরিজন ছাড়া আর কেউ থাকবে না এবং তারা তাকে ইবনে যিয়াদের সুগঠিত সেনাদের কবল থেকে বাঁচাতে পারবেনা।

আরো জানা গেল, অর্থ বিত্ত ও ক্ষমতা হাতে পেয়ে এক শ্রেণীর মানুষ কত ঘৃণিত নরপশুতে রূপান্তরিত হতে পারে এবং ইসলাম ও ইসলামী প্রতিষ্ঠান মসজিদ ইত্যাদিকে নিজেদের নোংরা পার্থিব স্বার্থ উদ্ধারে কেমন জঘন্যতম কায়দায় অপব্যবহার করতে পারে। এই সাথে এ কথাও প্রমাণিত যে, 'নির্বাক সংখ্যাগুরু' জনগণ চিরদিনই অধিকতর প্রভাবশালী ও ক্ষমতাশালী গোষ্ঠীর পক্ষ অবলম্বন করতে বাধ্য হয়ে থাকে, ঠিক যেমন একটা গাড়ীর আরোহীরা ইচ্ছায় কিংবা অনিচ্ছায় সেদিকেই যায়, যেদিকে চালক তাদেরকে নিয়ে যায়।

www.pathagar.com

ইমাম হুসাইনের কুফা গমন

ইয়াযীদ যখন জানতে পারলো, মদীনার গভর্নর ওলীদ বিন উতবার উদাসীনতা ও শৌথিল্যের সুযোগে ইমাম হুসাইন (রা) মদীনা থেকে বেরিয়ে মক্কা চলে গেছেন এবং গভর্নর তার কাছ থেকে ইয়াযীদের আনুগত্যের শপথ আদায় করতে ব্যর্থ হয়েছেন, তখন সে ক্রোধে অধীর হয়ে ওলীদকে অপসারণ ও তার স্থলে আমর বিন সাঈদকে গভর্নর নিয়োগ করলো। ইমাম হুসাইন (রা) ৩রা শাবান ৬০ হিঃ মোতাবেক ৯ই মে ৬৮০ খৃঃ তারিখে রাতের বেলা মক্কায় পৌছলেন। তারপর শাবান, রমযান, শওয়াল ও যিলকদ- এই কয়মাস তিনি মক্কায় কাটালেন। তারপর ৮ই জিলহজ্জ হি ঃ ৬০ মোতাবেক ৯ই সেপ্টেম্বর ৬৮০ খৃ. তারীখে সেখান থেকে কূফা রওনা হলেন। তাঁর মক্কায় অবস্থানকালে হেজায ও বসরার বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি এসে তাঁর সাথে সাক্ষাত করে এবং তাঁর আদেশ অনুযায়ী কাজ করতে ও প্রয়োজনে যে কোন ত্যাগ স্বীকারে তারা প্রস্তুত বলে জানায়। এভাবে ক্রমে তার অনুসারী ও সমর্থকদের সংখ্যা বাড়তে লাগলো।

যেদিন তিনি এই মর্মে মুসলিম বিন আকীলের চিঠি পেলেন যে, আপনি নির্ভয়ে চলে আসুন, ইরাকবাসী আপনার সমর্থক এবং বনু উমাইয়ার প্রতি অসন্তুষ্ট, সেদিন থেকেই তিনি ইরাক যাওয়ার প্রস্তুতি শুরু করে দিলেন। তাঁর বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়-স্বজন যখন তাঁর এ ইচ্ছার কথা জানতে পারলো। তখন তারা তাকে ইরাক যাওয়া থেকে নিবৃত্ত রাখতে চেষ্টা করলো। আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রা) মক্কায় ছিলেন। তিনি তাঁর কাছে এলেন এবং বললেন ঃ

"আপনি হেজাজে অবস্থান করে লোকদেরকে খেলাফাতের দাওয়াত দিন। আর ইরাকবাসীকে লিখুন, তারা এখানে এসে আপনাকে সাহায্য করুক। আমরাও আপনাকে যথাসাধ্য সাহায্য করবো।"

হযরত ইমাম হুসাইন (রা) এ পরামর্শ প্রত্যাখ্যান করে বললেন : "আমি আমার আব্বার কাছে শুনেছি, হারাম শরীফের একটা ভেড়া হারাম শরীফের মর্যাদা হানির কারণ হবে। আমি সেই ভেড়া হতে চাইনা।"

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাসও (রা) এ খবর শুনে তাঁর কাছে এসে বলতে লাগলেন ঃ

"জনগণ বলাবলি করছে, আপনি ইরাক যাচ্ছেন। সত্যই কি আপনার ইচ্ছা তাই?"

হযরত হুসাইন (রা) জবাব দিলেন ঃ হাঁ, আমি ইনশাআল্লাহ দুই এক দিনের মধ্যেই ইরাক রওনা হয়ে যাবো।"

ইবনে আব্বাস (রা) বললেন ঃ "আমি আপনাকে আল্লাহর দোহাই দিয়ে বলছি, আপনি

www.pathagar.com

এই সংকল্প ত্যাগ করুন। জেনে শুনে নিজেকে ধ্বংসের মুখে নিক্ষেপ করবেন না। ইরাকবাসী যেমন দাবী করে থাকে, সত্যিই যদি তেমনি আপনার সমর্থক ও সাহায্যকারী হয়ে থাকে, তাহলে আগে সিরীয় শাসককে (অর্থাৎ উবায়দুল্লাহ বিন যিয়াদকে, কেননা সে ইয়াযীদের আপন চাচাতো ভাই– যার রাজধানী সিরিয়ার দামেস্কে) হত্যা করে কূফা নগরীকে নিজেদের দখলে আনা তাদের কর্তব্য। তারা এ কাজটা আগে সম্পন্ন করলে আপনি সানন্দে সেখানে যেতে পারেন। কিন্তু তারা যদি আপনাকে এ অবস্থায় ডেকে থাকে যে, তাদের প্রাদেশিক শাসক বহাল তবিয়তে রয়েছে এবং তার সরকার প্রতিষ্ঠিত থেকে দোর্দণ্ড প্রতাপে কর/খাজনা আদায় করছে, তাহলে আপনি নিশ্চিত জানুন, তারা আপনাকে কেবল যুদ্ধের বলি হবার জন্য ডেকেছে। আপনাকে ধোকা দিয়ে তারা বন্ধুহীন ও সহায়হীন রেখে নিরাপদ দূরত্বে চলে যাবে। ইতিপূর্বে তারা আপনার বাবা ও ভাই এর সাথেও অনুরূপ আচরণ করেছে।"

হযরত হুসাইন (রা) জবাব দিলেন ঃ "আমি ইসতিখারা করবো। "(কোন ব্যাপারে উভয়-সংকটে পড়লে দু'রাকাত নফল নামায পড়ে নির্দিষ্ট দোয়ার মাধ্যমে কোন্‌টা কল্যাণকর হবে– তা জানা অথবা যেটা কল্যাণকর হবে সেই দিকে পরিচালিত করার জন্য আল্লাহর কাছে একাগ্রচিত্তে দোয়া করার নাম ইস্‌তিখারা) পরের দিন আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) আবার এলেন এবং বললেন ঃ "প্রিয় ভাই, আমার মন মানছেনা। আমি এ পথে আপনার মৃত্যুর আশংকা করছি। ইরাকবাসী অত্যান্ত ধোকাবাজ ও বিশ্বাসঘাতক। আপনি কিছুতেই তাদের কাছে যাবেন না। আপনি হেজাজবাসীর নেতা। মক্কাতেই থাকুন। তবে যদি এখান থেকে যেতেই চান, তবে ইয়ামানে চলে যান। ইয়ামান একটা বিশাল দেশ। সেখানে বহু সুরক্ষিত ঘাটি ও দুর্গ রয়েছে। আপনার আব্বার অনেক সমর্থকও সেখানে রয়েছে। সেখানে থেকে আপনি মুসলিম জাহানের দিকে দিকে খেলাফাতের বানী পাঠান। আমি আশা করি এভাবে আপনার উদ্দেশ্য অত্যন্ত সুষ্ঠুভাবে ও নিরাপদে সফল হবে।"

হযরত হুসাইন (রা) এ কথা শুনে বললেন ঃ "আমি বিশ্বাস করি, আপনি আমার শুভাকাংখী ও সদুপদেশদাতা। কিন্তু আমি তো ইরাকে যাওয়ার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়েই ফেলেছি।" এ সিদ্ধান্ত ইস্তিখারার ফল কিনা, সে কথা তিনি বলেননি। তবে সম্ভবত ইসতিখারা করে তিনি আল্লাহর কাছ থেকে ইরাক যাওয়ার পক্ষেই ইশারা পেয়েছিলেন। হয়তো সারা দুনিয়ার মুসলমানদের মনে ইসলামী খিলাফতের পুনর্বহালের উদ্দীপনা জাগিয়ে তোলার জন্য আল্লাহর তায়ালা তার শাহাদাতের ফায়সালা করেছিলেন।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) যখন দেখলেন, হযরত হুসাইন তাঁর সিদ্ধান্তে অটল, তখন তিনি বললেন ঃ ঠিক আছে, আপনি যদি যেতেই চান, তাহলে নিজে চলে যান, শিশু ও

www.pathagar.com

মহিলাদেরকে রেখে যান। আমার আশংকা আল্লাহ না করুন, আপনাকেও হযরত উসমানের (রা) মত স্ত্রী ও সন্তানদের সামনেই শহীদ করে দেয়া হতে পারে।"

কিন্তু ইমাম হুসাইন (রা) এটাও করতে রাজী হলেন না। পরবর্তী সময়ে যখন কারবালার ময়দানে তাঁর সমস্ত সাথীদেরকে শহীদ করে ফেলা হলো তারপর তাঁর শাহাদাতের পালা এল এবং তাঁর পরিবারের লোকেরা শিবির থেকে বাইরে বেরিয়ে আহাজারি করতে লাগলো, তখন তিনি ইবনে আব্বাসের উপদেশ স্মরণ করে বললেন ঃ

"সত্যই, ইবনে আব্বাস আমাকে সঠিক পরামর্শ দিয়েছিল। তাঁর কথা শুনলেই ভালো করতাম।"

হযরত ইবনে উমার ও অন্যান্য শুভাকাংখীও তাঁকে থামাতে চেষ্টা করলো। কিন্তু সবই নিষ্ফল। অবশেষে তিনি নিজের পরিবার পরিজন সমেত মক্কা থেকে রওনা হয়ে গেলেন। সাফফাহ নামক স্থানে পৌছার পর তাঁর সাথে নবী-পরিবারের শুভাকাংখী প্রখ্যাত কবি ফারাযদাকের সাক্ষাত হলো। তিনি কবির কাছে ইরাকের অবস্থা জানতে চাইলে তিনি জবাব দিলেন ঃ

"জনগণের মন আপনার পক্ষে। কিন্তু তাদের তরবারী বনু উমাইয়ার পক্ষে। আল্লাহর শেষ ফায়সালা যথা সময়ে আকাশ থেকেই অবতীর্ণ হয় এবং আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন, সেটাই করেন।"

এ কথা শুনে হযরত হুসাইন (রা) বললেন ঃ "আপনি ঠিকই বলেছেন। আল্লাহ যা চান তাই করেন। তার সিদ্ধান্ত যদি আমাদের পক্ষে হয় তাহলে আমরা শোকর আদায় করবো। আর যদি আমাদের বিপক্ষে হয় তাহলেও আমাদের নিয়ত সৎ। কাজেই আমাদেরকে সওয়াব থেকে বঞ্চিত করবেন না।" তাঁর এ উক্তি থেকে স্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে, কি উদ্দেশ্য ও মানসিকতা নিয়ে তিনি সকল বাধা উপেক্ষা করে কুফা গিয়েছিলেন। তার ইচ্ছা সিংহাসন লাভ করা ছিলনা, বরং জবর দখলকারী অত্যাচারী ও পাপাচারী লোকদের কবল থেকে দেশকে মুক্ত করে প্রকৃত খিলাফতকে পুনর্বহাল করার শেষ চেষ্টা করে আল্লাহর কাছে দায়মুক্ত হওয়াই ছিল তার প্রকৃত লক্ষ্য। তবে স্পষ্টই বুঝা যায়, তিনি মুসলিমের হত্যাকাণ্ডের খবর ও তার শেষ বার্তা পাননি। তাই তার মিশনের ব্যর্থতার সম্ভাবনা থাকলেও সফলতার আশা তিনি একেবারে ত্যাগ করেননি। বিশেষত মুসলিমের প্রথম চিঠি পাওয়ার পর সাফল্যের আশা প্রবল থাকাই স্বাভাবিক ছিল। আর ব্যর্থতার সম্ভাবনা থাকলেও তা যে তার সপরিবারে হত্যাকান্ড পর্যন্ত গড়াতে পারে, তা তিনি হয়তো কল্পনাও করেননি।

তিনি ফারাযদাকের সাথে সংক্ষিপ্ত বাক্যালাপ সেরে আবার যাত্রা অব্যাহত রাখলেন। আরো একটু সামনে এগিয়ে গেলে আওন ও মুহাম্মদ নামক আরো দু'জন দূতের সাথে

www.pathagar.com

তাঁর সাক্ষাত হলো। তারা আব্দুল্লাহ ইবনে জাফরের চিঠি বহন করে এনেছিল। তাতে লেখা ছিল ঃ

"আপনাকে আল্লাহর দোহাই দিয়ে বলছি, এই চিঠি পাওয়া মাত্র আপনি ফিরে আসুন। কেননা যেখানে আপনি যাচ্ছেন, আমার প্রবল আশংকা যে, সেখানে আপনার ও আপনার পরিবারের ধ্বংসের ব্যবস্থা রয়েছে। খোদা না করুন, আপনি নিহত হলে সমগ্র মুসলিম জগত হতাশার কালো ছায়ায় আচ্ছন্ন হয়ে যাবে। কেননা এই মুহূর্তে আপনিই হেদায়াতপ্রাপ্ত লোকদের মশাল ও মুমিনদের আশা আকাংখার কেন্দ্রবিন্দু। আপনি ওখানে যাওয়ার ব্যাপারে তাড়াহুড়ো করবেন না। আমিও শীগগীরই আপনার কাছে আসছি।"

এই চিঠি লেখার পর হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে জাফর মদীনার শাসক আমর বিন সাঈদকে অনুরোধ করলেন যেন তিনিও নিজের পক্ষ থেকে একথা চিঠি লিখে হযরত হুসাইনকে (রা) ফিরে আসার আহ্বান জানান। আমর আব্দুল্লাহকে বললেন, "আপনি নিজেই চিঠি লিখে আনুন, আমি তাতে স্বাক্ষর দেব ও সিল দেব।" আব্দুল্লাহ গভর্ণরের পক্ষ থেকে নিম্নরূপ চিঠি লিখলেন ঃ

"আমি আল্লাহর কাছে দোয়া করি, আপনি যে গন্তব্যের দিকে রওনা হয়েছেন, সেদিক থেকে আল্লাহ আপনাকে ফিরিয়ে আনুন। আমি শুনেছি, আপনি ইরাক যাচ্ছেন। আমি আপনাকে আল্লাহর দোহাই দিয়ে বলছি, আপনি বিভেদ ও বিশৃংখলা সৃষ্টির পথ থেকে ফিরে আসুন। এ পথে আপনার ধ্বংস অনিবার্য। আমি আব্দুল্লাহ ইবনে জাফর ও আমার সহোদর ভাইকে আপনার কাছে পাঠালাম। আপনি তাদের সাথে ফিরে আসুন। আমি আপনাকে নিরাপত্তা দিচ্ছি। আপনার সাথে আমি সহানুভূতির সাথে ও রক্ত সম্পর্ক আত্মীয়সুলভ সহমর্মিতার সাথে আচরণ করবো। আপনাকে সাহায্য করবো। আপনি আমার কাছে অত্যন্ত নিরাপদ ও সুখময় জীবন যাপন করবেন। আল্লাহ নিজেই এ ব্যাপারে সাক্ষী এবং তিনিই সকলের তত্ত্বাবধায়ক ও অভিভাবক।"

আব্দুল্লাহ ইবনে জাফর এই চিঠি নিয়ে হযরত হুসাইনের (রা) সাথে সাক্ষাত করলেন। ইমাম হুসাইন (রা) এই চিঠি পড়লেন এবং পড়ার পর বললেন ঃ

"স্বপ্নে রাসূল (সা) এর সাথে আমার সাক্ষাত হয়েছে। তিনি আমাকে একটা কাজ করার নির্দেশ দিয়েছেন। আমি সেই কাজটা করবোই– তাই তার ফলাফল যা-ই হোক না কেন।"

আব্দুল্লাহ ইবনে জাফর জিজ্ঞেস করলেন ঃ সেই কাজটা কী?

ইমাম হুসাইন (রা) বললেন ঃ "আমি সে কথা এখন পর্যন্ত কাউকে বলিনি, কখনো বলবোওনা, যতক্ষণ আমার প্রতিপালকের কাছে উপস্থিত না হই।"

কে জানে এ কাজটাই সেই দুঃসাহসিক প্রতিবাদ কিনা, যা তিনি ইয়াযীদের তাগুতী

www.pathagar.com

শক্তির বিরুদ্ধে করতে গিয়ে কারবালা প্রান্তরে শাহাদাত বরণ করলেন এবং জীবনের বিনিময়ে "যালেম শাসকের সামনে সত্য কথা সর্বোত্তম 'জিহাদ" এই হাদীস বাস্তবায়িত করে দেখালেন। তিনি যদি চুপ থাকতেন, তবে হয়তো ঐ যুলুমশাহী বৈধতা পেয়ে যেত এবং কেয়ামত পর্যন্ত আর প্রকৃত খিলাফত কায়েমের সাহস কেউ করতোনা।

অগত্যা আব্দুল্লাহ ইবনে জাফর ফিরে এলেন। কিন্তু আওন ও মুহাম্মাদকে হযরত ইমাম হুসাইনের (রা) সাথে থাকার নির্দেশ দিয়ে গেলেন।

এদিকে যখন ইবনে যিয়াদ শুনলো যে, হযরত হুসাইন (রা) কূফার দিকে অগ্রসর হচ্ছেন, তখন সেই পাপাত্মা চোখে শর্ষে ফুল দেখতে লাগলো। সে পুলিশের প্রধান পরিচালক হাসীন বিন নুমাইরকে যে কোন মূল্যে পথিমধ্যেই তার গতিরোধ করার আদেশ দিলেন। কেননা কূফায় মুসলিম যে অঘটন ঘটিয়েছিল, তা সে ভুলে যায়নি। ইমাম হুসাইন (রা) স্বয়ং এসে পৌঁছলে তার চেয়ে অনেক বড় অঘটন ঘটে যেতে পারে, এ আশংকায় তার মাথা বিগড়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল। হুসাইন বিন নুমাইর কাদেসিয়া থেকে হেজাজ সীমান্ত অবধি জায়গায় জায়গায় ঘোড় সওয়ার প্রহরীদেরকে নিয়োজিত করলো, যাতে তারা ইমাম হুসাইনের (রা) কাফেলার গতিবিধির খবর প্রতি মুহূর্তে দিতে পারে, আর সেই সাথে কূফার জনগণ ও ইমাম হুসাইনের (রা) মধ্যে চিঠিপত্র আদান প্রদানের ধারা যেন চলতে না পারে। এই ব্যবস্থার ফল হলো এই যে, ইরাক থেকে কেউ বাইরে যেতেও পারছিলনা এবং কেউ বাহির থেকে ভেতরে আসতেও পারছিলনা।

ইমাম হুসাইন (রা) যখন হাজেয নামক স্থানে পৌঁছলেন, তখন কায়েস বিন মিসহার সায়দাদীর মারফত কূফাবাসীকে একটা চিঠি পাঠালেন। ঐ চিঠিতে তিনি নিজের আগমনের খবর জানিয়েছিলেন এবং তাদেরকে প্রস্তুতি গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছিলেন। কায়েস যখন কাদেসিয়া পৌঁছলেন। তখন হুসাইনের বিন নুমাইর নিয়োজিত রক্ষীরা তাকে গ্রেফতার করলো। হুসাইন বিন নুমাইর তাকে ইবনে যিয়াদের কাছে সরাসরি কূফায় পাঠিয়ে দিল। ইবনে যিয়াদ চিঠিটা পড়লো এবং কায়েসকে নির্দেশ দিল ঃ

"গভর্ণর ভবনের ছাদের ওপর উঠে উচ্চস্বরে মিথ্যুকের বাচ্চা মিথ্যুক হুসাইনকে গালি দাও।"

কায়েস ছাদের ওপর উঠলেন এবং উচ্চস্বরে যা বললেন তা ছিল এ রকম!

ওহে জনমন্ডলী, এ হচ্ছে হুসাইন বিন আলীর চিঠি, যিনি রাসূল (সা) এর মেয়ে ফাতিমার আদরের দুলাল এবং বর্তমান বিশ্বের শ্রেষ্ঠ মানব। আমরা তার দূত হিসেবে তোমাদের কাছে এসেছি। তিনি হাজেয পর্যন্ত পৌঁছেছেন। তোমরা তার দাওয়াত গ্রহণ কর।"

এ পর্যন্ত বলে তিনি ইবনে যিয়াদ ও তার বাবার ওপর অভিশাপ বর্ষণ করলেন এবং

www.pathagar.com

হযরত আলীর প্রশংসা করলেন।

ইবনে যিয়াদ এ অবস্থা দেখে রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে রক্ষীদেরকে হুকুম দিল কায়েসকে ছাদ থেকে নীচে ফেলে দিতে। হুকুম তৎক্ষনাত কার্যকরী করা হলো। মুসলিমের পর একই ভবনে কায়েসকেও শহীদ হতে হলো।

হযরত হুসাইন যখন 'বাতনে রামলা' অতিক্রম করে আরবদের একটা ঝর্ণার কাছে পৌছলেন, তখন সেখানে ইরাক থেকে প্রত্যাগত আব্দুল্লাহ রিন মুতীর সাথে তাঁর সাক্ষাত হলো। আব্দুল্লাহ বিন মুতী তাকে জিজ্ঞেস করলো ঃ

"হে রাসূলের নাতি, আমার বাবা মা আপনার ওপর উৎসর্গ হোক। আপনি আল্লাহর ও আপনার মহান নানার পবিত্র স্থান থেকে বাইরে এলেন কেন? হযরত হুসাইন (রা) বললেন ঃ "কূফাবাসী আমাকে আমন্ত্রণ করেছে।"

আব্দুল্লাহ বললো ঃ "আমি ইসলাম ও কুরাইশের মর্যাদার খাতিরে আপনাকে আল্লাহর দোহাই দিচ্ছি, আপনি এই ইচ্ছা ত্যাগ করুন। যে খিলাফত বর্তমানে বনু উমাইয়ার দখলে, তা যদি আপনি দাবী করেন তবে আপনাকে অবশ্যই শহীদ করা হবে। আর আপনাকে শহীদ করা হলে আপনার পর আর কেউ এমন নেই, যাকে তারা ভয় করবে। এভাবে খুনোখুনির এমন এক ধারাবাহিকতা শুরু হয়ে যাবে, যা আর কখনো থামবেনা।"

ইমাম হুসাইন (রা) এই পরামর্শও অগ্রাহ্য করলেন। তিনি বললেন ঃ "যা কিছু আল্লাহর তায়ালা লিখে দিয়েছেন, তার চেয়ে বেশী আর কী হতে পারে?" অতপর তিনি কূফা অভিমুখে যাত্রা অব্যাহত রাখলেন। যখন তিনি যরূদ নামক স্থানে পৌছলেন, তখন তিনি একটা তাবু দেখতে পেলেন। জিজ্ঞেস করে জানা গেল যে, ওটা যুহাইর কাইন বাজালীর তাঁবু। যুহাইর হযরত উসমানের (রা) ভক্ত ছিলেন। তিনি হজ্জের পর কূফায় ফিরে যাচ্ছিলেন। হযরত হুসাইন (রা) তাকে ডেকে আনতে লোক পাঠালেন। প্রথমে তিনি সাক্ষাত করতে কিছুটা ইতস্তত করছিলেন। কিন্তু স্ত্রীর পীড়াপীড়িতে শেষ পর্যন্ত তাঁর সাথে সাক্ষাত করতে চলে গেলেন। হযরত হুসাইনের (রা) সাথে সাক্ষাতে তার মন এতটা বদলে গেল যে, তিনি তৎক্ষণাত নিজের তাঁবু হুসাইনের (রা) তাঁবুর পাশাপাশি পুনস্থাপন করলেন। তারপর নিজের সাথীদেরকে তিনি এভাবে সম্বোধন করলেন ঃ

"তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি শহীদ হতে ইচ্ছুক, সে যেন আমার সাথে চলে আসে। আর যাদের এতটা সাহস নেই, তারা যেন নিজ নিজ গন্তব্যে চলে যায়। তার সাথীদের মধ্য থেকে কেউ তার ডাকে সাড়া দিলনা। সবাই কূফা চলে গেল। যুহাইর নিজের স্ত্রীকে কাছে ডাকলো এবং তাকে তালাক দিয়ে বললো ঃ

"তুমি তোমার ভাই এর সাথে বাড়ীতে চলে যাও। আমি হযরত হুসাইনের (রা) সাথে জেহাদের শরীক হবার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আমি চাইনা আমার কারণে তুমি কোন কষ্টের

www.pathagar.com

ভেতরে পড়।"

কারবালা প্রান্তরে ইমাম হুসাইনের (রা) সাথে শাহাদাত প্রাপ্ততের মধ্যে যুহাইরের লাশও পাওয়া গিয়েছিল।

ছা'লাবিয়া নামক স্থানে পৌছার পর এই প্রথম ইমাম হুসাইন (রা.) মুসলিম বিন আকীলের শাহাদাতের খবর জানতে পারলেন। বনু আসাদের দু'জন বেদুঈন কূফা থেকে আসছিল। তিনি তাদের কাছে সেখানকার হাল হাকীকত জিজ্ঞেস করলেন। তারা বললেন ঃ

"হে রাসূল (সা) এর দৌহিত্র, কূফার ভাবগতিক সুবিধের নয়। কূফাবাসীর মন আপনার অনুগত, কিন্তু তাদের তরবারী ইবনে যিয়াদের হুকুমে চলে। তাদের তরবারী আপনার বিরুদ্ধেই চালিত হবে। কাজেই আপনার ফিরে যাওয়াই ভালো।" এরপর তারা দু'জন মুসলিমের শাহাদাতের ঘটনা বিশদভাবে বর্ণনা করলো।

হযরত হুসাইন (রা) এই মর্মাবিদারী ঘটনা শুনে "ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন" পড়লেন। এই ঘটনা শোনার পর ইমাম হুসাইনের (রা) সাথীদের অনেকে কসম খেয়ে খেয়ে তাঁকে বললো ঃ "আপনি এখান থেকেই ফিরে চলুন। কূফায় আপনার সমর্থক ও সাহায্যকারী বলতে কেউ নেই। আমাদের আশংকা, আপনি কূফায় পৌছার পর কূফাবাসী আপনার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে চলে আসবে।"

এই সময় মুসলিমের ভাই গর্জে উঠলেন ঃ "আল্লাহর কসম, আমার ভাই এর হত্যার প্রতিশোধ না নিয়ে আমরা পিছু হটবোনা। এতে যদি মুসলিমের মত আমাদেরও শহীদ হতে হয়, তবু পরোয়া নেই।"

ইমাম হুসাইন (রা) বললেন ঃ "মুসলিমের মত লোকদের মৃত্যুর পর আমাদের বেঁচে থেকে কী হবে?" কেউ কেউ এই বলে উৎসাহ যোগালো ঃ আল্লাহর কসম, আপনার সাথে মুসলিমের মত আচরণ করা হবেনা। আপনি কূফায় পৌছামাত্রই লোকেরা দলে দলে আপনার বাহিনীতে ভর্তি হবে।" আসলে এই ধারণাটা সঠিক ছিলনা। তবে ইয়াযীদের মনে এ ধরনের আশংকা ছিল। তাই ইয়াযীদের হুকুম ছিল ইমাম হুসাইনের (রা) কাফেলাকে কূফার ধারে কাছেও যেন পৌছতে না দেয়া হয়, তাই কারবালাতেই তার যাত্রা রোধ করা হয়।

কাফেলা আরো অগ্রসর হলো। হযরত হুসাইন (রা) যেখানেই যাত্রা বিরতি করছিলেন সেখান থেকেই লোকেরা দলে দলে তার সাথে যোগদান করছিল। যুবালা নামক স্থানে পৌছে তিনি নিজের দুধ ভাই আব্দুল্লাহ বিন ইয়াকতারের শাহাদাতের খবর পেলেন। তিনি তাঁকে মুসলিমের কাছে পাঠিয়েছিলেন। হুসাইন বিন নুমাইরের লোকেরা তাকে গ্রেফতার করে ইবনে যিয়াদের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিল। ইবনে যিয়াদ তাকে নির্দেশ দেয় যে, ভবনের ছাদের ওপর গিয়ে "মিথ্যুকের বাচ্চা মিথুক" হুসাইনের ওপর অভিশাপ

www.pathagar.com

দাও। তিনি ছাদের ওপর গিয়ে কায়েসের মত বললেন ঃ হযরত হুসাইন তোমাদের দাওয়াতে সাড়া দিয়ে আসছেন। তোমরা ইবনে যিয়াদের বিরুদ্ধে তাকে সাহায্য কর।" ইবনে যিয়াদ তাকেও ছাদের ওপর থেকে ধাক্কা দিয়ে নীচে ফেলে দেয়ার আদেশ দেয়। ইবনে ইয়াকতার ছাদের ওপর থেকে পড়ে মারা যাননি, তবে মারাত্মকভাবে আহত হয়ে যন্ত্রণায় ছটফট করতে থাকেন।

এ অবস্থা দেখে আব্দুল মুগনি বিন উমাইর লাখমী গিয়ে ছোরা দিয়ে তাকে যবাই করে দিল। তার সাথীরা তাকে এ জন্য ভর্ৎসনা করলে সে বললো, "আমি এ কাজ আব্দুল্লাহকে আরাম দেয়ার জন্য করেছি। কেননা তার ছটফটানি আমি সহ্য করতে পারিনি।"

যুবালা থেকে আব্দুল্লাহ ইবনে ইয়াকতারকে মুসলিমের কাছে পাঠানোর কিছুক্ষণ পরই ইমাম হুসাইনের (রা) সাথে এসে সাক্ষাত করলো মুহাম্মাদ বিন আশয়াছ ও আমর বিন সা'দের দূতদ্বয়। মুসলিম বিন আকীল মৃত্যুর আগে যে ওসিয়তগুলো করেছিলেন, তাও তারা ইমাম হুসাইনকে (রা) জানালেন। ইবনে আশয়াছ ও ইবনে সা'দের আগমনের পর মুসলিম বিন আকীলের শাহাদাতের খবরের সত্যতায় আর কোন সন্দেহের অবকাশ রইলনা।

হযরত হুসাইন (রা) যখন একের পর এক এ ধরনের হতাশাব্যঞ্জক খবর পেতে লাগলেন, তখন তিনি তার সাথীদেরকে সমবেত করলেন। তারপর তাদেরকে উদ্দেশ্য করে যে সংক্ষিপ্ত ভাষণ দিলেন তা ছিল ঃ

"আমি জানতে পেরেছি, মুসলিম বিন আকীল ও হানী বিন উরওয়াকে শহীদ করে ফেলা হয়েছে। আমাদের সমর্থকরা আমাদের প্রতি তাদের সমর্থন ত্যাগ করেছে। এমতাস্থায় তোমাদের মধ্যকার যে কেউ ফিরে যেতে চাইলে যেতে পারে। আমাদের পক্ষ থেকে তার ওপর কোন দোষারোপ করা হবেনা।"

এ ভাষণ শোনার পর লোকেরা বিদায় নিতে শুরু করলো। পথিমধ্যে যারা যারা তার সাথে যোগ দিয়েছিল, তাদের মধ্য থেকে দু'চারজন নিষ্ঠাবান লোক ছাড়া আর কেউ রইলনা। কেবলমাত্র মদীনা থেকে আগত লোকেরাই তার সাথে টিকে থাকলো।

ইমাম হুসাইন (রা) জানতেন, যারা তাঁর সাথে এসেছে, তাদের অধিকাংশই এই ধারণা নিয়ে এসেছে যে, কূফার লোকেরা ইমাম হুসাইনের (রা) অনুগত এবং তিনি সেখানে পৌঁছামাত্রই তিনি অতি সহজে শহরটা জয় করতে পারবেন। এ জন্য তিনি তাদেরকে প্রকৃত পরিস্থিতি সবিস্তারে জানিয়ে দিলেন এবং তাদের কি কি অবস্থার সম্মুখীন হতে হবে তা আগে থেকে বলে দিলেন, যাতে তার সাথে শুধু এমন লোকেরা থাকে, যারা মৃত্যুর পরোয়া মোটেই করবেনা এবং জীবনকে বাজি রেখে তার অনুগত থাকবে।

যুবালা অতিক্রম করার পর তিনি বাতনে আকাবায় যাত্রা বিরতি করলেন। এখানে বনু ইকরামা গোত্রের এক ব্যক্তিকে পাওয়া গেল। সে তাকে জানালো যে, কাদেসিয়া থেকে

www.pathagar.com

ইযযীব পর্যন্ত ইবনে যিয়াদ বহু সংখ্যক গোয়েন্দা ও রক্ষী নিয়োগ করে রেখেছে। যাতে আপনি জীবিত ফিরে যেতে না পারেন। সুতরাং আমার পরামর্শ, আপনি আগে ভাগেই ফিরে যান।"

কিন্তু ইমাম হুসাইন (রা) বললেন ঃ

"পরিনতি যা-ই ঘটুক না কেন, আমি আল্লাহর আদেশ কার্যকরী করবোই।"

ইবনে যিয়াদের কূফাগামী সকল রাস্তা অবরোধ করার উদ্দেশ্য ছিল, ইমাম হুসাইন (রা) যেন কূফায় না পৌছতে পারেন এবং কূফার লোকেরাও ইমামের গতিবিধি সম্পর্কে কিছুই জানতে না পারে। বরং পথিমধ্যেই তার মোকাবিলা করে তাকে শহীদ করে দেয়াই ছিল তার উদ্দেশ্য। পরবর্তী ঘটনাবলী পর্যালোচনা করলে বুঝা যায়, ইয়াযীদ যাই মনে করুক, ইবনে যিয়াদ জানতো যে, ইমাম হুসাইন (রা) এমন কোন সেনাবাহিনী নিয়ে আসেননি, যা তার বাহিনীকে পরাজিত করতে পারে, কিংবা জনগণকে বিদ্রোহের উস্কানী দিয়ে গনঅভ্যুত্থান ঘটাতে পারে। কিন্তু তার যেহেতু একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল ইমাম হুসাইনকে (রা) খতম করা। তাই সে এই উদ্দেশ্য সফল করার জন্য অত্যন্ত নির্লজ্জ পন্থা অবলম্বন করলো। সে ইচ্ছে করলে অনায়াসে ইমাম হুসাইনকে (রা) কূফায় নিয়ে যেতে পারতো এবং ইয়াযীদের সাথে তাঁর সম্পর্কে পরামর্শ করতে পারতো। ইমাম হুসাইন (রা) ইবনে যিয়াদের কোন ক্ষতি করার চেষ্টা করতেন না। কিন্তু ইমাম হুসাইনের (রা) রক্তের নেশা তাকে উম্মত্ত করে তুলেছিল। তাই সে চরম অদূরদর্শিতা ও নির্বুদ্ধিতার বশে এমন কাজ করলো; যার কারণে মানবজাতি কেয়ামত পর্যন্ত তাকে অভিসম্পাত দিতে থাকবে।

প্রসংগত উল্লেখ্য যে, সব কটা ইতিহাসগ্রন্থ পর্যালোচনা করলেও দেখা যায়, কোথাও ইমাম হুসাইনকে (রা) নিছক হযরত আলীর (রা) ছেলে বা রাসূলের (সা) দৌহিত্র হবার সুবাদে খিলাফত পাওয়ার দাবীদার ও ক্ষমতালোভী হিসাবে চিত্রিত করা হয়নি। বরং দলমত নির্বিশেষে সকল ঐতিহাসিক এ ব্যাপারে একমত যে, সে সময় রাসূল (সা) এর যে সকল সাহাবী ও তাবেয়ী জীবিত ছিলেন, তাদের সকলেই সর্বসম্মতভাবে তাকেই খিলাফতের একমাত্র যোগ্যতম উত্তরাধিকারী বলে স্বীকার করতেন। আর এ কারণেই হযরত মুয়াবিয়াও লিখিতভাবে অংগীকারাবদ্ধ ছিলেন যে, তার পরে হযরত হুসাইনের (রা) কাছেই ক্ষমতা হস্তান্তর করবেন। হুসাইনের পক্ষে জনমতের চাপ এতই প্রবল ছিল যে, তিনি এই অংগীকার না করে পারেননি। বর্তমান কালের গনতান্ত্রিক নিয়মে নির্বাচনের মাধ্যমে খলিফা নিয়োগ করা হলে একমাত্র তিনি যে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে নির্বাচিত হতেন তাতে কোনই সন্দেহ নেই। এমনকি একথা বলাও অত্যুক্তি হবেনা যে, হয়তো বা নির্বাচনে তার কোন প্রতিদ্বন্দ্বীও খুঁজে পাওয়া যেতনা।

www.pathagar.com

হক ও বাতিলের প্রত্যক্ষ সংঘাতের সূচনা

ইরাকের যেখান থেকে যত সড়ক হেজাযের দিক চলে গিয়েছে, সে সব সড়কে ও কুফার আশপাশে সর্বত্র ইবনে যিয়াদ ছোট ছোট সেনাদল নিয়োজিত রেখেছিল, যাতে ইমাম হুসাইন (রা) কোন না কোন সেনাদলের সামনে অবশ্যই পড়েন এবং প্রত্যেকটা সেনাদলকে কড়া নির্দেশ দিয়ে রেখেছিল যে, মক্কা ও মদীনার শাসকদ্বয়ের নিয়ন্ত্রণ থেকে যেভাবে তিনি বেরিয়ে এসেছেন, সেভাবে তাদের কবল থেকে যেন তিনি কোন ক্রমেই ছাড়া পেয়ে বেরিয়ে যেতে না পারেন।

মক্কা থেকে ইরাক পর্যন্ত সুদীর্ঘ দুর্গম পথ ইমাম হুসাইন (রা) অত্যন্ত কষ্টের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করেন। ভূমি ছিল খুবই অসমতল। রাস্তায় জায়গায় জায়গায় গভীর খাদ ও গর্ত, ছোট বড় পাহাড় ও সুপরিসর মরুভূমি ছিল। সময়টা ছিল প্রচন্ড গরমের। 'বাতনে আকাবা' অতিক্রম করার পর তাঁর ক্ষুদ্র দলটা ইরাক সীমান্তে অবস্থিত ক্ষুদ্র জনপদ শারাকে উপনীত হলো। এ সময় ৬১ হিঃ সনের মুহাররম মাস, মোতাবেক ৬৮০ খৃস্টাব্দের অক্টোবর মাস শুরু হয়ে গেছে। ঠিক দুপুরের সময় তিনি দেখলেন, একটা সেনাদল বিপরীত দিক থেকে এগিয়ে আসছে। তিনি বুঝতে পারলেন, এটা ইবনে যিয়াদের সেনাদল। তিনি স্বীয় সংগীদেরকে বললেন, "একটা পাহাড়ের পাশে তাঁবু স্থাপন করাই আমাদের পক্ষে ভালো হবে। শত্রু আক্রমণ করলে কেবল একদিক থেকেই করতে পারবে, চতুর্দিক থেকে ঘিরে ফেলতে পারবেনা। এতে করে মোকাবিলা করা সহজ হবে।" যুহাইর বিন কহিন বললেন ঃ "আপনি ঠিকই বলেছেন। আমাদের নিকটেই বাম পার্শে "যী হাসাম" পাহাড়। আমাদের দ্রুত গতিতে ঐ পাহাড়ের পাদদেশে পৌছে তাঁবু গাড়তে হবে। নচেত শত্রুরা যদি ওখানে পৌছে যায়, তবে যে সুযোগটা আমরা পেতে চাই, তা ওরাই পেয়ে যাবে।"

হযরত হুসাইন (রা) সাথীদেরকে যত দ্রুত সম্ভব যী হাসাম পাহাড়ের পাদদেশে পৌছে তাঁবু স্থাপনের নির্দেশ দিলেন। নির্দেশ পালিত হলো এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই তাঁর কাফেলা যী হাসামের পাদদেশে পৌছে গেল।

যে সেনাদলটাকে তিনি বিপরীত দিক থেকে অর্থাৎ কুফার দিক থেকে আসতে দেখেছিলেন, ওটা ছিল হুর বিন ইয়াযীদ নামক বনুতামীম গোত্রীয় এক যুবকের সেনাদল। ইমাম হুসাইনের (রা) অগ্রযাত্রা রোধ ও তাকে ঘেরাও করে রাখার জন্য ইবনে যিয়াদ তার নেতৃত্বে এই সেনাদলটা পাঠিয়েছিল। হুরের সেনাদল এসে ইমাম হুসাইনের (রা) কাফেলার ঠিক বিপরীত দিকে তাঁবু স্থাপন করলো। হযরত হুসাইন (রা) তাঁর সংগীদেরকে নির্দেশ দিলেন, "ওদেরকে পানি পান করাও এবং ওদের ঘোড়াগুলোকেও পানি পান করাও। কারণ তারা ঠিক দুপুরের সময় এসেছে।"

তাঁর সংগীরা তার নির্দেশ অনুসারে আগন্তুক সেনাদল ও তাদের ঘোড়াগুলোকে পানি পান

www.pathagar.com

করালো। কিছুক্ষণ হুরের সেনাদল বিশ্রাম নিল। এরপর ইমাম হুসাইন (রা) স্বীয় দলের মুয়াযযিন হাজ্জাজ বিন মাসরূককে জোহরের আযান দেয়ার আদেশ দিলেন। আযান দেয়া হলো। ইমাম হুসাইন (রা) তাঁবু থেকে বেরিয়ে এলেন এবং হুরের সেনাদলের সামনে দাঁড়িয়ে আল্লাহর প্রশংসা ও রাসূল (সা) এর প্রতি দরূদ প্রেরণান্তে নিম্নরূপ ভাষণ দিলেন ঃ

"হে জনমন্ডলী, আমি তোমাদের কাছে নিজ উদ্যোগে আসিনি। বরং আমার কাছে তোমাদের বহু সংখ্যক দাওয়াতী চিঠি এসেছে এবং তোমরা বহু দূত মারফত এই মর্মে বার্তা পাঠিয়েছ যে, আমরা নেতাবিহীন অবস্থায় আছি। আমরা আশা করছি, আল্লাহ আপনার মাধ্যমে আমাদেরকে সত্য ও ন্যায়ের ওপর ঐক্যবদ্ধ করে দেবেন। এখন আমি তোমাদের আমন্ত্রণক্রমে তোমাদের কাছে এসেছি। এখন তোমরা যদি আমার সাথে অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়ে আমাকে পুরোপুরি আশ্বস্ত কর, তাহলে আমি তোমাদের শহরে যাবো। আর যদি তা না কর এবং আমার আগমন তোমাদের কাছে অপছন্দনীয় হয়, তাহলে আমি যেখান থেকে এসেছি, সেখানে ফিরে যাবো।"

এই ক্ষুদ্র ভাষণ শুনে সবাই নীরব হয়ে গেল। কেউ টু-শব্দটাও মুখ থেকে বের করলোনা। তিনি তার কাফেলাকে অবস্থান অব্যাহত রাখার নির্দেশ দিলেন। তারপর হুরকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ

"আপনারা কি আমাদের সাথেই নামায পড়বেন, না আলাদা পড়বেন?"

হুর জবাব দিল ঃ

"সবাই এক সাথেই পড়বো।"

এরপর হুরের সেনাদল ইমাম হুসাইনের (রা) পেছনেই নামায পড়লো। নামাযের পর হযরত হুসাইন (রা) ও তাঁর সাথীরা তাঁবুতে ফিরে এলেন। আর হুর ও তার সেনাদলও নিজেদের তাঁবুতে ফিরে গেল।

এরপর আছরের সময় এল। ইমাম হুসাইনের (রা) মুয়াযযিন আযান দিল। এবারও ইমাম হুসাইন (রা) উভয় পক্ষের নামাযের ইমামতী করলেন। নামাযের পর তিনি নিম্নরূপ ভাষণ দিলেন ঃ

"হে জনমন্ডলী, তোমরা যদি আল্লাহকে ভয় কর এবং কে কোন্ জিনিসের প্রকৃত হকদার, তা উপলব্ধি কর, তাহলে তোমরা অবশ্যিই আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করবে। যারা জুলুম ও জবরদস্তির মাধ্যমে তোমাদের ওপর শাসন চালায় এবং যাদের ভেতরে খেলাফত পরিচালনার কোন যোগ্যতাই নেই, খেলাফতের ওপর তাদের চাইতে আমাদের অনেক বেশী অগ্রাধিকার রয়েছে। তবুও যদি তোমরা মনে কর আমাদের আসা সমীচীন হয়নি, তোমরা আমাদের অগ্রাধিকার উপলব্ধি করতে না পার এবং তোমাদের চিঠি ও দূতদের মাধ্যমে যে অভিমত জেনে আমরা এসেছি, এখন যদি তোমরা সেই অভিমত পাল্টে ফেলে থাক, তাহলে আমরা ফিরে যেতে প্রস্তুত আছি।"

সহসা হুর বিন ইয়াযীদ উঠে দাঁড়ালো। সে বললো ঃ "এই যে আপনি বারবার চিঠি ও দূতের উল্লেখ করছেন, এর মানে কি? আমরা তো এসবের বিন্দু বিসর্গও জানিনা।"

www.pathagar.com

হযরত হুসাইন (রা) কুফাবাসীদের চিঠিভর্তি বড় বড় দুটো ব্যাগ চেয়ে পাঠালেন এবং তা হুর ও তার সেনাদলের সামেন ছড়িয়ে দিলেন।

হুর বললো ঃ "আমরা এসব চিঠি আপনাকে লিখিনি। আমাদেরকে তো নির্দেশ দেয়া হয়েছে, আপনাদের সাথে দেখা হলে আপনাদেরকে কুফায় গভর্নর ইবনে যিয়াদের কাছে যেন অবশ্যই পৌঁছিয়ে দেই।"

হযরত হুসাইন (রা) দৃঢ় কণ্ঠে বললেন ঃ "সে কাজটা সম্পন্ন করার অনেক আগেই তোমাদের মৃত্যু ঘটবে ইনশাআল্লাহ।" এই বলেই তিনি তাঁর সাথীদেরকে নির্দেশ দিলেন ঃ "হেজাযে প্রত্যাবর্তনের জন্য প্রস্তুত হও।" হুর রুখে দাঁড়ালো। ইমাম হুসাইন বললেন ঃ "তুমি কী চাও?"

হুর বললো ঃ "আপনাকে কুফার গভর্নর উবায়দুল্লাহ বিন যিয়াদের কাছে নিয়ে যেতে চাই।"

ইমাম হুসাইন (রা) বললেন ঃ "সেটা তো কিছুতেই সম্ভব নয়।"

হুর জবাব দিল ঃ "তাহলে আমি আপনাকে ছাড়তেও পারিনা।"

এরপর উভয়ের মধ্যে কিছুক্ষণ তীব্র বাকবিতন্ডা হলো। হুমকি ও পাল্টা হুমকি উচ্চারিত হলো। অবশেষে হুর সুর নরম করে বললো ঃ

"আমাকে আপনার সাথে যুদ্ধ করার নির্দেশ দেয়া হয়নি। শুধু এই নির্দেশ দেয়া হয়েছে যেন আপনাকে যেখানেই পাই, পাহারা দিয়ে কুফায় নিয়ে যাই। সুতরাং আপনি এমন একটা পথ ধরলে ভালো হয়, যা ইরাক ও হিজাযের মধ্যবর্তী পথ, যে পথ ধরে কুফায়ও যাওয়া যায়না, মদীনায়ও নয়। ইতিমধ্যে আমি ইবনে যিয়াদকে চিঠি পাঠাই। আর আপনিও ইয়াযীদকে যা লিখতে চান সরাসরি লিখুন। হয়তো আমি ঝামেলা থেকে বেঁচে যাবো। আপনার ব্যাপারে আমাকে কোন বিপদে পড়তে হবে না।"

ইমাম হুসাইন (রা) এ প্রস্তাব গ্রহণ করলেন এবং উত্তরমুখী সড়ক ধরে সিরিয়ার নিনোয়ার অভিমুখে রওনা হলেন। তাঁর সাথে সাথে হুর ও চললো।

পথিমধ্যে বীযা নামক স্থানে তিনি পুনরায় একটা ভাষণ দিলেন। তিনি বললেন ঃ

"হে জনমন্ডলী, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, যদি কোন ব্যক্তি কোন অত্যাচারী, আল্লাহর নিষিদ্ধ জিনিসগুলোকে বৈধ আখ্যা দানকারী, আল্লাহকে দেয়া অংগীকার ভঙ্গকারী, রাসূলের সুন্নাহর বিরুদ্ধাচরণকারী এবং আল্লাহর বান্দাদের ওপর অন্যায়ভাবে ও জবরদস্তিমূলকভাবে শাসন পরিচালনাকারী শাসককে দেখতে পায় এবং তার প্রতি নিজের কথা ও কাজের মাধ্যমে বিরক্তি ও অসন্তোষ প্রকাশ না করে, তাহলে আল্লাহ সেই অত্যাচারী শাসকের সাথে সাথে তাকেও জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন। হে জনমন্ডলী, সাবধান হয়ে যাও। বর্তমান শাসক মন্ডলী শয়তানের আনুগত্য করে চলেছে এবং আল্লাহর আনুগত্য বর্জন করেছে। তারা দেশে অত্যাচার, অনাচার ও অরাজকতার বিস্তার ঘটিয়েছে এবং আল্লাহর ঘোষিত দন্ডবিধিকে (হুদুদ ও কিসাস) অকার্যকর করে

www.pathagar.com

রেখেছে। গনীমাতের (যুদ্ধলব্ধ) সম্পদে তারা নিজেদের অংশ বেশী নেয় এবং অন্যদেরকে কম দেয়। আল্লাহ যা নিষিদ্ধ করেছেন তাকে বৈধ এবং আল্লাহ যা বৈধ করেছেন তাকে নিষিদ্ধ করে রেখেছে । এ জন্য তাদের বিরোধিতা করার অধিকার আমার রয়েছে। আমার কাছে তোমাদের চিঠি এসেছে। দূতও এসে জানিয়েছে যে, তোমরা আমার পক্ষে বায়য়াত করেছ এবং তোমরা আমাকে অসহায়ভাবে ত্যাগ করবে না। তোমরা সেই বায়য়াত যদি রক্ষা কর, তাহলে সঠিক পথে পৌছতে পারবে। আমি হযরত আলীর (রা) ও নবী দুলালী ফাতেমার ছেলে হুসাইন। আমার জীবনের মূল্য তোমাদের জীবনেরই মত এবং আমার পরিবার পরিজনের জীবনের মূল্য তোমাদের পরিবার পরিজনের জীবনের সমান। আমার ব্যক্তিত্ব তোমাদের জন্য আদর্শ স্বরূপ। তোমরা যদি আমার সাথে কৃত বায়য়াত ও অংগীকার ভংগ কর, তবে আল্লাহর কসম, তোমাদের পক্ষে সেটাও অসম্ভব ও আশ্চর্যজনক কাজ হবে না। কেননা তোমরা ইতিপূর্বে আমার বাবা, আমার ভাই ও আমার চাচাতো ভাই মুসলিমের সাথে এমন কাজ করেছ। তোমাদের ধোকা যে খেয়েছে, সে ঠকেছে। তোমরা তোমাদের কর্মকান্ড দ্বারা একটা খারাপ দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছ। তবে মনে রেখ, যে ব্যক্তি অংগীকার ভঙ্গ করে, সে নিজের হাতে নিজেরই ক্ষতি করে। ইনশাআল্লাহ, শিগগিরই আল্লাহ আমাকে তোমাদের সাহায্যের মুখাপেক্ষিতা থেকে মুক্তি দেবেন। সকলের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক।"

হযরত হুসাইনের (রা) এই ভাষণ শুনে হুর বলে উঠলো ঃ "আমি আপনাকে আপনার নিজের ব্যাপারে আল্লাহকে স্মরণ করার আহবান জানাচ্ছি। সেই সাথে হুশিয়ার করে দিচ্ছি, আপনি যদি যুদ্ধে লিপ্ত হন, তবে আপনাকে অবশ্যই হত্যা করা হবে।"

হযরত হুসাইন (রা) বললেন ঃ "তুমি কি আমাকে মৃত্যুর ভয় দেখাচ্ছো? তোমাদের কপাল কি এতই পুড়েছে যে, আমাকে হত্যা করতেও কুণ্ঠিত হবে না? আমি বুঝতে পারছি না, তোমার হুমকি ও হুশিয়ারীর সমুচিত জবাব কিভাবে দেয়া উচিত। তবে আমি আপততত সেই জবাবটাই দিতে চাই, যা আওসের চাচাত ভাইরা রাসূল (সা) কে সাহায্য করতে যাওয়ার সময় তাদের ভাই আওসকে দিয়েছিল। আওস বলেছিল, "তোমরা রাসূল (সা) কে সাহায্য করলে তোমাদেরকে হত্যা করা হবে।' এ কথা শুনে তাদের একজন বলেছিল ঃ "মৃত্যু কোন মুমিনের জন্য লজ্জা ও সংকোচের বিষয় নয়, যদি তার নিয়ত বিশুদ্ধ থাকে, ইসলামের জন্য জেহাদ করতে সংকল্পবদ্ধ হয়ে জীবনকে বাজী রেখে সৎ লোকদের সহযোগী হয় এবং অপরাধী ও অভিশপ্ত লোকদের সংগ বর্জন করে। আমি যদি বেঁচে থাকি তবে আমাকে অনুতপ্ত হতে হবে না এবং যদি মারা যাই তবে আমার দুঃখের কোন কারণ থাকবে না। তবে হাঁ, তোমাদের জন্য সর্বাবস্থায়ই শুধু অপমান ও লাঞ্ছনাই সার হবে, চাই যতই আরাম আয়েশের জীবন যাপন কর না কেন।"

ইমাম হুসাইনের (রা) এ ভাষণে স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে যে, তিনি তার বাবা, ভাই ও চাচাত ভাই এর সাথে পুনঃ পুনঃ বিশ্বাসঘাতকতাকারীদের প্রতি পুনরায় আস্থা স্থাপন করতে গেলেন কেন? এর প্রথম জবাব তো তার ভাষণেই রয়েছে যে, তিনি তাদের

www.pathagar.com

কাছ থেকে এত বিপুল সংখ্যক চিঠি ও দূত মারফত প্রেরিত বার্তা পেয়েছিলেন যে, তাদের ভেতরে পরিবর্তন এসেছে বলে তার নিশ্চিত বিশ্বাস ও আস্থা জন্মেছিল। মানুষের হৃদয় তো আল্লাহর মুঠোর মধ্যেই থাকে এবং তাতে তিনি যে কোন সময় পরিবর্তন আনতে পারেন। হাদীসে যদিও এসেছে যে, মুমিন একই গর্তে দু'বার সাপের কামড় খায়না। কিন্তু আল্লাহর রহমত ও হেদায়াত থেকে হতাশ হওয়াও তো কবীরা গুনাহ এবং সেই রহমত ও হেদায়াত যে কোন মুহূর্তে যে কোন ঘৃণ্যতম কাফের, মোশরেক বা মোনাফেকের ভাগ্যেও জুটে যাওয়া বিচিত্র কিছু নয়। নচেত আবু জাহলের ছেলে ইকরামার মুসলিম বাহিনীর সেনাপতি হয়ে জেহাদ করা, হযরত হামযার হত্যাকারী ওয়াহশীর হাতে ভন্ড নবী মুসায়লামার নিহত হওয়া এবং হযরত হামযার কলিজা ভক্ষণকারীনী হিন্দার পক্ষে ইসলাম গ্রহণ করা কিভাবে সম্ভব হলো? দ্বিতীয় জবাব এই যে, একজন কৃষক যেমন তার চাষাধীন জমিতে বারবার ফসলহানি ঘটলেও তাতে ফসল জন্মানোর চেষ্টা ত্যাগ করে না, তেমনি হযরত হুসাইন (রা) শিশু ইসলামী রাষ্ট্রের সংস্কার ও সংশোধনের যে লক্ষ্য নিয়ে ময়দানে নেমেছিলেন, তাতে তার পূর্বসুরীরা ব্যর্থ হয়েছে বলে তিনি নিজের চেষ্টা সাধনা ত্যাগ করা সমীচীন মনে করবেন - এটা কখনো আশা করা যায় না।

ইমাম হুসাইনের (রা) ভাষণে হুরের মধ্যে অদ্ভুত ধরনের প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করলো। সে একটু দূরত্ব বজায় রেখে পৃথকভাবে চলতে লাগলো। উভয় দল যখন 'আযীবুল হিজানাত' নামক স্থানে উপনীত হলো, তখন কুফার দিক থেকে চারজন ঘোড়সওয়ারকে আসতে দেখা গেল। তাদের নেতা ছিলেন তারমাহ বিন আদী। তিনি উচ্চস্বরে নিম্নোক্ত কবিতা মুখে আওড়াচ্ছিলেন ঃ

"হে আমার উষ্ট্রী, তুমি ফজরের আগে থেকেই সাহসের সাথে রওনা হয়েছ। তুমি সর্বোত্তম পথিকদেরকে সর্বোত্তম সফরে নিয়ে চল, যতক্ষণ না সেই অতীব সম্ভ্রান্ত মহান সম্মানিত ব্যক্তির কাছে পৌছে না যাও, যিনি প্রশস্ত হৃদয়, উদার ও মহানুভব। আল্লাহ তাকে সর্বোত্তম কাজের উদ্দেশ্যে ডেকে এনেছেন।"

এই কবিতা শুনে ইমাম হুসাইন (রা) বুঝতে পারলেন, ওরা তাঁরই সমর্থক। তবে তিনি সুকৌশলে বললেন ঃ

"আমি আল্লাহর কাছ থেকে এটাই আশা করি যে, তিনি আমাদের সাহায্য করবেন -চাই তা শাহাদাতের দ্বারাই হোক কিংবা বিজয়ের মাধ্যমে হোক।"

হুর বিন ইয়াযীদ যখন দেখলো, ঘোড় সওয়াররা ইমাম হুসাইনের (রা) দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, তখন সে এগিয়ে এসে বললো ঃ "এরা কুফার অধিবাসী বিধায় তাদেরকে গ্রেফতার করা বা ফেরত পাঠানোর অধিকার আমার রয়েছে।"

ইমাম হুসাইন (রা) বললেন ঃ "আমি তাদেরকে নিজের জীবনের মত সংরক্ষণ করবো। কেননা তারা আমারই সমর্থক এবং আমার সাথে তাঁবুতে যারা রয়েছে তাদেরই

www.pathagar.com

সমমর্যাদাবান। হয় তুমি ইতিপূর্বে কৃত প্রতিশ্রুতি পালন করবে, নয়তো আমি তোমাদের সাথে যুদ্ধ করবো।"

এ কথা শুনে হুর পেছনে সরে গেল এবং চার ঘোড়সওয়ারের প্রতি আর কোন দৃষ্টি দিল না। হযরত হুসাইন (রা) তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ "তোমরা কুফাবাসীকে কী অবস্থায় দেখে এসেছ?"

এ প্রশ্নের জবাবে ঐ চার ঘোড় সওয়ারের একজন মুজাম্মা বিন উবাইদুল্লাহ আল আমেরী বললো ঃ

"কুফার গণ্যমান্য ব্যক্তিদেরকে আপনার বিরুদ্ধে মোটা দাগে ঘুষ দিয়ে কিনে ফেলা হয়েছে। ফলে তারা রাতারাতি আঙ্গুল ফুলে কলাগাছ হয়ে গেছে। এজন্য তারা সবাই আপনার বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ। তবে সাধারণ লোকদের মন আপনার দিকেই ঝুকে রয়েছে। তবে তারা কাল যখন তরবারী নিয়ে যুদ্ধ করতে আসবে, তখন আপনার বিরুদ্ধেই আসবে।"

তিনি তাদের কাছে তার দূত কায়েস বিন মিসহার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। জবাবে তারা তাঁর ঈমানী সাহস ও শাহাদাতের সমস্ত ঘটনা খুলে বললো। কায়েসের শাহাদাতের খবর শুনে হযরত হুসাইনের চোখে পানি এসে গেল। তিনি সূরা আহযাবের নিম্নোক্ত আয়াত পড়লেন ঃ

"তাদের মধ্য থেকে কেউ কেউ স্বীয় অংগীকার পূরণ করেছে এবং কেউ কেউ পূরণ করার অপেক্ষায় রয়েছে যে, কখন আল্লাহর পথে জীবনের নজরানা পেশ করবে। তাদের ঈমানী চেতনায় কোন পরিবর্তন ঘটেনি।" তারপর তিনি বললেন ঃ "হে আল্লাহ, আমাদের জন্য ও তাঁর জন্য জান্নাতের পথ খুলে দাও, নিজের রহমতের ছায়ায় আমাদেরকে ও তাদেরকে স্থান দাও এবং তাদেরকে বিপুল ছওয়াবের অংশীদার কর।"

তারমাহ বিন আদী বললো ঃ "আমি চারদিকে চোখ বুলিয়ে দেখছি। কিন্তু আপনার সাথে সংগী ছাড়া কোন বাহিনী দেখছিনা। হুরের যে সেনাদল আপনার সাথে লেগে রয়েছে, তারা যদি আপনাদের ওপর আকস্মিক হামলা চালায়, তাহলে আপনার কাফেলা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। আমি কুফা থেকে রওনা হবার আগে এত বড় বাহিনী দেখে এসেছি যে, কোন যুদ্ধের ময়দানেও আমি অত বড় বাহিনী কখনো দেখিনি। তারা সবাই আপনার বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য সমবেত হয়েছে। আমি আপনাকে আল্লাহর দোহাই দিয়ে বলছি, সম্ভব হলে আর এক বিঘতও সামনে এগুবেন না। আপনি যদি এমন কোন জায়গায় যেতে চান, যেখানকার লোকেরা আপনি কোন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ঘোষণা না করা পর্যন্ত আপনার রক্ষণাবেক্ষণ করবে, তাহলে আমাদের সাথে 'আযা' পাহাড়ে চলুন এবং সেখানে অবস্থান করতে থাকুন। এই পাহাড়ের সাহায্য নিয়ে আমরা কত গাসসানী ও হিময়ারী রাজাকে, নুমান বিন মুনাযরকে এবং বহু সাদা ও কালো আগ্রাসীর আগ্রাসনের থাবা রুখে দিয়েছি। যে ব্যক্তি আমাদের কাছে এসে অবস্থান করেছে, সে কখনো

www.pathagar.com

অপমানিত হয়নি। আপনি তাই গোত্রের বাজী ও সালামা শাখার লোকদেরকে সাহায্যের জন্য ডেকে দেখুন। দশদিনের মধ্যেই বিশ হাজার যোদ্ধাকে আপনার চার পাশে সমবেত দেখতে পাবেন। তারা এত বিশ্বস্ত যে, তারা সবাই মরে না যাওয়া পর্যন্ত আপনার শত্রুদেরকে আপনার কাছে ভিড়তে দেবেনা।"

হযরত হুসাইন (রা) জবাব দিলেন ঃ আল্লাহ তোমাকে ও তোমার গোত্রকে উত্তম পুরস্কার দান করুন। কিন্তু আমাদের সাথে হুরের একটা চুক্তি হয়েছে। এখন আমরা সে চুক্তি ভঙ্গ করতে পারিনা। আমরা এও জানিনা, আমাদের ও হুরের মধ্যকার সম্পর্ক কখন কিভাবে শেষ হবে। 'কাসরে বনী মুকাতেলে' পৌঁছে উভয় পক্ষ যাত্রা বিরতি করলো। ওখানে একটা তাঁবু খাটানো ছিল। হযরত হুসাইন (রা) বললেন ঃ "এ তাঁবু কার?" লোকেরা জানালো ঃ ওবায়দুল্লাহ বিন হুর জাহফীর তাঁবু। ইমাম হুসাইন (রা) বললেন ঃ "ওকে আমার কাছে নিয়ে এস।" হুসাইনের (রা) লোক যখন তাকে ডাকতে গেল তখন সে বললো ঃ

"আমি কুফা থেকে কেবল এ জন্যই চলে এসেছি যে, আমার উপস্থিতিতে সেখানে হুসাইন এসে বিপাকে পড়ুক, তা আমার মনোপুত ছিলনা। এখন আমি কিভাবে হুসাইনের কাছে যাবো?"

এ কথা শুনে হযরত হুসাইন (রা) নিজেই তার কাছে গেলেন এবং তাকে তার সংগী হবার আহবান জানালেন। সে বললো ঃ

"আল্লাহর কসম, আমি জানি, যে ব্যক্তি আপনার অনুসারী হবে, সে আখেরাতে সৌভাগ্যশালী হবে। কিন্তু আমি যদি আপনার কিছুটা সাহায্য করি, তথাপি আপনার সাফল্যের সম্ভাবনা খুবই ক্ষীণ।"

হযরত হুসাইন (রা) বললেন ঃ "তুমি যদি আমার সাহায্য নাও করতে পার, তবে এটুকু তো করতে পার যে, আমার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা থেকে বিরত থাকবে।"

সে বললো ঃ "আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, সেটাই হবে।"

রাতের শেষ ভাগে ইমাম হুসাইন (রা) তার কাফেলাকে রওনা হবার আদেশ দিলেন। কাফেলা 'কাসরে বনু মুকাতিল' থেকে যাত্রা শুরু করলো। ফজর হবার সাথে সাথে কাফেলাকে থামালেন এবং ফজরের নামায পড়ে নিলেন। নামাযের পর আবার যাত্রা শুরু হলো। তাঁর কাফেলা যখনই আরবের মরুভূমির দিকে চলতে চেষ্টা করে, হুর বিন ইয়াযীদ তাকে থামিয়ে দেয় এবং কুফার দিকে কাফেলার মুখ ঘুরিয়ে দেয়। চলতে চলতে তারা নিনোয়ায় পৌঁছলেন এবং সেখানে তাঁবু ফেলে যাত্রা বিরতি করলেন। নিনোয়ায় অবস্থানকালে একদিন জনৈক সশস্ত্র ঘোড়সওয়ারকে কুফার দিক থেকে আসতে দেখা গেল। সে যখন নিকটে পৌঁছলো, হযরত হুসাইনের (রা) দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিল, কিন্তু হুরকে অভিবাদন জানালো এবং তাকে ইবনে যিয়াদের একটা চিঠি দিল। চিঠিতে লেখা ছিল ঃ

www.pathagar.com

"আমার এই চিঠি ও আমার দূত তোমার কাছে পৌছামাত্রই হুসাইন (রা) ও তাঁর সাথীদেরকে যেখানেই পাও, সেখানেই থামিয়ে দাও, তারপর তাদেরকে এমন জায়গায় তাঁবু স্থাপনে বাধ্য কর, যেখানে পানি বা গাছপালা নেই। আমার এই দূত ততক্ষণ তোমার সাথে সাথে থাকবে, যতক্ষণ আমি নিশ্চিতভাবে জানতে না পারি যে, তুমি আমার দেয়া নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছ।"

হুর এই চিঠি পড়ার পর হযরত হুসাইন (রা) কে বললো ঃ "ইবনে যিয়াদ আমাকে এই নির্দেশও দিয়েছে, যেন আমি আপনাকে চার দিক থেকে ঘিরে রাখি এবং পানি ও গাছপালা আছে এমন কোন জায়গায় তাঁবু স্থাপন করতে না দেই। ইবনে যিয়াদ তার দূতকেও আদেশ দিয়েছে যেন আমি তার হুকুম অক্ষরে অক্ষরে পালন না করা পর্যন্ত আমার সাথে থাকে। এজন্য এখন আমি আপনাকে এখানে (নিনোয়ায়) অবস্থান করতে দেব না।"

হযরত হুসাইন (রা) বললেন ঃ "আমাদেরকে ছেড়ে দাও। আমরা নিজেদের ইচ্ছামত নিনোয়া অথবা অন্য কোথাও যাত্রা বিরতি করবো।"

হুর জবাব দিল ঃ "আমি সেটা করতে পারিনা। কারণ এই দূতকে আমার ওপর গোয়েন্দা হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছে।"

এই সময় যুহাইর বিন কাইন হুসাইনকে (রা) বললেন ঃ "আগামীতে যে ঘটনাবলী ঘটবে, তা বর্তমান ঘটনাবলীর চেয়েও ভয়াবহ হবে। হে রাসূলুল্লাহর দৌহিত্র, যারা আমাদের সামনে এখন রয়েছে, তাদের সাথে যুদ্ধ করা পরবর্তীতে যে বিশাল বাহিনীর সম্মুখীন হতে হবে, তার সাথে যুদ্ধ করার চেয়ে সহজতর। আমার জীবনের শপথ করে বলছি, পরবর্তী যে বাহিনীর সম্মুখীন আমাদেরকে হতে হবে, তার সাথে আমরা যুদ্ধ করতে পারবো না। আসুন, আমরা হুরের বাহিনীর সাথে যুদ্ধ করি।"

হযরত হুসাইন (রা) বললন ঃ "ইসলাম আমাকে প্রথম আক্রমণ করার অনুমতি দেয় না। তাই আমি প্রথম আক্রমণ করবো না।"

যুহাইর বললেন ঃ বেশ, আপনি এটা যদি না করতে পারেন, তাহলে অন্তত এতটুকু করুন যে, সামনে যে গ্রামটা দেখা যাচ্ছে, ওখানে অবস্থান গ্রহণ করুন। গ্রামটা বেশ সুরক্ষিত এবং ফোরাত নদীর কিনারে অবস্থিত। তারা যদি বাধা দেয়, তাহলে আমরা তাদের সাথে যুদ্ধ করবো।"

হযরত হুসাইন (রা) জিজ্ঞেস করলেন, "গ্রামটার নাম কী?"

খোঁজ নিয়ে জানা গেল, গ্রামটার নাম 'আকার'। (এর শাব্দিক অর্থ হত্যা ও যবাই)।

হযরত হুসাইন (রা) বললেন ঃ "হে আল্লাহ, আমি তোমার কাছ থেকে যবাই ও হত্যা থেকে পানাহ চাই।"

অগত্যা 'আকারে'ও অবস্থান করা হলো না। কাফেলা আরো সামনে এগিয়ে গেল। হুরও

www.pathagar.com

তাদের সাথে সাথেই ছিল। কিছুদূর এগিয়ে ফোরাতের কিনারে কারবালা নামক এক তরুলতাহীন উষর প্রান্তর দেখা গেল। এখানে পৌঁছা মাত্র হুর এগিয়ে এসে বললো ঃ

“এখন আমি আপনাকে আর সামনে অগ্রসর হতে দেবনা। আপনি কাফেলা সমেত এখানেই অবস্থান করবেন।” বাধ্য হয়ে তাঁর কাফেলা কারবালার প্রান্তরে তাঁবু স্থাপন করলো। দিনটা ছিল ৬১ হিজরীর ২রা মুহাররম, মোতাবেক ৬৮০ খৃষ্টাব্দের ২রা অক্টোবর।

পরদিন আমর বিন সা'দ চার হাজার সৈন্য নিয়ে কারবালায় এসে হাজির হলো। ইবনে যিয়াদ আমর বিন সা'দকে 'রায়' অঞ্চলের গভর্নর নিয়োগ করে দায়লামের বিদ্রোহীদেরকে দমন করতে পাঠিয়েছিল। কিন্তু 'রায়' অঞ্চলে পৌঁছিবার আগেই তাকে দূত মারফত খবর দিয়ে ফিরিয়ে আনা হয়। ইবনে যিয়াদ তাকে নির্দেশ দেয় যে, “আগে হুসাইনের সাথে লড়াই করতে যাও।” আমর বিন সা'দ হযরত হুসাইনের (রা) সাথে যুদ্ধ করতে ইচ্ছুক ছিল না। তাই কিছুটা ইতস্তত করেছিল। কিন্তু ইবনে যিয়াদ তাকে বললো ঃ “তুমি যদি হুসাইনের সাথে যুদ্ধ করতে না যাও, তাহলে তোমার 'রায়ে'র গভর্নরগিরি কেড়ে নেয়া হবে।' অবশেষে কিছুটা দ্বিধা দ্বন্দ্ব সত্ত্বেও সে রাযী হয়ে গেল এবং চার হাজার সৈন্য নিয়ে কারবালা পৌঁছে গেল। ইবনে যিয়াদ একমাত্র এই উদ্দেশ্যেই এই বাহিনীকে প্রস্তুত করে রেখেছিল। কারবালায় পৌঁছে সে উরওয়া ইবনে কাইস আল-আহমাসীকে আদেশ দিল ঃ “ইমাম হুসাইনের কাছে যাও এবং তাকে জিজ্ঞেস কর, উনি কি উদ্দেশ্যে এখানে এসেছেন।” উরওয়া ছিল ইমাম হুসাইনকে (রা) চিঠি দিয়ে আমন্ত্রণকারীদের একজন। এখন এই প্রশ্ন নিয়ে তাঁর কাছে যেতে তার লজ্জা বোধ হতে লাগলো। সে এ কাজ করতে অক্ষমতা প্রকাশ করল। সে অক্ষমতা প্রকাশ করার পর অন্যদেরকে এ কাজ করার আদেশ দেয়া হলো। কিন্তু তাদের প্রত্যেকে একই কারণে লজ্জা বোধ করতে লাগলো। তাদের প্রত্যেকেই ইমাম হুসাইনকে চিঠি লিখেছিল। তাই এখন তার সামনে যেতে কেউ সম্মত হলো না। অবশেষে আমর বিন সা'দ কুররা বিন সুফিয়ান হানযালীকে হযরত হুসাইনের (রা) কাছে পাঠাতে সম্মত করলো। সে কুররাকে বললো ঃ তুমি হুসাইনকে শুধু এটুকু জিজ্ঞেস করো যে, আপনার এখানে আগমনের উদ্দেশ্য কী?

কুররা হুসাইনের (রা) কাছে এসে ঐ প্রশ্নটা করলো।

ইমাম হুসাইন (রা) বললেন ঃ “তোমাদের শহরবাসী আমাকে ক্রমাগত চিঠি লিখে আমন্ত্রণ জানিয়েছে। সে জন্য এসেছি। এখন যদি আমার আগমন তোমাদের পছন্দ না হয়, তাহলে আমি মক্কায় ফিরে যাবো।”

আমর বিন সা'দ যখন হযরত হুসাইনের (রা) এই জবাব পেল, তখন সে স্বস্তি প্রকাশ করলো এবং বললো ঃ “আশা করি এখন আল্লাহ আমাকে হুসাইনের (রা) সাথে যুদ্ধ করা থেকে রক্ষা করবেন।”

www.pathagar.com

সে তৎক্ষণাত হুসাইনের (রা) জবাব ইবনে যিয়াদকে জানালো। ইবনে যিয়াদ আমর বিন সা'দের চিঠি পড়ে বললো ঃ

"হুসাইন (রা) এখন আমাদের জালে ধরা পড়ে বেরিয়ে যেতে চাইছে। কিন্তু এখন তো বেরিয়ে যাওয়ার আর সময় নেই।"

সে তৎক্ষণাত ইবনে সা'দকে লিখলো ঃ

"তোমার চিঠি পেয়েছি। তুমি যা কিছু লিখেছ, আমি ভালোভাবে হৃদয়ঙ্গম করেছি। তুমি হুসাইন (রা) ও তার সাথীদের সকলের কাছ থেকে ইয়াযীদের বায়য়াত (আনুগত্যের শপথ) গ্রহণ কর। তারা যদি বায়য়াত করে, তাহলে কী করা যায় পরে ভেবে দেখবো। ইতিমধ্যে হুসাইন (রা) ও তার সাথীদের জন্য ফোরাতের পানি ব্যবহার নিষিদ্ধ ও বন্ধ করে দাও, যেভাবে আমীরুল মুমিনীন হযরত উসমানের বাড়ীতে পানি বন্ধ করে দেয়া হয়েছিল।"

নির্দেশ মোতাবেক আমর বিন সা'দ সাতশো সশস্ত্র ঘোড়সওয়ারকে ফোরাতের কিনারে পাঠিয়ে দিল এবং সবাইকে কড়া আদেশ দিল যে, হুসাইন (রা), তার সাথীরা যেন এক ফোঁটাও পানি না পায়। আব্দুল্লাহ বিন আবিল হাসীন আযদী হযরত হুসাইন (রা) কে চিৎকার করে বললো ঃ "ওহে হুসাইন, তোমরা পানি দেখতে পাচ্ছ তো? দেখতেই থাক। পান করতে পাবেনা এক ফোঁটাও। পিপাসায় ছটফট করেই তোমরা মরবে।" বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে, বায়য়াত গ্রহণের নির্দেশের পাশাপাশি পানি বন্ধের এই নির্দেশও একই সাথে দেয়া হলো। এ দ্বারা আবারো প্রমাণিত হলো, ইবনে যিয়াদ ইমাম হুসাইনের (রা) বায়য়াত গ্রহণের চেয়ে তাকে সপরিবারে হত্যা করতেই বদ্ধপরিকর ছিল। নচেত সে শর্তহীনভাবে পানি বন্ধ করার নির্দেশ দিতনা। কেননা এতে ইমাম হুসাইন (রা) ও তার সংগীরা বুঝতে পারবেন, তাদের জন্য বায়য়াত করলেও যে পরিণতি, না করলেও সেই পরিণতি অপেক্ষা করছে।

হযরত হুসাইন (রা) ও তার সাথীরা পিপাসায় কাতর হয়ে পড়লে তিনি স্বীয় সৎ ভাই আব্বাসকে পানি আনতে পাঠালেন। আব্বাস ২০ জন পদাতিক ও ৩০ জন অশ্বারোহী নিয়ে ফোরাত নদীর কিনারে পৌঁছলেন। আমর বিন সা'দের সেনাদল তাদেরকে ঠেকানোর চেষ্টা করে বিফল হলো। তিনি মশক ভরে পানি নিয়ে তাঁবুতে ফিরে এলেন।

এরপর হযরত হুসাইন (রা) আমর বিন কারযা আনসারীর মারফত আমর বিন সা'দকে বার্তা পাঠালেন যে, "আজ রাতে তুমি নিভৃতে আমার সাথে সাক্ষাত কর।" রাতে আমর ও হযরত হুসাইন (রা) নিভৃত সাক্ষাতের জন্য নিজ নিজ তাঁবু থেকে বেরুলেন। উভয় বাহিনীর মাঝখানে দু'জনের মধ্যে দীর্ঘ সময় ধরে কথাবার্তা হলো। গভীর রাতে তারা নিজ নিজ বাহিনীর কাছে ফিরে এলেন। কিন্তু কী কথাবার্তা হলো তা কেউ জানলোনা।

উকবা ইবনে সাময়ান বলেন ঃ আমি হযরত হুসাইনের সাথে মদীনা থেকে মক্কা পর্যন্ত এবং মক্কা থেকে ইরাক পর্যন্ত ছিলাম। তাঁর শাহাদাতের দিন পর্যন্ত তাঁর সাথেই ছিলাম।

www.pathagar.com

শাহাদাতের সময় পর্যন্ত তিনি যতগুলো ভাষণ দিয়েছেন, আমি সেগুলোর সবই শুনেছি। সেসব ভাষণে তিনি একটা কথাই বারবার বলতেন ঃ

"আমাকে ছেড়ে দাও, যেখান থেকে এসেছি সেখানে চলে যাই। অথবা আমাকে আর কোথাও যেতে দাও। আল্লাহর পৃথিবী খুবই প্রশস্ত। জনগণ একটা সিদ্ধান্তে না আসা পর্যন্ত আমাকে অন্য কোথাও চলে যেতে দাও।"

প্রথম সাক্ষাতের পর হযরত হুসাইন (রা) ও আমর ইবনে সা'দ আরো তিন চারবার সাক্ষাত করেন। অবশেষে আমর ইবনে যিয়াদকে চিঠি লিখলো ঃ

"আল্লাহর শোকর, তিনি গোলযোগ থামিয়ে দিয়েছেন, বিবাদ-বিসম্বাদ মিটিয়ে দিয়েছেন এবং ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত করে দিয়েছেন। হুসাইন (রা) আমার কাছে এই তিনটে কাজের যে কোন একটা করার অংগীকার করেছেন ঃ

১. তিনি যেখান থেকে এসেছেন সেখানে চলে যাবেন, অথবা

২. মুসলমানদের এমন কোন সীমান্তে চলে যাবেন, যেখানে তার যাওয়াতে আমাদের আপত্তি নেই, অথবা

৩. ইয়াযীদের কাছে যেয়ে নিজেই তার বিবাদ মিটিয়ে ফেলবেন। আশাকরি আপনি এই প্রস্তাবগুলো পছন্দ করবেন। কেননা এতে মুসলিম উম্মাহর কল্যাণ নিহিত।"

ইবনে যিয়াদ এই চিঠি পড়ে অভিভূত হলো। সে বললো ঃ "এ চিঠি এমন ব্যক্তির কাছ থেকে এসেছে যে নিজের আমীরের হিতাকাংখী এবং নিজের জাতির প্রতি সহানুভূতিশীল। আমি এ প্রস্তাবগুলো মেনে নিচ্ছি।"

এ সময় ইবনে যিয়াদের কাছেই ছিল শিমার ইবনে জিল জাওশান। সে তড়াক করে উঠে দাঁড়ালো ও বললো ঃ

"এমন একটা মোক্ষম সময়ে আপনার এসব প্রস্তাব মেনে নেয়া কি সমীচীন হবে, যখন হুসাইন (রা) আপনার মুঠোর ভেতরে এসে পড়েছে? আল্লাহর কসম, আজ যদি হুসাইন হাতছাড়া হয়ে যায়, এবং সে আপনার বশ্যতা স্বীকার না করে, তবে সে পরবর্তীতে অবশ্যই ক্ষমতা ও প্রতিপত্তির অধিকারী হবে এবং আপনি দুর্বল ও অক্ষম হয়ে যাবেন। আপনি তাকে এই ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি লাভের অবকাশ দেবেন না। আপনি তাকে শাস্তি দিতে চাইলেও সে অধিকার আপনার থাকবে, আর ক্ষমা করতে চাইলেও সে অধিকার থাকবে। আমি শুনেছি, হুসাইন ও আমর সারা রাত উভয় বাহিনীর মাঝখানে বসে গোপনে আলাপ-আলোচনা করে।"

ইবনে যিয়াদ বললো ঃ "তাইতো। তুমি তো ঠিক কথাই বলেছ। আমি তো একটা মারাত্মক ভুল করতে যাচ্ছিলাম। তুমি এই চিঠি নিয়ে আমর বিন সা'দের কাছে চলে যাও এবং হুসাইন ও তার সাথীদেরকে আমাদের কাছে আত্মসর্পণ করতে বল। তারা এতে রাযী হলে তাদেরকে নিরাপত্তা সহকারে আমার কাছে পাঠিয়ে দাও, আর তা নাহলে তাদের সাথে যুদ্ধ কর। আর আমর যদি আমার হুকুম বাস্তবায়নে প্রস্তুত হয় তবে তুমিও

www.pathagar.com

তার আনুগত্য কর। কিন্তু যদি অস্বীকার করে, তবে তাকে সেনাপতিত্ব থেকে হটিয়ে দিয়ে নিজেই সেনাপতির দায়িত্ব গ্রহণ কর এবং আমরের শিরোচ্ছেদ করে তার মাথা আমার কাছে পাঠিয়ে দিও।"

ইবনে সা'দের নামে ইবনে যিয়াদ যে চিঠি পাঠায়, তাতে লেখা ছিল ঃ

"আমর বিন সা'দ, আমি তোমাকে এজন্য পাঠাইনি যে, তুমি হুসাইন (রা) কে নমনীয়তা দেখিয়ে যাবে এবং তার সম্পর্কে নানাবিধ সুপারিশ পেশ করবে। তুমি হুসাইন ও তার সাথীদেরকে বিনা শর্তে আত্মসমর্পণ করতে বল। যদি তারা বিনা শর্তে আত্মসমর্পণ করে, তাহলে তাদের সকলকে নিরাপদে আমার কাছে পাঠিয়ে দাও। আর যদি না করে, তবে তৎক্ষণাত তাদেরকে হত্যা করে সকলের লাশ বিকৃত কর। কেননা এটাই তাদের সমুচিত শাস্তি। হুসাইনকে (রা) হত্যা করার পর তার লাশের ওপর ঘোড়া দাবড়ে দিয়ে পদদলিত করে দিও। কেননা সে বিদ্রোহী, মুসলমানদের সমাজে বিভেদ সৃষ্টিকারী এবং অত্যাচারী। তুমি আমার এ হুকুম বাস্তবায়িত করলে আমি তোমাকে মূল্যবান পুরস্কারে ভূষিত করবো। আর যদি তা করতে না পার তাহলে সেনাপতির দায়িত্ব শিমার বিন যিল জাওশনের হাতে অর্পণ করে তুমি পদত্যাগ কর। ওয়াসসালাম।"

শিমার যখন ইবনে যিয়াদের এই চিঠি আমর বিন সা'দকে এনে দিল, তখন চিঠি পড়ে আমর বললো ঃ "তোমাকে ধিক্কার, আর যে জিনিস তুমি আমার কাছে এনেছ তাকেও ধিককার, আল্লাহর কসম, আমার মনে হচ্ছে, আমি ইবনে যিয়াদকে যা লিখেছি, তা গ্রহণ করতে তাকে তুমিই নিষেধ করেছ। আমি একটা আপোস মিমাংসার আশা করেছিলাম। কিন্তু তুমি সে আশা নস্যাত করে দিয়েছ। আল্লাহর কসম, হুসাইন কখনো আত্মসমর্পনে রাজী হবে না। কেননা তার বুকের ভেতরে আত্মসমম্মানবোধ সম্পন্ন একটা হৃদয় রয়েছে।"

শিমার বললো ঃ "তুমি কী করতে চাও, সেটা আমাকে বলে দাও। তুমি কি গভর্নরের আদেশের আনুগত্য করবে এবং শত্রুর বিরুদ্ধে লড়বে? আর যদি তোমার লড়বার ইচ্ছা না থেকে থাকে, তাহলে সেনাবাহিনীর নেতৃত্ব আমার হাতে সমর্পণ কর।"

আমর বিন সা'দ অনন্যোপায় হয়ে বললো ঃ "গভর্নরের আদেশ মান্য করে আমি হুসাইন (রা) ও তার সাথীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবো। তুমি পদাতিক বাহিনী পরিচালনা কর।"

ইবনে সা'দ ৯ই মুহাররম বিকালে যুদ্ধের প্রস্তুতি শুরু করলো। হযরত আলীর স্ত্রী উম্মুল বানীন বিনতে হারাম ছিল শিমারের ফুফু।

উম্মুল বানীনের উদরজাত চার ছেলে আব্বাস, জাফর, আবদুল্লাহ ও উসমান হযরত হুসাইনের কাফেলার অন্তর্ভুক্ত ছিল। শিমার তার এই চার ফুফাতো ভাই এর জীবনের নিরাপত্তা আগেই চেয়ে নিয়েছিল ইবনে যিয়াদের কাছ থেকে। যুদ্ধ শুরু হবার আগে শিমার এই চারজনকে ডাকলো এবং বললো ঃ "আমি তোমাদের জন্য ইবনে যিয়াদের কাছ থেকে প্রাণভিক্ষা চেয়ে নিয়েছি।" তারা জবাব দিলেন ঃ

www.pathagar.com

"তোমার এবং তোমার প্রাণভিক্ষার ওপর আল্লাহর অভিসম্পাত! তুমি আমাদের জীবনের নিরাপত্তা দিচ্ছ, অথচ রাসূল (সা) এর নাতির জন্য নিরাপত্তা দিচ্ছনা? অমন নিরাপত্তার আমাদের কোন প্রয়োজন নেই।"

৯ই মুহাররম তারিখেই ইবনে সা'দ কয়েক ব্যক্তিকে সাথে নিয়ে হযরত হুসাইনের (রা) শিবিরের দিকে এগিয়ে গেল। হযরত হুসাইন (রা) বগলে তলোয়ার ঝুলিয়ে রেখে বসে বসে হাটুর ওপর মাথা রেখে ঘুমাচ্ছিলেন। তাঁর বোন যয়নব বাইরে লোকজনের শব্দ শুনে তাকে জাগিয়ে দিলেন। ভাই আব্বাস এসে হযরত হুসাইনকে (রা) বললো ঃ "বাইরে ইবনে সা'দ দাঁড়িয়ে আছে। আপনার সাথে দেখা করতে চায়।" হুসাইন (রা) বাইরে যাওয়ার উদ্যোগ নিতেই আব্বাস বললেন ঃ "আপনি এখানেই থাকুন। আমি নিজে যেয়ে তাঁর সাথে কথাবার্তা বলে আসি।" আব্বাস যুহাইর বিন কাইল ও হাবিব বিন মুযাহের সহ বিশজন ঘোড় সওয়ারকে সাথে নিয়ে ইবনে সা'দের কাছে এল এবং তার আগমনের উদ্দেশ্য কি জানতে চাইল। ইবনে সা'দের সংগীরা জবাব দিল ঃ

"সেনাপতি এসেছেন এই চরমপত্র দিতে যে, হযরত হুসাইন যেন বিনাশর্তে আত্মসমর্পণ করেন অথবা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে যান।" আব্বাস বললেন ঃ "আচ্ছা, একটু অপেক্ষা করুন। আমি হুসাইনকে আপনাদের আগমনের উদ্দেশ্য জানাই এবং তার জবাব কি জেনে আসি।"

আব্বাস চলে গেলেন হুসাইনের তাঁবুতে। এই অবসরে আব্বাসের সাথীরা ইবনে সা'দের লোকদের সাথে কথাবার্তা বলতে লাগলো এবং তাদেরকে আল্লাহর ভয় দেখাতে লাগলো।

আব্বাস যখন ইমাম হুসাইন (রা) কে ইবনে সা'দের বার্তা পৌছালেন, তখন হুসাইন (রা) বললেন ঃ ইবনে সা'দের কাছে যাও এবং সম্ভব হলে তার কাছ থেকে কাল পর্যন্ত সময় নাও। রাতে আমরা আল্লাহর ইবাদত, দোয়া ও ইস্তেগফার করে নেই। আল্লাহ তায়ালা জানেন, নামায পড়া, কুরআন তেলাওয়াত করা ও বেশী করে তওবা ইস্তিগফার করা আমার কত প্রিয়।"

হযরত আব্বাস ইবনে সা'দের কাছে গেলেন এবং তাকে বললেন ঃ "তোমরা আপাতত ফিরে যাও। আমরা রাতের বেলা তোমাদের দাবী নিয়ে ভেবে দেখবো। সকাল বেলা চূড়ান্ত জবাব দেব ইনশায়াল্লাহ। দাবী যদি মানতে হয় মেনে নেব। আর প্রত্যাখ্যান করতে হলে প্রত্যাখ্যান করবো।"

ইবনে সা'দ শিমারকে জিজ্ঞেস করলো ঃ তোমার মত কী?

শিমার বললো ঃ আপনি সেনাপতি। যা ভালো মনে করেন, করুন।

ইবনে সা'দ তার অন্যান্য সহকর্মীদেরও মতামত জেনে নিল যে, কী করা উচিত।

আমর বিন হাজ্জাজ যুবাইদী বললো ঃ "সুবহানাল্লাহ! এতো নবী পরিবারের ব্যাপার।

www.pathagar.com

দায়ালামের যে বিদ্রোহীদের দমন করতে আপনাকে পাঠানো হচ্ছিল, তারাও যদি আপনার কাছে এতটুকু সময় চাইতো, তাহলে আপনার তো তাদেরকেও তা দেয়া উচিত ছিল।"

কায়েস বিন আশয়াছ বললো ঃ "আপনি ওদেরকে সময় দিন। তবে একথা সত্য যে, ওরা কোন অবস্থাতেই আত্মসমর্পণ করবে না এবং আপনার সাথে যুদ্ধ করতে ময়দানে বেরিয়ে আসবেই।

সংগীদের কাছ থেকে মতামত নেয়ার পর ইবনে সা'দ আব্বাসকে বললো ঃ তোমাদের আবেদনক্রমে আমরা কাল পর্যন্ত সময় দিলাম।" এই বলে সে নিজ শিবিরে ফিরে এল। ইবনে সাদের চলে যাওয়ার পর ইমাম হুসাইন (রা) তার সকল সাথীকে একত্রিত করলেন এবং নিম্নোক্ত ভাষণ দিলেন ঃ

"সবপ্রথম আল্লাহর প্রশংসা করছি এবং দুর্যোগ ও শান্তি উভয় অবস্থায় আল্লাহর শোকর আদায় করছি। হে আল্লাহ! আমি এজন্য তোমার প্রশংসা করি যে, তুমি আমাদের পরিবারকে নবুয়তের মত নিয়ামত দান করেছ, তোমার বানী শোনার জন্য আমাদেরকে কান দিয়েছ, তোমার নিয়ামতগুলো দেখার জন্য চোখ দিয়েছ, এবং চিন্তাগবেষণা করার জন্য হৃদয় দিয়েছ। তুমি আমাদেরকে কুরআনের জ্ঞান দিয়েছ, এবং ইসলামের চেতনা দান করেছ। এখন তুমি আমাদেরকে তোমার কৃতজ্ঞ বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত কর। আমি আমার সাথীদের মত অনুগত ও সৎ সাথী আর কোথাও দেখিনি এবং আমার আত্মীয় স্বজনের মত পুণ্যবান স্বজনসেবক আত্মীয় আর কোথাও দেখিনি। হে আল্লাহ, তুমি এদের সবাইকে উত্তম প্রতিদান দিও।"

"প্রিয় সাথীরা, তোমরা আমাদের সাথে সব সময় ভালো আচরণ করেছ এবং আমাদেরকে সাহায্য করেছ। কালকের দিন আমার ও আমার শত্রুদের মাঝে চূড়ান্ত নিষ্পত্তির দিন। তাদের প্রয়োজন শুধু আমাকেই। তাই তোমাদের সবাইকে আমি সানন্দে ফিরে যাওয়ার অনুমতি দিচ্ছি। আমার পক্ষ থেকে তোমাদের ওপর কোন অভিযোগ থাকবে না। অনেক রাত হয়েছে। আমার পরিবার পরিজনকে সাথে নিয়ে তোমরা অন্ধকারে এদিক ওদিক চলে যাও এবং নিজেদের জীবনকে অনিবার্য ধ্বংসের কবল থেকে রক্ষা কর।" ;

এ ভাষণ শুনে ইমাম হুসাইনের (রা) ভাইয়েরা, ছেলেমেয়েরা, ভাইপো ও ভাইঝীরা এবং আপন জনেরা সবাই সমস্বরে বলে উঠলো ঃ "আপনার পরে আমাদের জীবিত থেকে লাভ কী? এমন অশুভ দিনের জন্য আল্লাহ যেন আমাদেরকে বাঁচিয়ে না রাখেন, যেদিন এই পৃথিবীতে আমরা থাকবো, অথচ আপনি থাকবেন না।"

সর্বপ্রথম আকীলের সন্তানরা বললো ঃ

"আল্লাহ না করুন, আপনাকে রেখে আমরা যদি চলে যাই, তবে মানুষের কাছে কী জবাব দেব? তাদেরকে আমরা কোন্ মুখে বলবো যে, আমাদের নেতা, আমাদের অভিভাবক এবং আমাদের প্রিয় চাচাতো ভাইকে শত্রুর মুখে একাকী রেখে চলে

www.pathagar.com

এসেছি? তাকে রক্ষা করার জন্য আমরা একটা তীরও ছুড়িনি, একটা বর্শাও চালাইনি, তরবারীর একটা কোপও মারিনি এবং তার ভাগ্যে কী ঘটেছে তাও জানিনা - এ কথা আমরা কেমন করে বলবো? আল্লাহর কসম, এমন কাজ আমরা কিছুতেই করবো না। আমরা আমাদের জান, মাল, সন্তানসন্ততি - সব কিছু আপনার জন্য বিসর্জন দেব। আপনার সাথে থেকে শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই করবো। আপনার যে পরিণতি হবে, আমাদেরও তাই হবে। আপনার পর আমাদেরকে যেন আল্লাহ্ জীবিত না রাখেন।"

মুসলিম বিন আওসাজা দাড়িয়ে ভাষণ দিলেন ঃ

"এও কি সম্ভব যে, আমরা আপনাকে রেখে চলে যাবো, আর আল্লাহর সামনে ইনিয়ে বিনিয়ে আপনার প্রতি আমাদের কর্তব্য পালন না করার ওজুহাত দেখাবো? আল্লাহর কসম। শত্রুর বুকে সব কটা বর্শা ঢুকিয়ে না দেয়া পর্যন্ত এবং আমার হাতের তরবারী যতক্ষণ কার্যক্ষম থাকে ততক্ষণ তা দিয়ে সর্বোচ্চ সংখ্যক শত্রুকে নিপাত না করা পর্যন্ত আমি আপনার সংগ ত্যাগ করবোনা। আমার সমস্ত অস্ত্র চালাতে চালাতে যদি ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যায়, তবে আমি তাদের ওপরে পাথর ছুড়ে মারতে শুরু করবো - যতক্ষণ না মৃত্যু এসে আমাকে নিথর ও নিস্তব্ধ করে না দেয়।"

ইমাম হুসাইনের (রা) অন্যান্য সাথীরাও এক এক করে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা করে তাঁর প্রতি নিজেদের অটল ভক্তিশ্রদ্ধা ও সর্বস্ব উৎসর্গ করার মনোভাব ব্যক্ত করলো। হযরত হুসাইন (রা) সাথীদের এই আবেগ অনুভূতি দেখে চমৎকৃত ও অভিভূত হলেন এবং যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণের জন্য নির্দেশ দিলেন।

ইমাম হুসাইনের (রা) ছেলে যয়নুল আবেদীন বর্ণনা করেন ঃ

যেদিন আমার বাবা শহীদ হলেন, তার পূর্ববর্তী রাতে আমি রোগাক্রান্ত ছিলাম। আমার ফুফু যয়নব আমার সেবা শুশ্রূষা করছিলেন। তাঁবুর ভেতরে হযরত আবু যর গিফারীর ভৃত্য জাওয়ীন ইমাম হুসাইনের (রা) তরবারী পরিষ্কার করছিল আর হুসাইন (রা) নিম্নোক্ত কবিতা আবৃত্তি করছিলেন ঃ

"হে মহাকাল, তোমার ওপর আক্ষেপ। তুমি বড়ই অবিশ্বস্ত বন্ধু। সকাল বিকাল কত লোক তোমার হাতে মারা যাচ্ছে। মহাকাল কাউকে খাতির করে না এবং কারো কাছ থেকে কোন উৎকোচও গ্রহণ করেনা। এখন সব কিছু আল্লাহর হাতে। প্রত্যেক সজীব প্রাণী মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চলেছে।"

এই কবিতাগুলোকে তিনি দু'তিনবার পুনরাবৃত্তি করলেন। এগুলো তিনি কী উদ্দেশ্যে পড়ছিলেন, তা আমি বিলক্ষণ বুঝেছি। তবু আমি চুপ করে থাকলাম। কিন্তু আমার ফুফু যয়নব এ কবিতা শুনে স্থির থাকতে পারলেন না। তিনি ঝড়ের বেগে বাবার কাছে ছুটে এসে তাকে জড়িয়ে ধরে বলতে লাগলেন ঃ

"আজ যদি মৃত্যু আমার জীবনের সমাপ্তি ঘটাতো, তাহলেই ভালো হতো। আমার মা ফাতেমা আমাকে রেখে চলে গেছেন। আমার বাবা হযরত আলী (রা) দুনিয়া ছেড়ে চলে

www.pathagar.com

গেছেন। আমার ভাই হাসান বিদায় হয়ে গেছেন। এই অতিক্রান্ত ব্যক্তিবর্গের উত্তরাধিকারী এবং আমাদের প্রহরী তুমি একাই রয়েছ।"

হযরত হুসাইন (রা) তার দিকে তাকিয়ে বললেন ঃ

"হে বোন, তুমি তোমার ধৈর্য ও গাম্ভীর্যকে বিসর্জন দিয়ে শয়তানকে তুষ্ট করোনা।"

ফুফু বললো, "আপনি কি নিজেকে আমার কাছ থেকে দূরে দূরে রাখতে চাইছেন, ভাইজান? আল্লাহর কসম, আপনার এই হাবভাব দেখে আমার হৃদয় টুকরো টুকরো হয়ে যাচ্ছে।" এই বলে তিনি বেহুশ হয়ে পড়ে গেলেন।

আমার বাবা তার মুখে পানি ছিটিয়ে দিলে হুশ ফিরে এল। তখন বাবা তাকে বললেনঃ

"শোন, বোন, আল্লাহকে ভয় কর এবং আল্লাহর কাছ থেকে সান্ত্বনা অর্জন কর। ভালো করে জেনে নাও, পৃথিবীর অধিবাসীরা সবাই একদিন মরে যাবে। আকাশের অধিবাসীরাও একদিন মরে যাবে, একমাত্র আল্লাহই চিরঞ্জীব। আর সব কিছুই ধ্বংস হয়ে যাবে। আমার বাবা হযরত আলী আমার চেয়ে ভালো ছিলেন। আমার মা ফাতেমা আমার চেয়ে ভালো ছিলেন। আমার ভাই হাসানও আমার চেয়ে ভালো ছিলেন। আমার ও প্রত্যেক মুসলমানের জন্য রাসূল (সা) উত্তম আদর্শ। তুমি সেই আদর্শ মানবের কাছ থেকে ধৈর্য শেখ।"

তারপর বললেন ঃ "হে আমার বোন, আমি তোমাকে আল্লাহর দোহাই দিয়ে বলছি, আমার মৃত্যুর পর পরনের কাপড় ছিড়ে, চেহারা নখ দিয়ে আঁচড়ে ও আহাজারী করে মাতম করোনা।"

তারপর তিনি বাইরে এলেন। সঙ্গীদেরকে আদেশ দিলেন, যেন ইতস্তত বিক্ষিপ্ত তাঁবুগুলোকে এক জায়গায় গুটিয়ে আনা হয়। সকাল বেলা এমনভাবে আক্রমণ চালাতে হবে যেন তাদের তাঁবুগুলো তাদের ডানে বামে ও পেছনে থাকে এবং শত্রুরা তাঁবুর ওপর আক্রমণ করতে না পারে। এই আদেশ দিয়ে তিনি নিজের তাঁবুতে ফিরে এলেন এবং সারা রাত নামায পড়ে ও দোয়া ইস্তিগফার করে কাটালেন। তাঁর সাথীরাও সারা রাত নামায ও দোয়া ইসতিগফারে মশগুল রইলেন। শত্রুর ঘোড়সওয়ার প্রহরীরা সারা রাত তাবুগুলোর চার পাশে টহল দিতে লাগলো যাতে কেউ পালিয়ে যেতে না পারে।

www.pathagar.com

রক্তস্নাত কারবালা

অতপর ১০ই মুহাররমের সকালে একটা লাল সূর্য উঠলো রক্তিমাভ পূর্ব দিগন্তে। ফজরের নামাযের পর হযরত হুসাইন (রা) তাঁর সাথীদেরকে সারিবদ্ধ করে দাঁড় করালেন। মাত্র ৩২ জন ঘোড় সওয়ার ও চল্লিশজন পদাতিক নিয়ে গঠিত তার ক্ষুদ্র বাহিনী। ডান দিকে যুহাইর বিন কাইন এবং বাম দিকে হাবীব বিন মুযাইর নিজ নিজ দলের অধিনায়ক নিযুক্ত হলেন। পতাকা দিলেন ছোট ভাই আব্বাসের হাতে। বাহিনীকে এভাবে সাজানো হলো যে, তাঁবুগুলো পেছনে রইল। আর পেছনের দিকটাকে অধিকতর নিরাপদ করার জন্য হযরত হুসাইন (রা) নির্দেশ দিলেন পরীখা সদৃশ গভীর গর্তগুলোতে আগুন জ্বালিয়ে দিতে, যাতে শক্ররা পেছন দিক দিয়ে আক্রমণ চালাতে না পারে।

ওদিকে আমর বিন সা'দ তার চার হাজারের মত সৈন্য বিশিষ্ট বিশাল বাহিনীকে ডান দিকে আমর বিন হুজ্জাজ যুবাইদ বাম দিকে শিমার বিন যিল জাওশানের, ঘোড় সওয়ার বাহিনীকে উরওয়া বিন কায়েস আল-আহসামীর এবং পদাদিক বাহিনীকে শীস বিন রাবয়ীর অধিনায়কত্বে যুদ্ধ সাজে সজ্জিত করলো। আর পতাকাবাহী হিসাবে নিযুক্ত করলো নিজের ক্রীতদাস দাবীদকে।

যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগে হযরত হুসাইন (রা) শত্রু বাহিনীর উদ্দেশ্যে একটা মর্মস্পর্শী ভাষণ দিলেন। আল্লাহর প্রশংসা ও নবীর প্রতি দরুদ পাঠান্তে তিনি বললেন ঃ

"হে জনমন্ডলী, তাড়াহুড়ো করোনা। আগে আমার কয়েকটা কথা শোন। তোমাদেরকে বুঝানোর যে অধিকার আমার রয়েছে, সেটা প্রয়োগ করার সুযোগ দাও এবং আমার আগমনের কারণটাও শুনে নাও। আমার যুক্তি যদি তোমরা মেনে নাও এবং আমার প্রতি যদি সুবিচার কর, তাহলে তোমরা অত্যন্ত সৌভাগ্যশালী মানুষ বলে পরিগণিত হবে। কিন্তু সে জন্য তোমরা যদি প্রস্তুত না হও। তাহলে সেটাও তোমাদের ইচ্ছা। তোমরা সবাই মিলে সর্বশক্তি নিয়োগ করে আমার সাথে যে আচরণ করতে চাও করে নিও। আল্লাহই আমার একমাত্র সহায়। তিনিই তার সৎ বান্দাদেরকে সাহায্য করে থাকেন।"

হযরত ইমাম হুসাইনের (রা) এ কথাগুলো যখন তাঁর বোন ও মেয়েরা শুনলো তখন দুঃখে ও মর্মবেদনায় তাদের মধ্যে কান্নার রোল পড়ে গেল। তাদের কান্নার শব্দ শুনতে পেয়ে হযরত হুসাইন (রা) তার ভাই আব্বাসকে পাঠালেন তাদেরকে চুপ করাতে। আর মনে মনে বললেন ঃ "এখনো তো তাদের অনেক কান্না বাকী।"

কান্নার আওয়ায থেমে গেলে তিনি পুনরায় তার অসমাপ্ত ভাষণ শুরু করলেন ঃ

"জনমন্ডলী, তোমরা আমার বংশ পরিচয় ও মানমর্যাদার দিকটা বিবেচনা কর যে আমি কে। নিজেদের বিবেকের কাছে জিজ্ঞেস কর, আমাকে হত্যা করা বা অপমান করা কি তোমাদের শোভা পায়? আমি কি তোমাদের নবী, নবীকুল শিরোমনি মুহাম্মাদ (সা) এর

www.pathagar.com

দৌহিত্র এবং তাঁর চাচাতো ভাই আলীর (রা) ছেলে নই যিনি সবার আগে কিশোর বয়সেই তাঁর দাওয়াতে সাড়া দিয়ে ঈমান এনেছিলেন। শহীদদের সরদার হযরত হামযা কি আমার পিতার চাচা ছিলেন না? হযরত জাফর তাইয়ার কি আমার চাচা ছিলেন না? রাসূলুল্লাহর (সা) সেই উক্তিটা কি তোমাদের মনে নেই, যাতে তিনি আমাকে ও আমার ভাই হাসানকে বেহেশতের যুবকদের নেতা বলেছেন? আমার এ বর্ণনা অকাট্য সত্য। কেননা আমি যেদিন শুনেছি, মিথ্যাবাদীর ওপর আল্লাহ অসন্তুষ্ট হন, সেদিন থেকে আজ পর্যন্ত কখনো মিথ্যা বলিনি। আর এ কথা যখন সত্য, তখন তোমরাই বল, নগ্ন তরবারী নিয়ে আমার ওপর আক্রমণ চালানো কি তোমাদের উচিত? আর যদি আমাকে তোমরা মিথ্যাবাদী মনে কর, তাহলে এখনো তোমাদের ভেতরে এমন অনেকে জীবিত আছে, যারা আমার সম্পর্কে রাসূল (সা) এর এ হাদীস শুনেছে। তোমরা তাদের কাছে জিজ্ঞেস করতে পার। আমি তোমাদের কাছে জানতে চাই যে, এই হাদীসের উপস্থিতিতেও কি তোমরা আমার রক্ত ঝরানো থেকে বিরত থাকতে পার না?"

তারপর ইমাম হুসাইনের (রা) কোন কোন সহকর্মীও অনুরূপ ভাষণ দিলেন। কিন্তু শিমার ও তার সমমনা লোকেরা ইমাম হোসাইনের (রা) সাথে যুদ্ধ করার চূড়ান্ত সিদ্ধান্তই নিয়ে ফেলেছিল। কেননা যে বাহিনীর সৈন্য সংখ্যা একশোরও কম তার সাথে চার হাজারী বাহিনীর লড়াই বিপক্ষকে নিশ্চিহ্ন করার এমন এক নজীরবিহীন সুবর্ণ সুযোগ, যাকে হাতছাড়া করা কোনমতেই বুদ্ধিমানের কাজ নয়। এতে হুসাইনকে (রা) সবংশে খতমও করা যাবে, আবার সম্ভাব্য গণঅসন্তোষকে এই বলে ধামাচাপাও দেয়া যাবে যে, হুসাইনকে (রা) সরাসরি হত্যা করা হয়নি, যুদ্ধের মাধ্যমে তাকে পরাজিত ও নিহত করা হয়েছে। তারা হযরত হুসাইনের (রা) এ প্রস্তাবও প্রত্যাখ্যান করে যে, তাকে ইয়াযীদের কাছে নিয়ে যাওয়া হোক। তিনি নিজেই তার সাথে বিরোধ মিটিয়ে ফেলবেন। কেননা তিনি আশা করতেন যে, ইয়াযীদ তার প্রতি সম্মান দেখাবে। কিন্তু শিমার ও তার সমমনারা দেখলো, রাসূলুল্লাহর (সা) নাতিকে খতম করার এমন সুযোগ হয়তো আর আসবেনা। উনি বেঁচে থাকলে হয়তোবা একদিন খেলাফতে অধিষ্ঠিত হয়ে যাবেন। এই সব সাত পাঁচ ভেবে তারা স্থির করলো, কোন ক্রমেই এ সুযোগ হাতছাড়া করা যাবে না।

বিরোধীদের বাহিনীতে এ সময় মাত্র এক ব্যক্তি এমন ছিল যার মনে হযরত হুসাইনের (রা) ভাষণ কিছুটা প্রভাব বিস্তার করেছিল। এই ব্যক্তি ছিল হুর বিন ইয়াযীদ তামীমী। এই ব্যক্তিই সর্বপ্রথম ইমাম হুসাইন (রা) ও তার দলকে মক্কায় যেতে বাধা দিয়েছিল এবং কারবালার প্রান্তরে আটক করেছিল। সে প্রধান সেনাপতি আমার বিন সা'দের কাছে এসে বললো ঃ

"আল্লাহ আমাদের সবাইকে সঠিক পথে চালিত করুন। তোমরা কি সত্যই এই মানুষটার বিরুদ্ধে লড়াই করবে, বিশেষত যখন সে লড়াই চায় না এবং লড়াই করার মত জনশক্তিও তার নেই?

www.pathagar.com

ইবনে সা'দ বললো ঃ "হ্যাঁ, আল্লাহর কসম, অবশ্যই লড়বো। এমন লড়াই করবো যে, শত্রুদের মাথা গলা থেকে আলাদা হয়ে যাবে, এবং বাহু ঘাড় থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে।"

হুর বললো ঃ "উনি যে বিকল্প প্রস্তাবগুলো দিলেন, তার একটাও কি গ্রহণ করা যায় না?"

আমর বিন সা'দ একটু নরম সুরে বললো ঃ "আল্লাহর কসম, আমার হাতে কোন ক্ষমতা নেই। থাকলে গ্রহণ করতাম। গভর্নর সাহেব নিজেই যা প্রত্যাখ্যান করেছেন, তা আমি কি করে গ্রহণ করি?"

এই জবাব শুনে হুর ধীরে ধীরে হযরত হুসাইনের (রা) দিকে অগ্রসর হতে শুরু করলো। তার গোত্রের এক ব্যক্তি মুজাহিদ বিন আওস বললো ঃ "কিহে, তুমি কি হুসাইনের (রা) ওপর আক্রমণ করতে যাচ্ছ?" হুর জবাব দিল না। মুহাজিরের সন্দেহ আরো প্রবল হলো। সে ওর পিছু পিছু চলতে লাগলো এবং বললো ঃ

"আল্লাহর কসম, তোমার নীরবতা ভীষণ সন্দেহজনক। আমি কখনো কোন যুদ্ধের ময়দানে তোমার এ অবস্থা দেখিনি, যা আজ দেখেছি। আমাকে যদি কেউ জিজ্ঞেস করে কুফার সবচেয়ে সাহসী পুরুষ কে, তবে আমি নির্দ্বিধায় তোমার নাম বলবো। কিন্তু তুমি এ কী করছ? কোথায় যাচ্ছ?"

হুর একবার পেছনে ও আশপাশে তাকিয়ে যখন দেখলো, নিজের বাহিনীর নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের কাছ থেকে বেশ দূরে এবং হুসাইনের (রা) বাহিনীর কাছাকাছি এসে পড়েছে, তখন সে অকপটে মুহাজিরকে বললো ঃ "এখন জান্নাত অথবা জাহান্নামের যে কোন একটা বাছাই করার সময় এসে গেছে। আমি জান্নাতকে বেছে নিয়েছি। এখন আমাকে কেউ টুকরো টুকরো করে কেটে ফেলুক অথবা আগুনে জ্বালিয়ে দিক কোন লাভ হবে না।" এই বলে সে ঘোড়াকে একটা ধাক্কা দিয়ে এক লাফে হুসাইনের বাহিনীর ভেতরে পৌঁছে গেল। সেখানে পৌঁছে সে হযরত হুসাইনকে বললো ঃ

"হে রাসূলের নাতি, আল্লাহ আমাকে আপনার জন্য উৎসর্গ করুন। আমি সেই হতভাগা, যে আপনাকে ফিরে যেতে না দিয়ে এই জায়গায় আটকে রেখেছিল। আল্লাহর কসম, আমি কখনো কল্পনা করিনি যে, ওরা আপনার প্রস্তাবগুলোকে প্রত্যাখ্যান করে আপনার সাথে এরূপ আচরণ করবে। আমি যদি জানতাম যে, তারা এতদূর বাড়াবাড়ি করবে, তাহলে আমি কখনো এত বড় অন্যায় কাজ করতাম না, এখন আমি আল্লাহর কাছে তওবা করার জন্য আপনার কাছে এসেছি। আমি প্রতিজ্ঞা করছি যে, আমার সব কটা অংগপ্রত্যংগ খন্ডবিখন্ড না হওয়া পর্যন্ত এবং আমার মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত আপনার প্রাণরক্ষার জন্য শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাব। এতে কি আমার তওবা কবুল হবে?

ইমাম হুসাইন (রা) বললেন ঃ অবশ্যই আল্লাহ তোমার তওবা কবুল করবেন এবং তোমাকে অফুরন্ত অনুগ্রহ দান করবেন।

এবার হুর সামনে এগিয়ে গেল এবং তার প্রাক্তন সাথীদেরকে সম্বোধন করে বললো ঃ

"হে আমার স্বদেশী ভাইয়েরা, হুসাইন তোমাদের কাছে যে বিকল্প প্রস্তাবগুলো দিয়েছে,

www.pathagar.com

তা তোমরা কেন গ্রহন করছ না? গ্রহণ করলে আল্লাহ তায়ালা তোমাদেরকে তার সাথে যুদ্ধ করা থেকে রক্ষা করতেন। হে কুফাবাসী, তোমরাই তো চিঠির পর চিঠি লিখে হুসাইনকে (রা) ডেকে এনেছ এবং এরূপ অকাট্য অংগীকার করেছ যে, আপনার জন্য আমরা আমাদের জীবন উৎসর্গ করবো। এখন যেই তিনি তোমাদের কাছে এসেছেন, অমনি তোমরা তার সাথে যুদ্ধ করার জন্য হন্যে হয়ে গেছ। তোমরা তাকে ঘিরে ফেলেছ। আল্লাহর বিশাল পৃথিবীতে তোমরা তাকে কোথাও যেতেও দিচ্ছনা। তিনি একজন বন্দীর মত হয়ে গেছেন। নিজের সাহায্য নিজেও করতে পারছেন না, আবার কোন দুঃখকষ্ট থেকেও নিজেকে বাঁচাতে পারছেন না। তোমরা তার ও তার সাথীদের জন্য ফোরাতের পানি বন্ধ করে দিয়েছ। ঐ নদীর পানি ইহুদী ও খৃষ্টানদের জন্যও উন্মুক্ত, পশুদেরও ঐ পানি পান করায় কেউ বাধা দিতে পারে না। অথচ হে জনমন্ডলী, তোমরা হুসাইনকে (রা) এক ফোটা পানিও দিচ্ছনা। তারা পিপাসায় ছটফট করছে। অথচ তোমরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাসছ। তোমরা রাসূল (সা) এর তিরোধানের পর তার বংশধরের সাথে চরম অমানুষিক আচরণ করছ। তোমরা যদি অবিলম্বে তওবা না কর এবং হঠকারিতা থেকে ফিরে না আস, তাহলে আল্লাহ কেয়ামতের দিন তোমাদেরকে পিপাসিত রেখে শাস্তি দেবেন।"

হুরের এই ভাষণের জবাবে ক্রুদ্ধ ইয়াযীদ বাহিনী তীর নিক্ষেপ করে আনুষ্ঠানিক যুদ্ধ শুরু করে দিল। সেনাপতি ইবনে সা'দ স্বয়ং পতাকাবাহী দুরাইদের সাথে সামনে অগ্রসর হলো এবং হযরত হুসাইনের (রা) বাহিনীর দিকে তীর নিক্ষেপ করে

চিৎকার করে বললো ঃ

"তোমরা সাক্ষী থেক, সর্ব প্রথম তীর আমিই চালিয়েছি।" এরপর ইবনে সা'দের বাহিনী থেকে যিয়াদ বিন সুমাইয়ার ক্রীতদাস ইয়াসার বেরিয়ে এল এবং বিপক্ষে কোন একজনকে তার সাথে যুদ্ধের চ্যালেঞ্জ দিল। ইমাম হুসাইনের বাহিনী থেকে আব্দুল্লাহ বিন আমর কালবী বেরিয়ে এল। ইনি কুফা থেকে নিজের স্ত্রীকে সাথে নিয়ে হযরত হুসাইনের বাহিনীতে যোগদান করেছিলেন। ইয়াসার জিজ্ঞেস করলো, "তুমি কে?"

আব্দুল্লাহ নিজের পদমর্যাদা ও বংশ পরিচয় দিল। ইয়াসার বললো ঃ "তোমাকে আমি চিনিনা। আমি চাই, আমার সাথে লড়তে যুহাইর বিন কাইন, হাবীব বিন মুযাইর অথবা বারীর বিন খুযাইর বেরিয়ে আসুক।"

আব্দুল্লাহ বললেন ঃ

"তাতে তোর কী? তোর তো লড়াই দরকার, তা যার সাথেই হোক না কেন। তোর সাথে যুদ্ধ করতে যে-ই আসবে, সে তোর চেয়ে ভালোই হবে।"

এরপর আব্দুল্লাহ এগিয়ে এলেন এবং এমন জোরে তলোয়ারের কোপ মারলেন যে, সে দুই টুকরো হয়ে গেল। এ অবস্থা দেখে ইবনে যিয়াদের গোলাম সালেম এগিয়ে এল। সে আব্দুল্লাহর ওপর তরবারী দিয়ে আঘাত করলো। আব্দুল্লাহ ডান হাত দিয়ে তা

www.pathagar.com

ঠেকালেন। এতে তার হাতের কটা আঙ্গুল কেটে গেল। কিন্তু তিনি ঐ আহত হাত দিয়েই তাকেও ধরাশায়ী করে দিলেন। তার স্ত্রী তাকে কাটা হাত নিয়ে লড়তে দেখে তাঁবুর ভেতর থেকে একখানা কাঠ নিয়ে ছুটে এলেন এবং বললেন ঃ

"আমার মাবাবা আপনার ওপর উৎসর্গ হোক। আপনি রাসূলের বংশধরের পক্ষে লড়াই চালিয়ে যান।" আব্দুল্লাহ তার স্ত্রীকে তাঁবুতে ফিরে যেতে অনুরাধ করলেন। কিন্তু সেই দুঃসাহসী বীরাঙ্গনা বললো ঃ "আপনার সাথে সাথে শাহাদাত বরণ না করা পর্যন্ত আমি আপনার সংগ ত্যাগ করবোনা।" এ অবস্থা দেখে হযরত হুসাইন (রা) বললেন ঃ

"আল্লাহ তোমাকে আমার পরিবারের পক্ষ থেকে উত্তম প্রতিদান দেবেন। তুমি ফিরে যাও। কেননা মহিলাদের ওপর যুদ্ধ ফরয নয়।"

অগত্যা বাধ্য হয়ে সে মহিলা তাঁবুতে ফিরে গেল।

এরপর আমার ইবনুল হাজ্জাজ ইবনে সা'দের বাহিনীর ডান দিকের অংশকে নিয়ে হুসাইনের (রা) বাহিনীর ডান দিকের অংশের দিকে অগ্রসর হলো। সে ও তার বাহিনীর ঐ অংশ যখন কাছাকাছি পৌছলো, তখন হযরত হুসাইনের (রা) সাথীরা বর্শা তাক করে দাঁড়িয়ে গেল। ঘোড়াগুলো ঐসব বর্শার আঘাত সহ্য করতে না পেরে পিছু হটে গেল। হযরত হুসাইনের (রা) বাহিনী বর্শা ও তীর ছুড়ে বহুসংখ্যক শত্রু সেনাকে হতাহত করলেন।

এরপর ইবনে সা'দের বাহিনী থেকে আব্দুল্লাহ বিন হাওযা নামক এক ব্যক্তি মাথা তুলে দাঁড়ালো এবং হুসাইনের (রা) বাহিনীর সামনে গিয়ে বলতে লাগলো "তোমাদের মধ্যে হুসাইন আছে কি?" কেউ এর জবাব দিলনা। সে পুনরায় ঐ প্রশ্ন করলো। এবারও কেউ জবাব দিলনা। তৃতীয়বার জিজ্ঞেস করলে বলা হলো, "হাঁ, আছেন। কিন্তু তোমার উদ্দেশ্য কী? ইবনে হাওয়া বললো ঃ

"হে হুসাইন, আমি তোমাকে জাহান্নামে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হতে বলছি।"

হযরত হুসাইন (রা) জবাব দিলেন ঃ "তুই মিথ্যে বলছিস। আমি পরম দয়ালু ও করুণাময় প্রভুর কাছে অবশ্যই যাবো। তবে তুই কে?"

সে জবাব দিল ঃ "ইবনে হাওযা।"

হযরত হুসাইন (রা) হাত তুলে দোয়া করলেন ঃ "হে আল্লাহ্ এই পাষণ্ডকে এক্ষুনি দোজখে পাঠাও।"

ইবনে হাওযা এ কথা শুনে ক্রোধে অধীর হয়ে গেল। কিন্তু কোন কিছু করার আগেই তার ঘোড়া লম্ফঝম্প করে এমন জোরে ছুট ছিল যে, ইবনে হাওযার পা লাগামে আটকে গেল এবং সে ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে ঝুলতে থাকলো। ঘোড়া উন্মাদের মত ছুটছিল আর ইবনে হাওযার মাথায় পাথর ও গাছ গাছালির সাথে ঠাস্ ঠাস্ করে আগাত লাগছিল। এই অবস্থায় কিছুক্ষনের মধ্যেই সে মারা গেল।

www.pathagar.com

ইবনে সা'দের বাহিনীর আরেক নরপশু মাসরূক বিন ওয়ায়েল হাযরামী অনেকের কাছে আকাংখা প্রকাশ করেছিল যে, সে হুসাইনের (রা) মাথা কাটবে ও তা নিয়ে ইবনে যিয়াদের কাছে হাজির হবে। কিন্তু ইবনে হাওযার শোচনীয় পরিণতি দেখে সে এত ভয় পেয়ে গেল যে, "আমি হুসাইনের বিরুদ্ধে কখনো যুদ্ধ করবোনা", বলতে বলতে তৎক্ষনাত কূফা ফিরে গেল।

তখনো পুরো দস্তুর যুদ্ধ আরম্ভ হয়নি। দু'দিক থেকে এক একজন বা দু'দুজন করে বেরিয়ে আসছিল এবং বিপক্ষের লোকদের ওপর আক্রমণ চালাচ্ছিল। মল্লযুদ্ধে হযরত হুসাইন (রা) ছিলেন অজেয়। যে ব্যক্তিই তার সাথে যুদ্ধ করতে আসছিল, মারা যাচ্ছিল। হুর বিন ইয়াযীদ ও অন্যান্য বীর মুজাহিদরা বিস্ময়কর শৌর্যবীর্যের পরিচয় দিলেন। ইবনে সা'দের বাহিনীর কাউকে তারা মল্লযুদ্ধে অক্ষত থাকতে দেননি। এর কারণ হলো, হযরত হুসাইনের (রা) সহযোদ্ধারা ইবনে সা'দের লোকদের মত বেতনভূক ও পার্থিব পুরস্কারলোভী ছিলেন না। তাদের একমাত্র লক্ষ্য ছিল আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন। এই লক্ষ্য অর্জনের প্রেরণা তাদেরকে নির্ভিক বানিয়ে দিয়েছিল এবং মৃত্যু সম্পর্কে একেবারেই বেপরোয়া করে তুলেছিল। ইবনে সা'দের লোকেরা ছিল অধিকাংশ ভাড়াটে। তারা বড় বড় পারিতোষিক লাভের আশায় যুদ্ধ করছিল। হুসাইনের (রা) অতি ক্ষুদ্র বাহিনীর সাথে লড়াইতে মৃত্যু বা মারাত্মক কোন আঘাতপ্রাপ্তির ঝুকি নেই বলে অনেকেই দলে ভিড়েছিল। কিন্তু ইবনে হাওযার দুর্ঘটনা ও মল্লযুদ্ধের বিপর্যয় তাদের ভীতি বাড়িয়ে দিয়েছিল। হযরত হুসাইনের (রা) সংগীদের মধ্যে যে জযবা ও উদ্দীপনা ছিল তা তাদের মধ্যে কখনো ছিলনা।

মল্লযুদ্ধে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির পরিপ্রেক্ষিতে সেনাপতি আমর বিন হাজ্জাজ চিৎকার করে বলে উঠলো ঃ "আর মল্ল যুদ্ধ নয়, এবার সর্বব্যাপী আক্রমণ শুরু করা হোক।" এরপর মল্লযুদ্ধ বন্ধ হয়ে গেল। আমর বিন হাজ্জাজ নিজেই ফোরাতের দিক থেকে হযরত হুসাইনের (রা) বাহিনীর ওপর আক্রমণ চালালো। হুসাইনের (রা) সাথীরা বীরবিক্রমে লড়লেন। সংঘর্ষ বেশীক্ষণ স্থায়ী হলোনা। হযরত হুসাইনের (রা) পক্ষে সর্বপ্রথম শাহাদাত লাভ করলেন মুসলিম বিন আওসাজা। কিছুক্ষণের জন্য যুদ্ধবিরতি হলো এবং আমর বিন হাজ্জাজ নিজের বাহিনী নিয়ে ফিরে গেল। এরপর হযরত হুসাইন (রা) মুসলিম বিন আওসাজার কাছে গেলেন। তখনো তিনি জীবিত। হযরত হুসাইন (রা) বললেন ঃ

"ইবনে আওসাজা, আল্লাহ তোমার ওপর রহমত নাযেল করুন। তারপর সূরা আহযাবের আয়াত তেলাওয়াত করলেন–

"নিষ্ঠাবান মুমিনদের কেউ কেউ শাহাদাত বরণ করেছে, আর অন্যরা অপেক্ষায় আছে। তারা তাদের বিশ্বাসে কোনই পরিবর্তন আনেনি।"

হযরত হুসাইনের (রা) পর হাবীব বিন মুজাহির মুসলিম বিন আওসাজার কাছে

www.pathagar.com

এসে বললেন ঃ

"আমি তোমাকে জান্নাতের সুসংবাদ দিচ্ছি। আমার নিশ্চিত বিশ্বাস, আমিও অতি শীঘ্র তোমার কাছে পৌছে যাবো। তা না হলে তোমার কোন ওসিয়ত আছে কিনা জেনে নিতাম এবং তা পুরণ করতাম।"

মুসলিম বিন আওসাজা হযরত হুসাইনের (রা) দিকে ইংগিত করে ক্ষীণ কণ্ঠে বললেন ঃ "আমি তোমাকে শুধু ওঁর ব্যাপারে ওসিয়ত করছি, নিজের জীবন দিয়ে হলেও ওঁকে কোন আঘাত পেতে দিওনা।" এ কথাটা বলেই তিনি জান্নাতে পাড়ি জমালেন।

হযরত হুসাইনের (রা) সাথীরা জীবন বাজি রেখে যুদ্ধ করলেন। যে সৈনিক যেদিক ছুটে যাচ্ছিল, সেদিকে শত্রুসেনাদের লাশের স্তুপ পড়ে যাচ্ছিল। ইয়াযীদ বিন কান্দী আমর বিন সা'দের সাথে কূফা থেকে এসেছিল। কিন্তু যখন ইবনে সা'দ হযরত হুসাইনের (রা) প্রস্তাবগুলো প্রত্যাখ্যান করলো, তখন সে কালবিলম্ব না করে হুসাইনের (রা) দলে যোগ দিল। সে হাঁটু গেড়ে মাটির ওপর বসে পড়লো এবং শত্রুবাহিনীকে লক্ষ্য করে তীর ছুড়তে লাগলো। তার ছোড়া একশোটা তীরের মধ্যে মাত্র পাঁচটা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। তার প্রত্যেকটা তীর ছোড়ার সময় ইমাম হুসাইন (রা) বলছিলেন ঃ "হে আল্লাহ, ওর তীরগুলোকে লক্ষ্যে পৌছে দাও এবং এর বদলায় ওকে জান্নাতবাসী কর।"

শিমার যত সহজে জয় লাভের আশা করেছিল, বাস্তবে তা যে তত সহজ নয়, সেটা এবার উপলব্ধি করলো। অবস্থা বেগতিক দেখে সে আমর বিন সা'দের বামদিকের সেনাদলকে সাথে নিয়ে চারদিক থেকে আক্রমণ চালালো। কিন্তু হযরত হুসাইনের (রা) সাথীরা এমন জোরদার প্রতিরোধ গড়ে তুললো যে, এ হামলাও ব্যর্থ হলো। অবশেষে অশ্বারোহী দলের অধিনায়ক উরওয়া বিন কায়েস আমর বিন সা'দকে বার্তা পাঠালো যে, এই মুষ্টিমেয় ক'টা লোক আমাদের অবস্থা শোচনীয় করে তুলেছে। তুমি আমাদের সাহায্যের জন্য অতিরিক্ত কিছু পদাতিক ও তীরান্দাজ সৈন্য পাঠাও।

আমর বিন সা'দ হুসাইন বিন নুমাইয়ের নেতৃত্বে পাঁচশো তীরান্দাজের একটা দল পাঠালো। হুসাইন বিন নুমাইর তার দলকে তীর ছোড়ার নির্দেশ দিল। বৃষ্টির মত তীর ছুড়ে হযরত হুসাইনের (রা) দলের অনেকগুলো ঘোড়াকে আহত করলো। বাধ্য হয়ে ঘোড় সওয়াররা ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে পদাতিকে রূপান্তরিত হলো।

এই সময় হুর বিন ইয়াযীদের ঘোড়াও আহত হয়। তিনি ঘোড়ার পিঠ থেকে লাফ দিয়ে নীচে নামলেন। তারপর হাতে তরবারী নিয়ে শত্রুদের ভেতরে ঢুকে পড়লেন এবং যতক্ষণ পারলেন শত্রু সেনাদেরকে কচুকাটা করতে লাগলেন। হুরের জান্নাতবাসী হবার সময় ঘনিয়ে এল। শত্রুরা চারদিক থেকে ঘেরাও করে তার ওপর ঝাপিয়ে পড়লো এবং তাঁকে শহীদ করে দিল।

সূর্য ক্রমশ মধ্য গগনে এসে গেল। তখনো হযরত হুসাইনের (রা) বাহিনী বীর বিক্রমে লড়ে চলেছে। তাদের ভেতরে বিন্দুমাত্র দুর্বলতা বা ক্লান্তির লক্ষণ দেখা গেলনা এবং

www.pathagar.com

ইবনে সা'দের বাহিনীর জয়ের আশা তখনো দৃষ্টিসীমার বাইরে। এর কারণ, হযরত হুসাইন (রা) তাঁবুগুলোকে এমনভাবে স্থাপন করেছিলো যে, শত্রুরা কেবল একদিক থেকেই হামলা চালাতে পারে। অবশেষে ইবনে সা'দ হুকুম দিল যে, হুসাইনের (রা) বাহিনীর ডানে ও বামে যে তাবুগুলো রয়েছে, তা ফেলে দাও। কিন্তু এই কৌশলও ব্যর্থ হলো। হযরত হুসাইন (রা) চার পাঁচজন সশস্ত্র সৈন্যকে তাবুগুলোর পেছনে লুকিয়ে রাখলেন। তাদের নাগালের মধ্যে যে-ই আসছিল, তাকে তারা তীর মেরে অথবা তরবারী দিয়ে মেরে ফেলছিল। তা দেখে আমর বিন সা'দ তাবুগুলোতে আগুন লাগিয়ে দেয়ার নির্দেশ দিল। হযরত হুসাইন (রা) বললেন ঃ

"কোন পরোয়া নেই। জ্বালিয়ে দাও। এটা আমাদের জন্য আরো ভালো। তখন আর ওরা পেছন থেকে হামলা করতে পারবেনা।" বাস্তবেও তাই হলো।

ইতিমধ্যে আব্দুল্লাহ বিন উমাইর কালবী শহীদ হয়ে গেলেন। তাঁর শাহাদাতের পর তার স্ত্রী তাবু থেকে বেরিয়ে এলেন এবং তার কাছে গিয়ে তার মাথা থেকে ধুলোবালি মুছে দিতে লাগলেন। মাটি মুছতে মুছতে তিনি বলছিলেন ঃ তোমার জান্নাত লাভের মুবারকবাদ নাও।" পাষণ্ড শিমারের এ দৃশ্য সহ্য হলোনা। সে তার ভৃত্য রুস্তমকে আদেশ দিল, ঐ মহিলাকে গিয়ে হত্যা করে ফেল। রুস্তম তাঁবু থেকে একখানা কাঠ নিয়ে মহিলার মাথা চূর্ণ করে শহীদ করে দিল।'

এবার দ্বিগুণ উৎসাহে এক জোরদার হামলা চালালো সেনাপতি শিমার। হামলা চালিয়ে সে হযরত হুসাইনের (রা) তাঁবুর কাছে পৌছে গেল। কাছে গিয়ে সে সাথীদেরকে হুকুম দিল ঃ "তাবু জ্বালিয়ে দাও।"

হযরত হুসাইন (রা) বললেন ঃ তুই আমার পরিবার পরিজনকে জ্বালিয়ে দিতে চাস্? আল্লাহ তোকে জাহান্নামের আগুনে পোড়াবেন।" শিমারের সহযোদ্ধা শীছ বিন রাবয়ীও তাকে ভর্ৎসনা করলো। অবশেষে শিমার সেখান থেকে কেটে পড়লো। তার চলে যাওয়ার পর, যারা তাবুগুলো পোড়াচ্ছিল, তাদের ওপর যুহাইর বিন কাইন দশজন যোদ্ধা নিয়ে হামলা চালালেন এবং আবু ইজ্জা নামক একজনকে হত্যা করলেন।

এ সময়ে ইবনে সা'দের বাহিনীর যোদ্ধাদের লাশে ময়দান ভরে গেলেও হযরত হুসাইনের (রা) বাহিনীতেও খুব কম লোকই জীবিত ছিল। অবশিষ্টরা শহীদ হয়ে গিয়েছিল। সা'দের বাহিনীর সৈন্য সংখ্যা প্রচুর হওয়ায় তাদের এত লোক নিহত হওয়া সত্ত্বেও তেমন কমতি অনুভূত হচ্ছিল না। কিন্তু হযরত হুসাইনের (রা) বাহিনীর একজন শহীদ হলেও বিরাট শূন্যতা অনুভূত হতো।

সূর্য তখন পশ্চিমাকাশে অনেক খানি ঢলে পড়েছে। জোহরের নামাযের সময় প্রায় যায় যায়। হযরত হুসাইন (রা) তার লোকজনকে বললেন ঃ শত্রুদেরকে বল, "আমাদেরকে নামায পড়ার সময় দাও।" কিন্তু শত্রুরা তাদের এ আবেদন অগ্রাহ্য করলো। বাধ্য হয়ে লড়াই চলা অবস্থায়ই "সালাতুল খাওফ" এর নিয়মে নামায পড়া হলো। নামাযের পর

www.pathagar.com

জুহাইর বিন কাইন আবার শত্রুবাহিনীর ওপর জোরদার আক্রমণ চালালেন। কিন্তু আর কতক্ষণ? দুশমনের বাহিনীর কয়েকজন মিলে একযোগে হামলা চালিয়ে 'যুহাইরকে শহীদ করে ফেললো।

নাফে বিন হিলাল বাজালী তীর মেরে কূফী বাহিনীর বারোজন সৈন্যকে হত্যা ও শতাধিক সৈন্যকে আহত করেছিলেন। নিজেও মারাত্মকভাবে আহত হয়েছিলেন। অবশেষে শত্রু সেনারা তাঁকে জীবিত বন্দী করে। শিমার তাকে নিয়ে ইবনে সা'দের কাছে গেল। তখনো তার সমগ্র শরীর থেকে রক্ত প্রবাহিত হচ্ছিল। তিনি ইবনে সা'দের কাছে পৌছে বললেন ঃ

"আমি তোমার বাহিনীর বারোজনকে হত্যা করেছি এবং শতাধিক জনকে আহত করেছি। আমার একখানা হাতও যদি সুস্থ থাকতো, তবে তোমরা আমাকে গ্রেফতার করতে পারতেনা।"

শিমার তাকে হত্যা করার জন্য তরবারী উঠালো। নাফে বললেন ঃ "তুমি যদি মুসলমান হ'তে, তবে তুমি আমাদের মত নিরপরাধ মানুষের হত্যার দায় ঘাড়ে নিতে দ্বিধাবোধ করতে। আল্লাহর শোকর, আমাদের মৃত্যু এমন লোকদের হাতে হচ্ছে, যারা আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে নিকৃষ্টতম।"

এ কথা শুনে শিমারের ক্রোধের কোন সীমা পরিসীমা রইলনা। সে তরবারীর আঘাতে নাফেকে শহীদ করে দিল। তারপর হযরত হুসাইনের (রা) বাহিনীর ওপর পুনরায় জোরদার আক্রমণ চালালো। এ সময়ে হযরত হুসাইনের (রা) বাহিনীর একটা বিরাট অংশ শাহাদাত বরণ করেছে। তাঁর চার পাশে মাত্র কয়েকজন মুজাহিদ অবশিষ্ট ছিলেন। তারা যখন দেখলেন, কূফী বাহিনী ক্রমেই প্রবল হয়ে উঠছে, তখন তারা সিদ্ধান্ত নিলেন যে, শত্রুরা ইমাম হুসাইনের (রা) ওপর আক্রমণ করার আগে তারা সবাই তার হেফাজতের জন্য লড়াই করে একে একে শাহাদাত বরন করবেন। কিন্তু জীবিত থাকতে তার গায়ে হাত দিতে দেবেন না। এই সিদ্ধান্ত অনুসারে, প্রথমে বনু গিফার গোত্রের দুই সহোদর আব্দুল্লাহ ও আব্দুর রহমান এগিয়ে গেলেন এবং লড়াই করতে করতে শহীদ হয়ে গেলেন। তাদের পর হানযালা বিন সা'দ শাবাবী হযরত হুসাইনের (রা) সামনে দাঁড়ালেন এবং শত্রুদেরকে উচ্চস্বরে ডেকে বললেন ঃ "হে কূফাবাসী, আমার আশংকা, তোমরাও আদ ও সামুদের মত পরিণতির সম্মুখীন হতে পার এবং তোমরা এই পৃথিবীতেই আল্লাহর আযাব ও গযবে ধ্বংস হয়ে যেতে পার। হে আমার স্বজাতির লোকেরা, খবরদার, হযরত হুসাইনকে (রা) হত্যা করোনা। তা করলে তোমরা আল্লাহর ভয়াবহ আযাবকে ডেকে আনবে।" এ কথা বলেই তিনি 'আল্লাহু আকবর' বলে একাকী এগিয়ে গেলেন এবং যুদ্ধ করতে করতে শহীদ হয়ে গেলেন।

হানযালার পর দুই তরুণ সাইফ বিন হারিস এবং সালেক বিন আবদ এলেন। তারা দুই ভাই ছিলেন। তারা দোয়ার মাধ্যমে হযরত হুসাইনকে (রা) বিদায় জানালেন এবং সামনে

www.pathagar.com

এগিয়ে লড়াই করতে করতে শহীদ হয়ে গেলেন।

তাদের পর আবেছ বিন আবি শুবাইব শাকেরী ও শাওযাব সামনে এগিয়ে এলেন। প্রথমে হযরত হুসাইন (রা)কে সালাম করলেন। তারপর শত্রুদের কাতারে ঢুকে বেপরোয়া লড়াই করতে করতে শাওযাব শহীদ হয়ে গেলেন।

আবেছ মল্লযুদ্ধের চ্যালেঞ্জ দিলেন। কিন্তু কেউ তার মোকাবিলা করতে সাহস করলোনা। আমর বিন সা'দ বললো ঃ "ওকে পাথর ছুড়ে মেরে ফেল।" চারদিক থেকে পাথর মারা হতে লাগলো। হাবেছ নিজের বর্ম ও শিরস্ত্রান খুলে শত্রুবাহিনীর ভেতরে ঢুকে পড়লেন এবং অনেককে হতাহত করলেন। অবশেষে এক সিরীয় যোদ্ধা তাকে পেছন দিক থেকে আক্রমণ করে শহীদ করে দিল।

যাহহাক বিন আব্দুল্লাহ আল মাশরেকী দেখলেন, তখন হযরত হুসাইন (রা) এর পাশে হাতে গনা কয়েকজন লোক জীবিত আছে। আর সবাই শহীদ হয়ে গেছে। তাই তিনি ইমাম হযরত হুসাইনের (রা) কাছে এসে বললেন ঃ

"হে নবী দৌহিত্র, আপনার হয়তো মনে আছে, আমি আপনাকে বলেছিলাম যে, যতক্ষণ পারবো, আমি আপনার পক্ষ হয়ে লড়বো। কিন্তু যখন দেখবো, আমার লড়াই করার শক্তি নিঃশেষ হয়ে গেছে, তখন আমি যুদ্ধের ময়দান থেকে চলে যাবো।"

ইমাম হুসাইন (রা) বললেন ঃ ঠিকই, তুমি একথাই বলেছিলে। কিন্তু এখন চারদিকে শত্রু সেনা। তুমি কিভাবে পালাবে? তোমার পালানোর সমস্ত পথই তো বন্ধ। যদি পালাতে পার, তবে অবশ্যই পালিয়ে যাও। আমার পক্ষ থেকে অনুমতি আছে।"

যখন সিরীয় বাহিনীর পক্ষ থেকে হযরত হুসাইনের (রা) বাহিনীর ওপর বৃষ্টির মত তীর বর্ষিত হচ্ছিল এবং ঘোড়াগুলো আহত হয়ে পংগু হ'য়ে পড়ছিল, তখন যাহহাক নিজের ঘোড়া একটা তাবুর ভেতরে লুকিয়ে রেখেছিলেন এবং পায়ে হেঁটে দু'জন শত্রু সেনাকে হত্যা করেছিলেন। তাই ইমাম হুসাইন (রা) যখন তাকে ফিরে যাওয়ার অনুমিত দিলেন, তখন তিনি তাঁবুর ভেতর থেকে ঘোড়া বের করে ময়দান থেকে পালিয়ে গেলেন। সিরীয় বাহিনীর পনেরো জন সৈন্য তাকে পিছু ধাওয়া করেও ধরতে পারলোনা।

যাহহাক চলে যাওয়ার পর হযরত হুসাইনের (রা) বাহিনীতে মাত্র দু'জন অবশিষ্ট ছিলেন ঃ যুয়াইদ বিন আমর ও বশীর আল হাযরামী। তারা দু'জনও বীর বিক্রমে যুদ্ধ করে শহীদ হয়ে গেলেন। সুয়াইদ হযরত হুসাইনের (রা) সর্বশেষ সাথী ছিলেন, যিনি শহীদ হলেন। এবার তিনি নিজে ও তার পরিবার ছাড়া আর কেউ জীবিত রইলনা।

www.pathagar.com

শহীদী রক্তে হেসে ওঠে যবে জিন্দিগানি

ইমাম হুসাইনের (রা) সাথীরা ইতিমধ্যে একে একে সবাই শাহাদাত বরণ করেছেন। এখন বাকী শুধু তাঁর পরিবার ও হাশেমী গোত্রের কয়েকজন। তারাও ইমাম হুসাইনের (রা) জীবন রক্ষার্থে নিজেদের জীবন উৎসর্গ করতে প্রস্তুত ছিলেন। সর্ব প্রথম হুসাইনের (রা) ছেলে উনিশ বছরের সুদর্শন যুবক আলী আকবর ময়দানে নামলেন। তিনি শত্রু সেনাদের ওপর বীর বিক্রমে হামলা চালালেন। হামলা করার সময় তিনি একটা কবিতা আবৃত্তি করছিলেন যার অর্থ হলো ঃ

"আমি হুসাইনের ছেলে আলী আকবর,
কা'বা শরীফের মালিকের কসম, আমরা নবীর বংশধর,
আমরাই অীধকারী নবীর নৈকট্যের।
মানিনা শাসন, অজানা বাবার সন্তানের।"

আলী আকবর বিদ্যুতের বেগে শত্রুর কাতারে এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্তে ঘুরছিলেন, আর নজীরবিহীন সাহসিকতা ও বীরত্বের পরিচয় দিচ্ছিলেন। অবেশেষে জনৈক মুররা বিন মুনকিয আল-আবদী তাকে বর্শা দিয়ে আঘাত করে এ ফোড় ওফোড় করে দিলে তিনি মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন। লুটিয়ে পড়ার সাথে সাথে শত্রুরা চারদিক থেকে রক্ত পিপাসু শ্বাপদের মত ঝাঁপিয়ে পড়লো এবং তরবারী দিয়ে তাকে টুকরো টুকরো করে ফেললো। এই হৃদয়বিদারক দৃশ্য দেখে তার ফুফু যয়নব পাগলের মত হয়ে তাবু থেকে বেরিয়ে এলেন এবং 'ও আমার ভাইপো' বলে কাঁদতে কাঁদতে আলী আকবরের লাশের টুকরোগুলোর ওপর আছড়ে পড়লেন। হযরত হুসাইন (রা) তাকে জোর পূর্বক তাবুতে ফেরত পাঠালেন এবং ছেলের লাশের টুকরোগুলোকে ভাইদের সাহায্যে তুলে নিয়ে তাবুর সামনে রাখলেন।

আলী আকবরের পর একে একে মুসলিম বিন আকীলের ছেলে আব্দুল্লাহ, আব্দুল্লাহ বিন জাফরের ছেলে আওন ও মুহাম্মাদ, আকীলের ছেলে আব্দুর রহমান ও জাফর যুদ্ধের ময়দানে এলেন এবং শহীদ হলেন। তারপর ইমাম হাসানের (রা) ছেলে কাসেম তলোয়ার নিয়ে ময়দানে এলেন। কাসেম এত সুদর্শন ছিলেন যে, তার চেহারা অবিকল চাঁদের মত ঝকমক করছিল। আমর বিন সা'দ বিন নুফায়েল আবদী তার ঘাড়ের ওপর তরবারী দিয়ে আঘাত করলো। কাসেম 'চাচা বিদায়' বলে একটা চিৎকার দিয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়লো।

তার চিৎকার শুনে ইমাম হুসাইন (রা) আর স্থির থাকতে পারলেন না। তিনি সিংহের মত গর্জে উঠে কাসেমের হত্যাকারী আমরের ওপর আক্রমণ করে তার বাহু কেটে ফেললেন। আমরের চিৎকার শুনে কূফী বাহিনীর অশ্বারোহীরা তাকে রক্ষা করার জন্য

www.pathagar.com

ছুটে এল। কিন্তু বেসামাল অবস্থায় রক্ষা করার পরিবর্তে তাকে নিজেদের ঘোড়ার পায়ের তলে পিষ্ট করে মেরে ফেললো এবং সে তৎক্ষনাত মারা গেল।

গোটা এলাকা ঘোড়ার দাপাদাপির কারণে ধুলাবালিতে আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছিল। ধুলোবালি সরে গেলে লোকেরা দেখলো যে, হযরত হুসাইন (রা) কাসেমের লাশের মাথার কাছে দাঁড়িয়ে বলছেন ঃ

"তোমাকে যারা হত্যা করলো, তাদের ওপর আল্লাহর গযব ও ধ্বংস নেমে আসুক। কেয়ামতের দিন তারা নানাজানকে কী জবাব দেবে? বাবা কাসেম, তোমার বাবার জন্য এটা বড়ই অনুশোচনার বিষয় হয়ে রইল যে, তোমার ডাকে সে সাড়া দিতে ও তোমাকে রক্ষা করতে এগিয়ে আসতে পারেনি। হায় আফসোস, আজ তোমার চাচার চার পাশে দুশমনের সংখ্যা খুবই বেড়ে গেছে। অথচ সাহায্যকারী একজনও অবশিষ্ট নেই।" এই বলে তাকে ওঠালেন এবং ছেলে আলী আকবর ও পরিবারের অন্যান্য নিহত বক্তির লাশের সাথে শুইয়ে দিলেন। এরপর হযরত হুসাইন (রা) নিজের তাবুর সামনে দাঁড়িয়ে গেলেন। ঠিক এই সময়ে তাবুর ভেতরে তার এক ছেলে ভূমিষ্ট হলো। ছেলের নাম রাখা হলো আব্দুল্লাহ। তাকে হুসাইনের (রা) কাছে আনা হলো। তিনি তার কানে আযান দিতে লাগলেন। সহসা বনু আসাদের এক পাষন্ডের নিক্ষিপ্ত একটা তীর এসে সদ্যজাত সন্তানের কণ্ঠনালীতে বিদ্ধ হলো এবং তৎক্ষণাত তার প্রাণ বায়ু বেরিয়ে গেল।

হযরত হুসাইন (রা) তার রক্ত দিয়ে নিজের হাতের তালু ভরে ফেললেন এবং তাকে মাটির ওপর শুইয়ে রাখলেন। তারপর তাকেও অন্যান্য শহীদের পাশাপাশি শুইয়ে রাখা হলো।

ইতিমধ্যে হযরত হাসানের (রা) আর এক ছেলে আবু বকরকে তীর মেরে শত্রুরা শহীদ করে ফেললো।

হযরত আলীর (রা) ছেলে আব্বাস যখন দেখলেন, পরিবারের সবাই একে একে জীবন উৎসর্গ করছে, তখন তিনি তার সৎ ভাই আব্দুল্লাহ, জাফর ও উসমানকে বললেন "এখন তোমাদের জীবন উৎসর্গ করার সময় সমাগত। অগ্রসর হও এবং আল্লাহর পথে জীবন দাও।" সর্ব প্রথম আব্দুল্লাহ এগিয়ে গেলেন এবং প্রচন্ড যুদ্ধ করার পর শাহাদাত বরন করলেন। তারপর জাফরও শহীদ হলেন। তারপর উসমান ও শহীদ হলেন। তারপর শহীদ হলেন অপর সৎ ভাই মুহাম্মদও।

এই সময় হুসাইন পরিবারের তাবু থেকে এক শিশু বেরিয়ে এল এবং ভয়ার্ত দৃষ্টিতে এদিক ওদিক তাকাতে লাগলো। কূফী বাহিনীর হানী বিন সুরাইত হাযরানী তাকেও শহীদ করে ফেললো।

হযরত হুসাইনের (রা) সর্বাংগ তখন ক্ষত বিক্ষত। তার ভীষণ পিপাসাও লেগেছির। তিনি তার ভাই আব্বাসকে নিয়ে ফোরাত নদীর কিনার অভিমুখে চলতে লাগলেন। শত্রুর ঘোড় সওয়াররা তাকে ঠেকাতে চেষ্টা করলো। কিন্তু তিনি যুদ্ধ করতে করতে

www.pathagar.com

নদীর কিনারে পৌঁছে গেলেন। তিনি যেই পিয়ালায় পানি নিয়ে পান করতে উদ্যত হলেন, অমনি হুসাইন বিন নুমাইয়ের নিক্ষিপ্ত তীর এসে তাঁর কণ্ঠনালীতে বিদ্ধ হলো। তিনি নিজেই তীর টেনে বের করলেন। এতে তার হাত রক্তে ভরে গেল। রক্তকে আকাশে ছুড়ে মেরে তিনি বললেন ঃ

"হে আল্লাহ, আমি তোমারই কাছে ফরিয়াদ জানাচ্ছি। দেখ, তোমার রাসূলের দৌহিত্রের সাথে কী আচরণ করা হচ্ছে।" এই বলে পিপাসা নিয়েই তিনি ফিরে গেলেন। শত্রুরা আব্বাসকে তাঁর কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেললো। আব্বাস একাকী তাদের সাথে লড়লেন। লড়তে লড়তে জীবন দিয়ে দিলেন।

হযরত হুসাইন (রা) যখন তাবুতে ফিরলেন, তখন শিমার কয়েকজন ঘোড় সওয়ারকে সাথে নিয়ে তার দিকে অগ্রসর হলো। সে তাদেরকে হুসাইনের (রা) বিরুদ্ধে উত্তেজিত করতে লাগলো। তিনিও তলোয়ার নিয়ে তাদেরকে ঠেকাতে লাগলেন এবং তারা খানিকটা পিছু হঠলো। কিন্তু কিছুক্ষণ পর পুনরায় সংঘবদ্ধ হয়ে তাঁকে ঘিরে ফেললো। কান্দা গোত্রের মালেক নামক এক পাষন্ড তরবারী দিয়ে তাঁর মাথায় আঘাত করলো। তিনি তখন টুপি পরিহিত ছিলেন। তলোয়ার টুপি কেটে মাথায় ঢুকে গেল। মাথা থেকে ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটলো। পুরো টুপিটা রক্তে লাল হ'য়ে গেল। তিনি টুপি খুললেন। মাথায় ব্যান্ডেজ বাঁধলেন। তারপর অন্য টুপি পরে তার ওপর পাগড়ি বাঁধলেন।

তাবুর ভেতর থেকে ইমাম হাসানের (রা) কিশোর ছেলে আব্দুল্লাহ যখন দেখলো, তাকে শত্রুরা ঘিরে ধরেছে, তখন সে উত্তেজনায় অধীর হয়ে গেল এবং এক টুকরো কাঠ নিয়ে হুসাইনের (রা) পাশে গিয়ে দাঁড়ালো। তৎক্ষনাত ইবনে কা'ব হযরত হুসাইনের (রা) ওপর তরবারী দিয়ে আরো একটা আঘাত করলো। আব্দুল্লাহ চিৎকার করে বলে উঠলোঃ

"এই পাপাত্মা, আমার চাচাকে হত্যা করছিস?"

ইবনে কা'ব কিশোর আব্দুল্লাহর ওপরও তরবারী চালালো। আব্দুল্লাহ হাত দিয়ে আঘাত ঠেকালো। এতে তার হাত কেটে গেল। সে ব্যথায় কাতর হয়ে চিৎকার করতে লাগলো। হযরত হুসাইন (রা) তাকে কোলে তুলে নিয়ে প্রবোধ দিতে লাগলেন ঃ

""আমার প্রাণাধিক ভাইপো, যে মুসিবত তোমার ওপর পড়েছে, তাতে ধৈর্য ধারণ কর। আল্লাহ তোমাকেও তোমার পবিত্র বাপ দাদাদের কাছে পৌঁছে দেবেন।"

এরপর তিনি আকাশের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে বললেন ঃ

"হে আল্লাহ, এই লোকদের ওপর থেকে বৃষ্টি বন্ধ করে দাও এবং পৃথিবীর উৎপন্ন সম্পদ তাদের ওপর হারাম করে দাও। হে আল্লাহ, যদি তুমি তাদেরকে পৃথিবীতে আরো কিছু দিন বাঁচিয়ে রাখ, তবে তাদের ভেতরে বিভেদ সৃষ্টি করে দাও। পরস্পরের মধ্যে শত্রুতা বাধিয়ে তাদেরকে পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন করে দাও। কেননা তারা আমাদেরকে ডেকেছে ও আমাদেরকে সাহায্য করার ওয়াদা করেছে। কিন্তু আমরা যখন এলাম, তখন আমাদের ওপর যুদ্ধ চাপিয়ে দিল এবং আমাদেরকে হত্যা করলো।"

www.pathagar.com

হযরত হুসাইনের (রা) মাথা ও সমস্ত শরীর মরাত্মকভাবে আহত ছিল। কিন্তু এই অবস্থায়ও তিনি মাঝে মাঝে উঠে যখন তরবারী চালাচ্ছিলেন, তখন ডানে বামে শত্রুদের দ্বারা পরিপূর্ণ স্থান এক নিমেষে জনশূন্য হয়ে যাচ্ছিল। ইতিমধ্যে তার বোন যয়নব তাবু থেকে বেরিয়ে এসে বলতে লাগলেন, "আহা, এখন যদি পৃথিবীর ওপর আকাশ বিদীর্ণ হয়ে পড়তো!" এই সময় আমর বিন সা'দ হযরত হুসাইনের (রা) কাছে এল। যয়নব চিৎকার করে তাকে বললেন ঃ "ওহে আমর, আব্দুল্লাহর বাবা (অর্থাৎ হুসাইন) কি তোমার চোখের সামনে নিহত হবেন?" এ কথা শুনে আমর বিন সা'দের চোখ অশ্রু সজল হয়ে উঠলো এবং দাড়ি ও গাল বেয়ে তা পড়তে লাগলো। এটা লুকানোর জন্য সে মুখ ঘুরিয়ে নিল।

হযরত হুসাইন অত্যন্ত বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করছিলেন এবং বলছিলেন ঃ

"ওহে কূফাবাসী, তোমরা কি আমাকে হত্যা করার ব্যাপারে ঐক্যবদ্ধ হয়ে গেলে? আল্লাহর কসম, আমার হত্যায় আল্লাহ যত অসন্তুষ্ট হবেন, আমার পর আর কোন বান্দার হত্যায় তত অসন্তুষ্ট হবেননা। আমাকে আল্লাহ অবশ্যই সম্মানিত করবেন। কিন্তু তোমাদের কাছ থেকে তিনি এমন মমান্তিকভাবে প্রতিশোধ নেবেন, যা তোমরা ভাবতেও পারবেনা।"

অনেক সময় কেটে গেল। শত্রুরা চাইলে অনেক আগেই হযরত হুসাইন (রা) কে শহীদ করে ফেলতে পারতো। কিন্তু কেউ তাঁর ওপর চূড়ান্ত আঘাত হানার গুনাহ নিজের ঘাড়ে চাপাতে চাইছিলনা, প্রত্যেকে চাইছিল এ কাজটা অন্য কেউ করুক, আর নিজে তা থেকে মুক্ত থাক।

এ পরিস্থিতি দেখে শিমার পদাতিক বাহিনীর মনোবাল বাড়ানোর জন্য অশ্বারোহীদেরকে দাঁড় করিয়ে দিল এবং তীরান্দাজদেরকে তীর নিক্ষেপের আদেশ দিল। সে চিৎকার করে বললো ঃ

"তোমাদের মরণ হোক, তোমরা কিসের অপেক্ষা করছ? হুসাইনকে খতম করে দিচ্ছনা কেন?"

এবার চারদিক থেকে আক্রমণ শুরু করা হলো। যারয়া বিন শারীক তামিমী হযরত হুসাইনের বাম বাহুর ওপর তলোয়ার মারলো এবং বাহুটা বিচ্ছিন্ন করে ফেললো। তারপর তার কপালে তলোয়ার মারলো। তিনি এমন জোরে হেলে দুলে উঠলেন যে, তা দেখে ভয়ে অনেকে পেছনে সরে গেল। কিন্তু সিনান বিন আনাস আশজায়ী সামনে এগিয়ে গিয়ে তার ওপর বর্শা দিয়ে আঘাত করলো। তিনি তৎক্ষণাত মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন। খাওলী বিন ইয়াযীদ তাঁর মাথা কাটার জন্য এগিয়ে গেল। কিন্তু সাহস পেলনা। তা দেখে সিনান তিরস্কার করলো। "আল্লাহ তোর সমস্ত শরীর অবশ করে দিক।" তারপর নিজে ঘোড়া থেকে নেমে তাকে যবাই করলো।

কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে, শিমার নিজেই তার মাথা কেটেছিল এবং খাওলী বিন ইয়াযীদের কাছে রেখেছিল।

www.pathagar.com

শাহাদাতের পর দেখা গেল, তার শরীরে তেত্রিশটা তীরের ক্ষত এবং চৌত্রিশটা তরবারীর ক্ষত ছিল।

তাকে শহীদ করার পর কূফী বাহিনী তার দেহের কাপড় পর্যন্ত খুলে নিয়েছিল। হযরত হুসাইনের (রা) সাথীদের মধ্য থেকে সুয়াইদ বিন আবিল মুতা তখনো জীবিত ছিলেন। নিহতদের লাশের ভেতরে তিনি মুমূর্ষ অবস্থায় কাতরাচ্ছিলেন। তিনি যখন শুনতে পেলেন, হুসাইনকে (রা) হত্যা করা হয়েছে, তখন তিনি সেই মুমূর্ষ অবস্থায়ই উঠলেন এবং কাছেই পড়ে থাকা একটা ছুরি নিয়ে শত্রুদের দিকে অগ্রসর হলেন। কিন্তু শত্রুর তরবারীর এক আঘাতেই তাকে খতম করে দেয়া হলো। তিনিই ছিলেন হুসাইনের (রা) কাফেলার সর্বশেষ শহীদ।

এবার কূফী বাহিনী তাবুর দিকে অগ্রসর হলো এবং হুসাইন পরিবারের সমস্ত দ্রব্য সামগ্রী লুটপাট করে নিল। তারপর তারা ইমাম হুসাইনের (রা) অসুস্থ ছেলে যায়নুল আবেদীনের দিকে এগিয়ে গেল। শিমার তাকেও হত্যা করতে চেয়েছিল। কিন্তু হামীদ বিন মুসলিম বললো ঃ

"সুবহানাল্লাহ, শিশুদেরকেও হত্যা করবে নাকি?"

শিমারের অন্যান্য সাথীরাও বললো, আমরা এই অসুস্থ শিশুকে হত্যা করবোনা। ইত্যবসরে সেনাপতি আমর বিন সা'দ এসে গেল। সে বললো ঃ "খবরদার, তাবুর ধারে কাছেও কেউ যেয়না। যে যা কিছু লুটপাট করেছে, সে যেন তা অবিলম্বে ফেরত দেয়।"

আমর নারী ও শিশুদের রক্ষণাবেক্ষণের উদ্দেশ্যে তাঁবুতে কয়েকজন রক্ষী নিয়োগ করলো। এই ব্যবস্থা করার পর সে ময়দানে ফিরে এল এবং চিৎকার করে বললো ঃ

"হুসাইনের দেহ ঘোড়ার পায়ে পিষ্ট করতে কে কে প্রস্তুত?"

দশ ব্যক্তি রাজী হলো এবং পবিত্র দেহকে ঘোড়ার পায়ের নীচে পিষ্ট করা হলো। এর কিছুক্ষন পরই সূর্য অস্ত গেল।

হযরত হুসাইনের (রা) শাহাদাতের ঘটনা ১০ই মুহাররম, আশুরার দিন, ৬১ হিজরী, মোতাবেক ১৯ই অক্টোবর ৬৮০ খৃষ্টাব্দে যোহরের নামাযের পর সংঘটিত হয়। হযরত হুসাইনের বয়স তখন পঞ্চান্ন বছর ছিল। তার সাথে বাহাত্তর ব্যক্তি শহীদ হয়। তন্মধ্যে আঠারো জন তার আত্মীয়-স্বজন ও বনু হাশেম গোত্রের লোক। তাদের নাম নিম্নরূপ ঃ

(১) হযরত আলীর (রা) ছেলে আব্বাস (২) হযরত আলীর (রা) ছেলে জাফর (৩) হযরত আলীর (রা) ছেলে আব্দুল্লাহ (৪) হযরত আলীর (রা) ছেলে উসমান (৫) হযরত আলীর (রা) ছেলে মুহাম্মাদ (৬) হযরত আলীর (রা) ছেলে আবু বকর (৭) হযরত হুসাইনের (রা) ছেলে আলী (৮) হযরত হুসাইনের (রা) ছেলে আব্দুল্লাহ (৯) হযরত হাসানের (রা) ছেলে আবু বকর (১০) হযরত হাসানের (রা) ছেলে আব্দুল্লাহ (১১) হযরত হাসানের (রা) ছেলে কাসেম (১২) আওন বিন আব্দুল্লা বিন জাফর (১৩) মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ বিন জাফর (১৪) আকীলের ছেলে জাফর (১৫) আকীলের ছেলে

www.pathagar.com

আব্দুর রহমান (১৬) আকীলের ছেলে আব্দুল্লাহ (১৭) মুসলিম বিন আকীলের ছেলে আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ বিন আবু সাঈদ বিন আকীল।

আমর বিন সা'দের বাহিনীর আটাশী ব্যক্তি নিহত হয়। আহতদের সংখ্যা এ থেকে পৃথক।

সেনাপতি আমর সকল শহীদের মাথা কেটে আলাদা করার হুকুম দিল এবং শিমার, কায়েস, আমর ইবনুল হাজ্জাজ ও উরওয়া বিন কায়েসের মাধ্যমে এই মাথাগুলোকে ইমাম হুসাইনের (রা) মাথাসহ উবাইদুল্লাহ বিন যিয়াদের কাছে পাঠিয়ে দিল। তারা এই মাথাগুলো বর্শার মাথায় বিদ্ধ করে ইবনে যিয়াদের কাছে নিয়ে গেল।

শাহাদাতের দু'দিন পর আমর বিন সা'দ হযরত হুসাইনের মেয়েদেরকে, বোনদেরকে, দুগ্ধপোষ্য শিশুদেরকে, তাঁর ছেলে যায়নুল আবেদীন সহ কারবালা থেকে কূফা নিয়ে চললো। এই বিধ্বস্ত পরিবারের কাফেলা যখন পথিমধ্যে হযরত হুসাইন (রা) ও অন্যান্য শহীদের মস্তকবিহীন লাশ বিনা কাফন দাফনে পড়ে থাকতে দেখলো, তখন কাফেলায় এক হৃদয়-বিদারক দৃশ্যের অবতারণা হলো। হযরত হুসাইনের (রা) বোন যয়নব কেঁদে কেঁদে বলতে লাগলেন ঃ

"হে আল্লাহর রাসূল, দেখুন, হুসাইন রক্ত ও মাটির মধ্যে টুকরো টুকরো হয়ে মরুময় ময়দানে পড়ে রয়েছে। তার মেয়েরা বন্দীনী, তাঁর সন্তানরা নিহত এবং তাদের লাশের ওপর দিয়ে ধুলোবালি উড়ছে।"

এই মর্মস্পর্শী শোকগাথা শুনে শত্রু-বন্ধু নির্বিশেষে কেউ না কেঁদে পারেনি। ঐ সময়ে শত্রুদের অনেকে বুঝতে পেরেছিল, তারা কত বড় গুনাহর কাজ করেছে। কিন্তু তখন আর তাতে কী লাভ?

সেনাপতি আমর বিন সা'দ সবাইক নিয়ে কারবালা ময়দান থেকে বিদায় হয়ে যাওয়ার পর নিকটবর্তী গাযেরিয়ার অধিবাসীরা এসে জানাযার নামায পড়ে এবং হুসাইন (রা) ও অন্যান্য শহীদের লাশ দাফন করে।

কারো কারো মতে, অন্যান্য শহীদকে যেখানে সমাহিত করা হয়েছে, সেখানেই হযরত হুসাইনকেও (রা) সমাহিত করা হয়েছে। হযরত হুসাইনের (রা) ছেলে আলীকে হযরত হুসাইনের (রা) পায়ের কাছে দাফন করা হয়। তাঁর পরিবারের অন্যান্য লোকদের জন্য একই গর্ত খোড়া হয় এবং সবাইকে একই সাথে দাফন করা হয়। হযরত আলীর (রা) ছেলে আব্বাস, যিনি হযরত হুসাইনের (রা) সাথে ফোরাতের কিনারে গিয়েছিলেন, তাকে শত্রুরা ঘেরাও করে হত্যা করার পর হত্যার জায়গাতেই দাফন করা হয়।

হযরত হুসাইনের (রা) মাথা সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে যে, ওটা কোথায় সমাহিত হয়েছে। কারো মতে, ওটা মদীনায় পাঠানো হয়েছিল এবং সেখানেই দাফন করা হয়। অন্যরা অন্যান্য স্থানের নাম উল্লেখ করে থাকেন।

www.pathagar.com

ইমাম হুসাইনের (রা) পরিবার যখন কূফায়

উল্লসিত উবায়দুল্লাহ বিন যিয়াদ দোর্দন্ত প্রতাপ ও জাঁকজমকের সাথে গভর্ণর ভবনে বসেছিল। জনগণকে ভবনে আসার অবাধ অনুমতি দিল। একটা ট্রেতে রক্ষিত ইমাম হুসাইনের (রা) মাথা উবায়দুল্লাহর সামনে রক্ষিত ছিল। সে মাথাটার দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসছিল এবং একটা ছঁড়ি দিয়ে বারবার তার ঠোঁটে খোঁচা দিচ্ছিল। তার এক পাশে রাসূলুল্লাহর অশীতিপর বৃদ্ধ সাহাবী যায়েদ বিন আরকাম বসেছিলেন। তিনি যখন দেখলেন ইবনে যিয়াদ ক্রমাগত হুসাইনের ঠোঁটে খোঁচা দিয়েই চলেছে, তখন তিনি আর চুপ থাকতে পারলেননা। তিনি বললেন ঃ

"তোমার ছড়িটা সরিয়ে নাও। আল্লাহর কসম, আমি স্বচক্ষে বহুবার রাসূল (সা) কে ঐ ঠোঁটে ঠোঁট রেখে চুমু খেতে দেখেছি।" এই বলে তিনি কাঁদতে লাগলেন।

ইবনে যিয়াদ বললেন ঃ "আল্লাহ্ যেন তোমাকে আরো বেশী করে কাঁদায়। একেবারে থথুরে বুড়ো হ'য়ে গেছ এবং তোমর বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পেয়েছে বলে ছেড়ে দিলাম। নচেত তোমার কল্লা উড়িয়ে দিতাম।"

যায়েদ বিন আরকাম মজলিশ থেকে উঠে চলে গেলেন। যাওয়ার সময় উপস্থিত জনতাকে লক্ষ্য করে বললেন ঃ

"হে জনমণ্ডলী, আজকের পর তোমরা গোলাম হ'য়ে গেলে। কেননা ফাতেমার (রা) কলিজার টুকরোকে তোমরা হত্যা করেছ এবং দুষ্ট লোকদের লালনকারী ও সৎ লোকদের হত্যাকারী ইবনে যিয়াদকে তোমরা তোমাদের শাসনকর্তা বানিয়েছে।"

এরপর হুসাইনের (রা) পরিবারের অন্যান্য সদস্যকে এবং হযরত হুসাইনের (রা) বোন যয়নবকে ইবনে যিয়াদের সামনে আনা হলো। তাদের অবস্থা ছিল অত্যন্ত করুন। পরনে ছিল পুরনো ছেড়া কাপড়। যয়নব এসে গভর্ণর ভবনের এক কোণে বসে পড়লেন। তাঁর আশে পাশে তাঁর দাসীবাঁদীরাও বসে পড়লো। ইবনে যিয়াদ জিজ্ঞেস করলো। ভবনের কোণে বসা মেয়েটা কে, যাকে চার পাশ দিয়ে ঘিরে বসেছে আরো ক'জন মহিলা?" ইবনে যিয়াদের প্রশ্নের কেউ কোন জবাব দিল না। দ্বিতীয়বার জিজ্ঞেস করেও জবাব এলনা। তৃতীয়বার জিজ্ঞেস করলে এক দাসী জবাব দিল ঃ

"ইনি রাসূলের নাতনী এবং ফাতেমার (রা) মেয়ে যয়নব।"

ইবনে যিয়াদ এবার যয়নবকে সম্বোধন করে বললো ঃ

"আল্লাহর শোকর, তিনি তোমাদেরকে লাঞ্ছিত, অপমানিত ও পরাভূত করেছেন।"

হযরত যয়নব কিছুমাত্র দমিত না হয়ে বললেন ঃ

"আল্লাহর শোকর, তিনি আমাদেরকে তার নবীর মাধ্যমে সম্মান দিয়েছেন, এবং আমাদেরকে কলুষতা থেকে মুক্ত করেছেন। লাঞ্ছিত আমরা হইনি। লাঞ্ছিত ও ধিকৃত

www.pathagar.com

হয়েছে পাপাচারী ও জুলুমবাজরা। বিশ্বাসঘাতক ও মিথ্যাবাদীরাই চিরকাল ধিকৃত ও অপমানিত হয়ে থাকে।"

ইবনে যিয়াদ বললো ঃ "স্বচক্ষেই তো দেখেছিস্, আল্লাহ তোর পরিবারের কী দুর্গতি করেছেন।"

যয়নব বললেন ঃ ""আল্লাহ তায়ালা তাদের ভাগ্যে যে সময়ে যেভাবে নিহত হওয়া বরাদ্দ করেছেন, সেই সময়ে সেইভাবে তারা তাদের বধ্যভূমিতে পৌঁছে গেছে। অচিরেই আল্লাহ তোমাকে ও তাদেরকে একই জায়গায় সমবেত করবেন। সেই সময় তোমরা আল্লাহর সামনে প্রশ্নোত্তর করে নিও।"

এ কথা শুনে ইবনে যিয়াদ রেগে গেল। সে বলল ঃ "আল্লাহ তায়ালা দাম্ভিক ও অহংকারী বিদ্রোহীদেরকে মৃত্যু দিয়ে আমার কলিজা ঠাণ্ডা করেছেন।"

যয়নব কেঁদে ফেললেন এবং বললেন ঃ "তুমি আমাদের লোকাদেরকে হত্যা করেছ এবং আমাদের পরিবারটাকে বিধ্বস্ত করে দিয়েছে। এতে যদি তোমার কলিজা ঠান্ডা হয়, তবে ঠান্ডা করে নাও।"

ইবনে যিয়াদ কাটা ঘায়ে নুনের ছিটা দিয়ে বললো ঃ

"বেশ তো কবিত্ব ফলালি। তোর বাবাও কবি ছিল।"

এরপর ইবেন যিয়াদের নজর পড়লো যয়নুল আবেদীনের ওপর। সে জিজ্ঞেস করলো ঃ "তুমি কে?"

তিনি বললেন ঃ "আলী বিন হুসাইন।"

ইবনে যিয়াদ জিজ্ঞেস করলো ঃ "আলী বিন হুসাইন কি মারা যায়নি?"

যয়নুল আবেদীন বললেন ঃ "আমার আরো এক ভাই এর নাম আলী ছিল। তাকে লোকেরা হত্যা করেছে।"

ইবনে যিয়াদ বললো ঃ "তাকে লোকেরা হত্যা করেনি, আল্লাহ হত্যা করেছেন।"

যয়নুল আবেদীন বললেন ঃ "মানুষের মৃত্যুর সময় যখন ঘনিয়ে আসে, তখন তাকে আল্লাহ তায়ালাই মৃত্যু দেন। আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কোন প্রাণী মরতে পারেনা।"

ইবনে যিয়াদ রাগান্বিত হয়ে বললেন ঃ "কী, আমার মুখের ওপর তুই আমার কথার জবাব দেবার ধৃষ্টতা দেখাস? প্রহরী, ওকে নিয়ে যাও এবং ওর মাথা কেটে আলাদা করে ফেল।"

যয়নব যয়নুল আবেদীনকে জড়িয়ে ধরলেন এবং বললেন ঃ "হে ইবনে যিয়াদ, আমি তোমাকে আল্লাহর দোহাই দিয়ে বলছি, একে হত্যা করতে চাইলে সেই সাথে আমাকেও হত্যা করে ফেল।"

যয়নবের অস্থিরতা দেখে ইবনে যিয়াদের মনে করুণার উদ্রেক করলো। সে হুকুম দিলঃ "যয়নাল আবেদীনকে ছেড়ে দাও। ঐ পরিবারের মহিলাদের সাথে সেও চলে যাক।"

www.pathagar.com

এরপর ইবনে যিয়াদ মজলিশ থেকে উঠে মসজিদে এল। আযান দেয়া হলো। তারপর সে মিম্বরে উঠে এভাবে খুতবা দেয়া শুরু করলো ঃ

"আল্লাহর শোকর, তিনি সত্যকে প্রকাশ করে দিয়েছেন। আমীরুল মুমিনীন ইয়াযীদ বিন মুয়াবিয়া ও তার বাহিনীকে বিজয়ী করেছেন। মিথ্যাবাদীদের শিরোমনি হুসাইন বিন আলী ও তার গোষ্ঠীকে ধ্বংস করেছেন।"

অন্ধ অশীতিপর বৃদ্ধ সাহাবী আব্দুল্লাহ বিন হানিফ আযদী এ সময় মসজিদের এক কোনে বসেছিলেন। তিনি তাঁর এক চোখ উষ্ট্র যুদ্ধে এবং অপর চোখ সিফফীন যুদ্ধে হারিয়েছিলেন। উভয় যুদ্ধে তিনি হযরত আলীর (রা) সহযোগী ছিলেন। তিনি সারা দিন মসজিদে আল্লাহর এবাদাতে কাটাতেন। তিনি উঠে দাঁড়ালেন এবং বললেন ঃ

"হে ইবনে যিয়াদ, তুই নবীর ধংশধরকে হত্যা করে মসজিদের মিম্বরে খুলাফায়ে রাশেদীনের পবিত্র আসনে বসে মিথ্যাচার করিস। তুই মিথ্যুক, তোর বাবা মিথ্যুক এবং যে তোকে গভর্ণর নিয়োগ করেছে সে মিথ্যুক।"

ইবনে যিয়াদ বললো ঃ ঐ বুড়োটাকে আমার কাছে ধরে আন।"

ইবনে যিয়াদের লোকেরা ইবনে হানিফকে পাকড়াও করলো। ইবনে হানিফ নিজ গোত্র 'আযদ' এর বিশেষ ধ্বনি দিল। ধ্বনি শুনে জনৈক আযদী তাকে জোরপূর্বক ইবনে যিয়াদের হাত থেকে ছিনিয়ে নিল এবং তাকে তার বাড়ীতে পাঠিয়ে দিল। রাতের বেলা ইবনে যিয়াদ তাকে গ্রেফতার করার জন্য আবার লোক পাঠালো। তাকে ইবনে যিয়াদের সামনে হাজির করা হলে সে তাকে হত্যা করিয়ে ফেললো।

প্রত্যুষে ইবনে যিয়াদ নির্দেশ দিল, হুসাইন ও অন্যান্য শহীদের মাথাগুলোকে বর্শায় বিদ্ধ করে দামেস্কে ইয়াযীদের দরবারে পাঠিয়ে দেয়া হোক। সেই সাথে সকল নারী ও শিশুকেও ইয়াযীদের কাছে পাঠানো হলো।

কাফেলা যখন ইয়াযীদের কাছে পৌছলো, তখন হযরত হুসাইনের (রা) মেয়ে ফাতেমা ও ছকীনার চোখ ছিল অশ্রু সিক্ত। তাদের সামনেই তাদের বাবার মাথা রক্ষিত ছিল। ইয়াযীদ ব্যাপারটা অনুভব করলো এবং তাদের সামনে থেকে মাথা সরিয়ে রাখলো। তারপর তাদেরকে বললো ঃ

"যা কিছু ঘটেছে, আমার অজান্তে ঘটেছে। আমি ঘটনাস্থলে উপস্থিত থাকলে অবশ্যই হুসাইনকে ক্ষমা করে দিতাম এবং মহানুভবতার আরচণ করতাম।"

যয়নুল আবেদীন আলী ইবনুল হুসাইন (রা) শিকলে আবদ্ধ ছিলেন। এয়াযীদ তার শিকল খুলে দেয়ার নির্দেশ দিল। তারপর তাকে সম্বোধন করে বললো ঃ

""হে আলী, তোমার আব্বা আমার সাথে আত্মীয় সুলভ আচরণ করেনি। আমার অধিকার নষ্ট করেছে। আমাকে সরকার চালাতে বাধা দিয়েছে। এ কারণে আল্লাহ তার কী দুর্গতি করেছেন। তাতো তুমি দেখেছ।"

www.pathagar.com

যয়নুল আবেদীন জবাবে নিম্নের আয়াতটা পড়লেন ঃ

"যত বিপদ মুসিবত পৃথিবীতে ও তোমাদের ওপর আসে, তার সবই আমি ওগুলোকে সৃষ্টি করার আগেই লিখে রেখেছি। আর এ কাজটা আল্লাহর জন্যই খুবই সহজ। এ কথা বলার উদ্দেশ্য এই যে, তোমরা তোমাদের অতীত ক্ষয়ক্ষতির জন্য যেন আফসোস না কর এবং যা কিছু আল্লাহ তোমাদেরকে দিয়েছেন তার জন্য অহংকারে মেতে না ওঠ। আল্লাহ দাম্ভিক ও অহংকারী লোকদেরকে পছন্দ করেননা।" (সূরা আল-হাদীদ)

ইয়াযীদ এর জবাবে নিম্নোক্ত আয়াত পড়লো ঃ

"তোমরা যে সব বিপদ মুসিবতে পড়, তা তোমাদেরই কর্মফল। আল্লাহ বহু সংখ্যক গুণাহ মাফ করে থাকেন।" (সূরা আশ-শূরা)

এরপর ইয়াযীদ আদেশ দিল, তাঁর প্রাসাদের সাথে সংলগ্ন একটা কক্ষ খালি করে দেয়া হোক এবং সেখানে তাদেরকে সম্মানের সাথে রাখা হোক।

কিছুদিন ওখানে অবস্থান করার পর ইয়াযীদ সবাইকে সসম্মানে মদীনায় পাঠিয়ে দিল।

ইয়াযীদের এ আচরণে হুসাইনের (রা) পরিবার মুগ্ধ হয়েছিলেন। হযরত হুসাইনের মেয়ে সাকীনা (রা) বলতেন ঃ

"আমি অনেক অকৃতজ্ঞ মানুষ দেখেছি। তবে তাদের কাউকে ইয়াযীদের মত ভদ্র, ও সদাচারী দেখিনি।"

বিভিন্ন ইতিহাস গ্রন্থ থেকে জানা যায়, ইয়াযীদ ইমাম হুসাইনের (রা) মর্মান্তিক শাহাদাতের ঘটনায় দীর্ঘদিন যাবত আক্ষেপ ও অনুশোচনা করেছে। সে প্রায়ই বলতো ঃ "আমার কী হলো? "আমি একটু কষ্ট করে রাসূলুল্লাহর (সা) হক ও আত্মীয়তার কথা বিবেচনা করে হুসাইনকে নিজের বাড়ীতে নিজের কাছেই রেখে দিতে পারতাম। তার দাবী দাওয়া একটু বিবেচনা করতাম, তাতে না হয় আমার ক্ষমতা খানিকটা কমেই যেত। ইবনে যিয়াদের ওপর আল্লাহর অভিশাপ। সে ইমাম হুসাইনকে যুদ্ধ করতে বাধ্য করলো। হুসাইন প্রস্তাব দিয়েছিল, সে সরাসরি আমার সাথে আলোচনার মাধ্যমে বিরোধ মিটিয়ে ফেলবে, অথবা মুসলিম সাম্রাজ্যের সীমান্তে গিয়ে কাফেদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হবে। কিন্তু ইবনে যিয়াদ তার কোন কথাই শুনলোনা এবং তাকে হত্যা করিয়েই ছাড়লো। তার হত্যাকান্ডে সারা দুনিয়ার মুসলমানদের চোখে আমাকে ঘৃণিত ও ধিকৃত হতে হয়েছে এবং মুসলমানদের মনে আমার প্রতি চিরস্থায়ী শত্রুতা ও বিদ্বেষের সৃষ্টি হয়েছে। ইবনে যিয়াদের ওপর আল্লাহর অভিশাপ! ইবনে যিয়াদের ওপর আল্লাহর গযব।"

ইয়াযীদ সুদূর দামেস্কে বসে কারবালার ঘটনাবলী যথাসময়ে জানতে পারেনি, এ কথা সত্য বটে। তবে সে উবায়দুল্লাহ বিন যিয়াদকে হুসাইনের (রা) আনুগত্য আদায়ের জন্য যেভাবে নির্দেশাবলী দিয়ে রেখেছিল, তাতে কারবালার ঘটনায় দায়দায়িত্ব থেকে সে

www.pathagar.com

অব্যাহতি পেতে পারেনা। এবং ইতিহাস তাকে অব্যাহতি দেয়ওনি। জালালুদ্দীন সয়ূতী স্বীয় গ্রন্থ তারীখুল খুলাফার ১৬৩ পৃষ্ঠায় লিখেছেন ঃ ইমাম হুসাইন (রা) যখন ইরাকের উদ্দেশ্যে সপরিবারে মক্কা থেকে রওনা হলেন, তখন ইয়াযীদ কূফার গভর্ণর উবায়দুল্লাহ বিন যিয়াদকে তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার নির্দেশ দিয়েছিল।" মুসনাদ আবু ইয়ালায় একটা হাদীস উদ্ধৃত হয়েছে। এতে রাসূল (সা) বলেছেন ঃ "আমার উম্মাতের জীবন ইনসাফের মধ্য দিয়েই কেটে যাবে। অবশেষে বনু উমাইয়ার ইয়াযীদ নামক এক ব্যক্তি সর্বপ্রথম তার সুনাম নষ্ট করবে।" (তারীখুল খুলাফা, পৃঃ ১৮৫)

এ প্রসংগে একটা ঘটনার উল্লেখ করা দরকার, যা দ্বারা একদিকে যেমন ইমাম হুসাইনের বোন যয়নব বিনতে ফাতেমার সাহসিকতার প্রমাণ পাওয়া যায় অপরদিকে তেমনি ইয়াযীদের ভদ্রতা ও সদাশয়তার যে স্বীকৃতি সাকীনা দিয়েছেন, তা যে কেবল আংশিক সত্য ও নিছক লোক দেখানো তাও জানা যায়।

ইয়াযীদের সামনে যখন হযরত হুসাইনের (রা) পরিবারকে আনা হলো, তখন জনৈক সিরিয় যুবক ইয়াযীদের কাছে আবেদন জানালো যে, হযরত হুসাইনের (রা) মেয়ে ফাতিমাকে তার কাছে সমর্পন করা হোক। ফাতেমা এ কথা শুনে কাঁদতে কাঁদতে যয়নবকে জড়িয়ে ধরলো। যয়নবের মুখ ক্রোধে ও অপমানের অনুভূতিতে লাল হয়ে গেল এবং তিনি সোচ্চার কণ্ঠে বললেন ঃ

"তুই একটা কুচক্রী ও পাষন্ড। এ ক্ষমতা তোরও নেই, ইয়াযীদেরও নেই।"

এ কথা শুনে ইয়াযীদের আত্মসম্মানে আঘাত লাগলো। সে রেগে গিয়ে বললো ঃ

"তুমি মিথ্যে বলছ। আমার পুরো ক্ষমতা আছে এ কাজ করার।"

যয়নব বললেন ঃ ""কখখনো নয়। আল্লাহ তোমাকে কখখনো এ অধিকার দেননি যে, একজন স্বাধীন মুসলিম নারীকে দাসী বা বাঁদীরূপে কারো হাতে সোপর্দ করবে। হাঁ, তুমি যদি ইসলাম ত্যাগ করে অন্য কোন ধর্ম অবলম্বন কর, তা হলে এটা করতে পার। কেননা অমুসলিমের হাতে বন্দী মুসলিম নারীকে সে দাসীতে পরিণত করতে পারে।"

যয়নবের এ সাহসিকতা দেখে ইয়াযীদ আরো ক্রুদ্ধ হয়ে গেল। সে বললো ঃ

"আমার মুখের ওপর তুমি এ কথা বলতে পারলে? আমি নয় তোমার বাবা ও ভাই ইসলামকে ত্যাগ করেছে।"

যয়নব জবাব দিলেন ঃ "তুমি, তোমার বাবা, তোমার দাদা, আল্লাহর দ্বীনের সাথে ও মুসলমানদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছ।"

ইয়াযীদ বললো ঃ ওহে আল্লাহর দুশমন, তুমি মিথ্যে বলছ।

যয়নব বললেন ঃ "তুমি বলপূর্বক ক্ষমতা দখল করেছ, জনগণের ওপর যুলুম নির্যাতন চালাচ্ছ, এবং জনগণকে শক্তির জোরে দাবিয়ে রাখছ।"

এবার ইয়াযীদ লজ্জিত হলো। কোন জবাব দিতে পারলোনা। সিরীয় যুবক আবার উঠে

www.pathagar.com

বললো ঃ "আমরীরুল মুমিনীন, এ মেয়েটা আমাকে দিন।"

ইয়াযীদ তাকে ধমক দিয়ে বললো ঃ "চুপ কর ব্যাটা, তুই মরগে। তোর কপালে জীবনেও যেন বৌ না জোটে!"

মদীনায় যখন হযরত হুসাইন (রা) ও তার সাথীদের শাহাদাতের খবর পৌঁছলো, তখন সেখানে বিষাদের কালো ছায়া নেমে এল। বনু হাশেম গোত্রের মহিলারা চিৎকার করে কাঁদতে কাঁদতে ঘর থেকে বেরিয়ে এল। হযরত আকীলের মেয়ে একটা কবিতা আবৃত্তি করে মাতম করতে লাগলো ঃ

"রাসূলুল্লাহ (সা) যখন জিজ্ঞেস করবেন যে, ওহে সবশেষ উম্মত, তোমরা আমার মৃত্যুর পর আমার সন্তানদের ও আমার পরিবারের সাথে কি আচরণ করেছিলে, তখন কী জবাব দেবে? আমার পরিবারের কেউ বন্দী, কেউ রক্তস্নাত ও নিহত। আমি তোমাদের সাথে যে মহানুভবতার আচরণ করেছি, তার বিনিময়ে তোমরা আমার আপনজনদের সাথে এমন দুর্ব্যবহার করলে? তাদেরকে এত কষ্ট দিলে?"

মদীনার গভর্ণর ইবনে সাঈদ যখন মহিলাদের কান্নাকাটির খবর শুনলো, তখন সে হাসলো এবং মসজিদে নব্বীর মিম্বরে উঠে জনগণকে ইমাম হুসাইনের শাহাদাতের খবর শোনালো।

আব্দুল্লাহ বিন জাফর যখন তার উভয় ছেলে আওন ও মুহাম্মাদের শাহাদাতের খবর শুনলেন, তখন তার চোখ দিয়ে অশ্রু গড়াতে লাগলো। তাঁর আত্মীয়-স্বজন কাছে এসে শোক জানাতে লাগলেন। একজন বললো ঃ

"আহা, হুসাইনের অনুসরণ করতে গিয়ে ছেলে দুটো এমন ভয়ংকর পরিনাম ভোগ করলো।"

এ কথা শুনে আব্দুল্লাহ বিন জাফর লোকটার দিকে জুতো ছুড়ে মারলেন। তিনি বললেন, ঃ "হুসাইন সম্পর্কে তুমি এমন কথা বললে? আল্লাহর কসম, কারবালার ময়দানে আমি উপস্থিত থাকলেও আমার দু'ছেলে যা করেছে, আমিও তাই করতাম। নিজের প্রাণ থাকতে হুসাইনকে একা রেখে চলে আসতামনা। আমার দুই ছেলের মৃত্যুতে আমার ওপর বিরাট বিপদ ও শোক নেমে এসেছে সত্য। কিন্তু এ কথা ভাবলে আমার শোক হাল্কা হয়ে যায় যে, তারা দু'জনে আমার চাচাতো ভাই হুসাইনের জীবন রক্ষার সর্বাত্মক চেষ্টা করে শহীদ হয়েছে। আমি নিজ হাতে হুসাইনের সাহায্য করতে না পারলেও আমার উভয় ছেলে তার প্রতি পরিপূর্ণ আন্তরিকতা ও বিশ্বস্ততার পরিচয় দিয়েছে।"

www.pathagar.com

কারবালার ঘটনার হোতাদের মর্মান্তিক পরিণতি

ইমাম যাহাবী বলেছেন ঃ কারবালার হত্যাকান্ড ও মদীনা আক্রমণের পর ইয়াযীদের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড গণবিদ্রোহ সংঘটিত হয়। তার আয়ূও ছিল খুব কম। মাত্র তিন বছর রাজত্ব করার পর সে ৪৩ বছর বয়সে মারা যায়।" বিভিন্ন ইতিহাস গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে, হুসাইন (রা) এর হন্তাদের কেউই আল্লাহর নির্মম প্রতিশোধ থেকে রক্ষা পায়নি। কেউ নিহত হয়েছে এবং কেউ এমন কষ্টদায়ক অবস্থার শিকার হয়েছে যে, মৃত্যুও তার চেয়ে অনেক ভাল ছিল।

ইবনুল জাওযী বলেছেন ঃ হুসাইনের হন্তাদের সকলেই কোন না কোন প্রকারে দুনিয়াতেই শাস্তি পেয়েছে। কেউ নিহত হয়েছে, কেউ অন্ধ হয়ে গেছে। আর ক্ষমতাসীনরা অল্প সময়েই ক্ষমতাচ্যুত হয়েছে।

ইবনে কাছীর বলেন ঃ "ইমাম হুসাইনের শাহাদাতের পর যে সকল দুর্যোগ সংঘটিত হওয়ার বর্ণনা ইতিহাসে পাওয়া যায়, তার বেশীর ভাগই সত্য। তার হত্যাকারীদের প্রত্যেকেই কোন না কোনভাবে আযাব ভোগ করেছে। অনেকে কঠিন রোগে আক্রান্ত হয়েছে। অধিকাংশই উন্মাদ হয়ে মরেছে।"

আব্দুল মালেক ইবনে মারওয়ানের শাসনামলে যখন মুখতার সাকাফী কূফার শাসক হলো, তখন সে হযরত হুসাইনের (রা) হত্যাকান্ডে অংশগ্রহণকারীদেরকে এবং তার বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেয়া বাহিনীতে যোগদানকারীদেরকে বেছে বেছে হত্যা করে। এমনকি একদিনেই সে এ ধরনের দুশো চল্লিশ ব্যক্তিকে হত্যা করে। আমর বিন হাজ্জাজ হুসাইনের (রা) হত্যাকারী ছিল। সে কূফা থেকে পালিয়েও বাচতে পারেনি। মুখতারের লোকদের হাতে নিহত হয়েছে। মুখতারের লোকেরা শিমারকে হত্যা করে তার লাশ কুকুরকে খাইয়ে দিয়েছে।

হুসাইনের (রা) হত্যাকারীদেরকে মুখতারের কাছে আনা হতো এবং সে তাদেরকে অত্যন্ত কষ্টদায়ক উপায়ে হত্যা করার নির্দেশ দিত। কাউকে জ্যান্ত আগুনে পুড়িয়ে মারতো। কাউকে অংগ প্রত্যংগ কেটে রেখে দিত এবং ছটফট করে করে মরে যেত। খাওলী বিন ইয়াযীদ হুসাইনের (রা) মাথা কাটার চেষ্টা করেছিল। মুখতার তাকে হত্যা করে তার লাশ জ্বালিয়ে দিয়েছিল। উবাইদুল্লাহ বিন যিয়াদও মুখতারের সেনাপতি আল-আশতারের হাতে নিহত হয় এবং তার মস্তকও মুখতারের কাছে পাঠানো হয়। ইবনে যিয়াদের বাহিনীর অধিনায়ক আমর বিন সা'দকে ও তার ছেলেকে নির্মমভাবে হত্যা করা

www.pathagar.com

হয়। হুসাইন হন্তাদের যারা পালিয়ে প্রাণে বেঁচে গেছে, মুখতার তাদের বাড়ীঘর ধ্বংস করে ও জ্বালিয়ে দেয়। হুসাইনের (রা) কণ্ঠনালীতে তীর নিক্ষেপকারী হাসীন বিন নুমাইরও তার হাতে নিহত হয়। ইবনে যিয়াদ ও আমর বিন সা'দের মাথা কেটে মুখতার হযরত হুসাইনের (রা) ছেলে যাইনুল আবেদীনের কাছে প্রেরণ করলে যাইনুল আবেদীন সিজদায় চলে যান এবং বলেন ঃ

"আল্লাহর শোকর, যিনি আমার শত্রুদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নিয়েছেন।" মোট কথা, হযরত হুসাইনের (রা) বিরুদ্ধে যুদ্ধ ও ষড়যন্ত্রে অংশ গ্রহণকারী প্রত্যেককেই আল্লাহ ধ্বংস করে দেন।

www.pathagar.com

ইমাম হুসাইনের শাহাদাতের ঘটনা থেকে শিক্ষা

ইমাম হুসাইনের (রা) শাহাদাতের মর্মান্তিক ঘটনাটা যেভাবে ও যে পরিস্থিতিতে সংঘটিত হয়েছে, তাতে মুসলিম উম্মার জন্য যথেষ্ট শিক্ষনীয় রয়েছে। এ ঘটনার ঐতিহাসিক বিবরণ আমি সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য সুত্রাবলী থেকে সংগ্রহ করার চেষ্টা করেছি। এই বিবরণ পর্যালোচনা করলে এই বিষাদময় ঘটনা থেকে যে শিক্ষাগুলো চিহ্নিত করা যায়, তা মোটামুটি নিম্নরূপ ঃ

(১) শাসন ক্ষমতায় কি ধরনের লোক অধিষ্ঠিত থাকে, জনগণের সার্বিক শান্তি ও নিরাপত্তা, তাদের ইনসাফ ও ন্যায়বিচার লাভ এবং যুলুম থেকে রক্ষা পাওয়া তার ওপরই নির্ভরশীল। শাসন ক্ষমতায় যদি খোদাভীরু, সৎ, ঈমানদার ও চরিত্রবান লোকেরা অধিষ্ঠিত থাকে, তবে দেশবাসীর ইনসাফ পাওয়া ও যুলুম অতাচার থেকে রক্ষা পাওয়া যেমন নিশ্চিত হয়, তেমনি জনগণের নৈতিক ও চারিত্রিক উৎকর্ষও দিন দিন বৃদ্ধি পেতে থাকে। পক্ষান্তরে শাসক মহল যদি দুশ্চচরিত্র, দুর্নীতিবাজ ও অত্যাচারী হয়, তা হলে সমাজে যত সৎলোকই থাক, ইনসাফ ও সততা প্রতিষ্ঠিত হতে পারেনা। এ কারণেই হযরত মুয়াবিয়ার ছেলে ইয়াযীদের আমলে মুসলিম সাম্রাজ্যের কেন্দ্রীয় অঞ্চল মক্কা, মদীনা, ও ইরাক যুলুম, অত্যাচার, দুর্নীতি ও অনৈতিক কার্যকলাপের লীলাভূমিতে পরিণত হয়। হিজরী প্রথম শতকের এই সময়টাতে বিপুল সংখ্যক সাহাবী জীবিত ছিলেন। যারা মুসলিম উম্মাহর মধ্যে সর্বোচ্চ মানের সততা ও তাকওয়ার অধিকারী ছিলেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও একমাত্র অসৎ লোকদের ক্ষমতায় আরোহনের সুযোগ পাওয়ার কারণে ইসলামের মূলনীতিগুলো রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে বাস্তবায়িত হতে পারেনি। অথচ খিলাফতে রাশেদার আমলে ইসলামের নীতিমালা রাষ্ট্রে ও সমাজের সকল স্তরে বাস্তবায়িত হতে পেরেছে। হযরত উসমানের আমলে সামান্য কিছু বিচ্যুতি ঘটা শুরু হলেও পরামর্শভিত্তিক শাসন ব্যবস্থা ও সমালোচনার সুযোগ অবারিত থাকায় ঐ বিচ্যুতি ব্যাপক ও স্থায়ী রূপ ল াভ করতে পারেনি। সুতরাং এ ঘটনার পয়লা শিক্ষা হলো, রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে সৎ ও ন্যায়পরায়ন লোকদের শাসন কায়েম করা। পরামর্শ ও সমালোচনার অবারিত সুযোগ বহাল রাখা এবং কোন ক্রমেই অসৎ লোকদের হাতে ক্ষমতার চাবিকাঠি অর্পন না করা নিশ্চিত করতে হবে। বিশেষত, রাষ্ট্রের সকল স্তরের ব্যবস্থাপনাকে অমুসলিমদের প্রভাব ও হস্তক্ষেপ থেকে মুক্ত রাখা জরুরী। ইতিহাস সাক্ষী যে, এযীদের খৃষ্টান উপদেষ্টার পরামর্শ গ্রহণ না করা হলে উবায়দুল্লাহ বিন যিয়াদ গভর্ণর নিযুক্ত হতোনা এবং সম্ভবত এত বড় হৃদয় বিদারক ঘটনা ঘটতোনা।

(২) ব্যক্তি স্বাধীনতা, বিবেক ও চিন্তার স্বাধীনতা এবং বাক স্বাধীনতা ইসলামের অন্যতম মূলমন্ত্র হওয়ায় মুসলমানদের সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় কোন কৃত্রিম ঐক্য প্রতিষ্ঠিত কখনো ছিল না, আজও নেই এবং ভবিষ্যতেও হবেনা। কিন্তু কুরআন ও সুন্নাহ যতদিন তাদের সামষ্টিক জীবনের পথ প্রদর্শক হিসাবে বহাল থাকবে ততদিন সমাজে ইসলামের

www.pathagar.com

মৌলিক নীতিমালার ব্যাপারে সংখ্যাগরিষ্ঠের আস্থা ও ভক্তি অবশ্যই অটুট থাকবে। ফলে সৎ কাজের আদেশ দান ও অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করা অন্যতম রাষ্ট্রীয় মূলনীতি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত থাকতে বাধ্য। এমতাবস্থায় শাসক মহলের যুলুম ও দুর্নীতিতে লিপ্ত হওয়া তো দূরের কথা, সমাজের কোন স্তরেই তা টিকে থাকতে পারেনা।

তাই কুরআন ও সুন্নাহকে রাষ্ট্র ব্যবস্থায় সর্বোচ্চ মর্যাদা দিতে হবে। হযরত আমীর মুয়াবিয়া সাহাবী হওয়া সত্বেও তার আমলে কুরআন ও সুন্নাহর পরিবর্তে ব্যক্তিগত খেয়াল খুশি অগ্রাধিকার পেয়েছে এবং খেলাফতে রাশেদা রাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় পর্যবসিত হয়েছে। আর এরই ফলশ্রুতিতে ইয়াযীদের মত ভয়ংকর অত্যাচারী ও পাপিষ্ঠ ব্যক্তি শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হতে পেরেছে এবং নজীরবিহীন যুলুম অত্যাচার চালাতে পেরেছে।

(৩) সমগ্র মানবেতিহাসে ইসলামই সর্বপ্রথম মানব সমাজে মানবিক সাম্য প্রতিষ্ঠিত করেছে এবং বর্ণ, বংশ ও অঞ্চলভিত্তিক ভেদাভেদ ও বৈষম্য থেকে সমাজকে মুক্ত করেছে। রাসূল (সা) ও চার খলিফার আমল পর্যন্ত এ বৈশিষ্ট অনেকাংশেই অম্লান ছিল। কিন্তু হযরত আমীর মুয়াবিয়া ও ইয়াযীদের আমলে এই বৈশিষ্টের ধারাবাহিকতা আর বজায় থাকেনি। ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী 'তোমাদের ভেতরে সেই ব্যক্তি অধিকতর সম্মানার্হ যে অধিকতর চরিত্রবান ও খোদাভীরু", এই নীতির পরিবর্তে শাসক মহলের উমাইয়া প্রীতি, স্বজনপ্রীতি রাষ্ট্রীয় মূলমন্ত্রে পরিণত হয়েছে। এরই ফলে শাসক বনু উমাইয়া সম্পূর্ণ অন্যায়ভাবে বুন হাশেম গোত্রের বিরুদ্ধে নির্মূল অভিযান পরিচালনা করে, যার নিষ্ঠুরতম শিকার হন হযরত ইমাম হুসাইন (রা) ও তার পরিবার। তাই ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য প্রকৃত শান্তি, নিরাপত্তা, সম্মান ও উন্নয়ন নিশ্চিত করতে হলে আমাদেরকে পুনরায় খিলাফাতে রাশেদার আমলের ইনসাফ, ন্যায়নীতি, মানবিক সাম্য ও চারিত্রিক সততা প্রতিষ্ঠা করার জন্য ইসলামের সুমহান মূলনীতির কাছেই ফিরে যেতে হবে ও তা প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করতে হবে। প্রকৃত পক্ষে ইসলামের এই সুমহান মূলনীতিগুলোর পুনপ্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যেই হযরত ইমাম হুসাইন (রা) ইয়াযীদের দুশাসন ও কুশাসনের প্রতিবাদ ও প্রতিরোধে উদ্যোগী হয়েছিলেন। আল্লাহর তায়ালা মুসলিম উম্মাহকে ইমাম হুসাইন (রা) ও খুলাফায়ে রাশেদীনের অনুসৃত পথে প্রত্যাবর্তনের তাওফীক দান করুন। আমীন।

তথ্যসূত্র ঃ

১. আল হুসাইন - উমার আবুন নাসর

২. তারীখুল খুলাফা জালালুদ্দীন সয়ূতী

৩. ইসলামের ইতিহাস – ডা: সৈয়দ মাহমুদুল হাসান

৪. তারীখুত তাবারী – ইমাম ইবনে জারীর তাবারী

www.pathagar.com

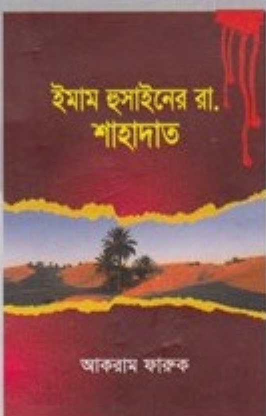

আহসান পাবলিকেশন
কাটাবন বাংলাবাজার মগবাজার
www. ahsanpublication.com

ISBN : 984-31-0857-4

www.pathagar.com